প্রথম প্রকাশ
১ বৈশাখ ১৪০১

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

মুদ্রক
ঊষা প্রেস
৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ
ইন্দ মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্র
রবি দত্ত

সম্পাদকীয় সহকারী
[illegible] সরকার

স্বীকৃতি
বাণীশিল্প, মিত্র ও ঘোষ, ডি. এম. লাইব্রেরি

নিবেদন

অন্নদাশঙ্কর রায় আজও লিখে চলেছেন। সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁর সহজ সঞ্চরণ। শিল্পী বা লেখকের চেয়ে বড়ো কথা— অন্নদাশঙ্কর মুক্ত মনের এক বিবেকবান মানুষ। তাই তিনি মনস্বী। এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকের নব্বই বছর পূর্তি হয়েছে ১৪ মার্চ ১৯৯৪। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। অন্নদাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের উপলক্ষেই এই গ্রন্থের প্রকাশ।

এখানে একদিকে যেমন তাঁর জীবনের কথা ও রচনার তালিকা সংকলিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি বেশ কয়েকটি নিবন্ধে তাঁর বিভিন্ন লেখা নিয়ে মূল্যায়নসূচক আলোচনাও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর উপন্যাস গল্প ভ্রমণকাহিনী প্রবন্ধ কবিতা ছড়া কাব্যনাট্য এসবের কিছুটা নমুনাও তুলে ধরা হয়েছে 'নির্বাচিত রচনা' অংশে।

এই সংকলনটির শ্রমসাধ্য সম্পাদনার কাজ করে দিয়ে শ্রীধীমান দাশগুপ্ত আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। যে সব বিদগ্ধ লেখকের রচনায় এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। অন্নদাশঙ্করকে জানতে এই বইখানি অপরিহার্য বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বর্ষীয়ান সাহিত্যিক এবং আকাদেমির সভাপতি অন্নদাশঙ্করকে সম্মাননা জ্ঞাপনের এই কর্তব্যটি পালন করতে পেরে আমরা কৃতার্থ বোধ করছি।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

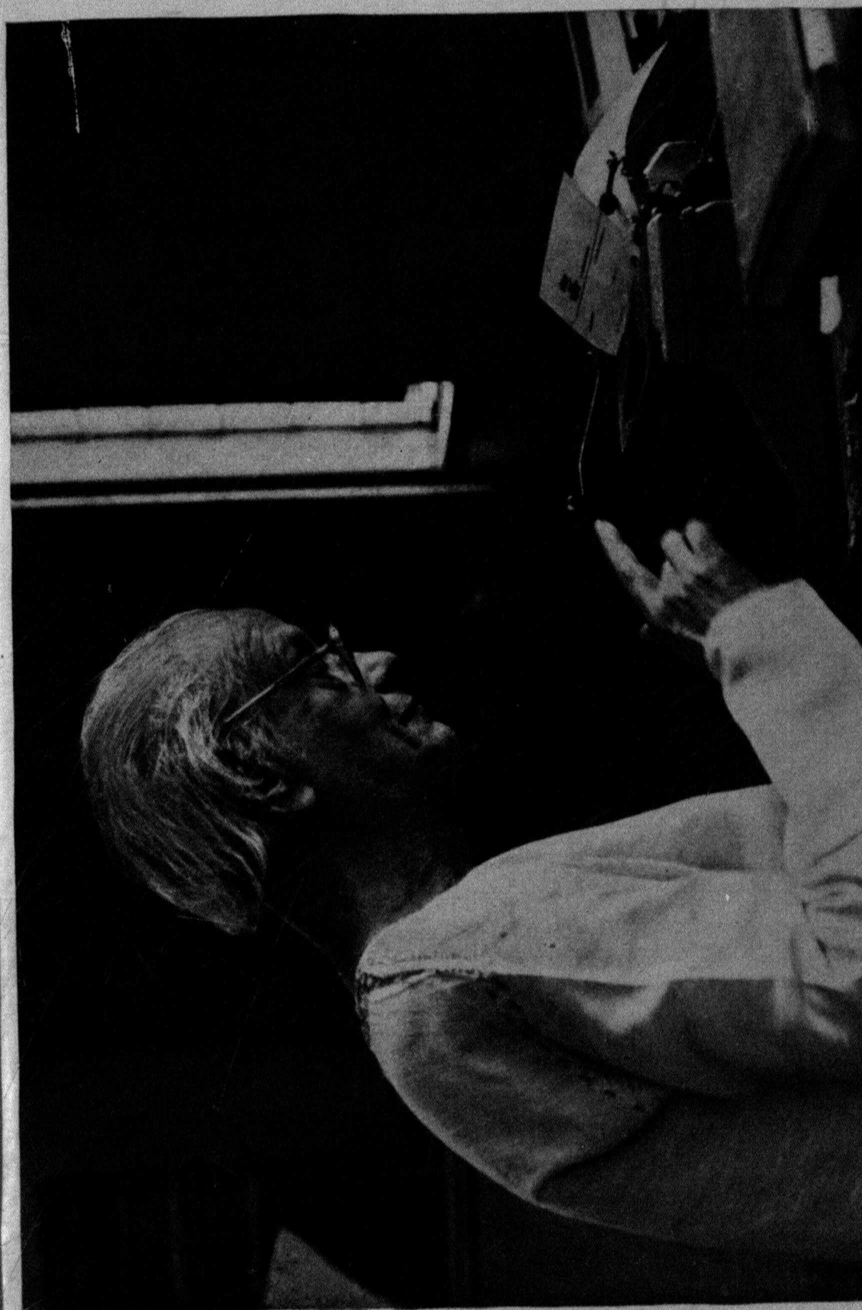
১ বৈশাখ ১৪০২

সূচি

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগ



আপনকথা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে ধীমান দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার

সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও নান্দনিক প্রবণতা

প্রশ্ন ॥ রবীন্দ্রোত্তর যুগে আপনি বোধ হয় একমাত্র লেখক যিনি শুধু সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে নন ইতিহাস / রাজনীতি / সংস্কৃতি / বিজ্ঞান / অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী। গ্রিক দার্শনিকদের এনসাইক্লোপেডিক অন্বেষার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। জগৎ সম্বন্ধে, জীবন ও মানুষ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, আপনার অফুরন্ত জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল। গল্প ও উপন্যাসের মতো সৃজনশীল রচনায় তার সচেতন ও সদর্থক ছাপ পড়ে। আপনি নিজেই বলেছেন, আবাল্য আপনি দুই মহান সাহিত্য প্রবাহে লালিত। একটি ভারতীয় সাহিত্যের তিন হাজার বছরের ধারা, অন্যটি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পাঁচশো বছরের জোয়ার, আপনার সাহিত্য এই দুই ধারার অনবদ্য সমন্বয়, তাতে মনন, ইমোশন, বিউটি ও এপিক স্পিরিটের চমৎকার সংশ্লেষণ ঘটেছে। রাসেল জীবনভর তিনটি বর চেয়েছেন—উইসডম, প্রেম, প্রতিবাদের স্পৃহা। আপনি চেয়েছেন—ইলুমিনেশন, প্রেম, সৃষ্টির আনন্দ বেদনা। আপনার এই জীবনদর্শন ও সাহিত্যালোকের কথা আপনার বহু প্রবন্ধে বারবার বলেছেন। আজ বলুন তা আপনার সৃজনশীল সাহিত্যকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত করে ?

উত্তর ॥ নানা বিষয়ে আগ্রহ আমার ছেলেবেলা থেকে। ছেলেবেলা থেকে আমি সংবাদপত্রের মনোযোগী পাঠক। দেশবিদেশের খবরের সঙ্গে আমি সবসময় তাল রেখে চলতে চাই। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাই। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি—নানা বিষয়ের বই প্রথমে আমাকে পড়তে হয়েছিল সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য, পরে সেসব আমি পড়ি পাঠের বিচিত্র আনন্দের জন্য। সে অভ্যাস আজও আমার রয়েছে।

ভারতীয় ও ইউরোপীয়—আবাল্য দুটি ভাবধারাই ছিল আমার কাছে সত্য। প্রেরণার জন্য আমি কখনও ফিরে তাকাতুম অতীতের দিকে। সে

অতীত স্বদেশের অতীত। আবার কখনও তাকাতুম পশ্চিমের দিকে। যে পশ্চিম স্বযুগের ভাবকেন্দ্র। পূর্ব ও পশ্চিম দিক-সূচক শব্দ হলেও পূর্ব-পশ্চিম বলতে আসলে যা বোঝাত তা যুগসূচক। প্রাচী বললেই মনে আসে একটা প্রাচীন ভাব। আর প্রতীচী বললেই একটা আধুনিক ভাব। তাই মিলন নামে পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের, কাজে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার। কিন্তু এই মিলন বা বোঝাপড়া হবে কী করে? হবে কতখানি? রামমোহনের সময় থেকেই এ চিন্তা আমাদের চিন্তানায়কদের চিন্তিত করে এসেছে। ভারতের স্বাধীনতাও যে প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর নয়। আমরা ক্রমশ হৃদয়ংগম করছি যে দেশকে স্বাধীন করাই যথেষ্ট নয়, দেশের মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, নির্মাণ করতে, সৃষ্টি করতে শেখাতে হবে। পশ্চিমের সঙ্গে আধুনিকের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। পশ্চাতের সঙ্গে ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে হবে। জনগণের সঙ্গে, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সার্থক সংস্কৃতির এই তিনটে দিক।

কৈশোরেই আমি প্রেমের কবিতা লিখেছি। সে সব কবিতা আমাকে সাহিত্যের আসরে এনেছে। কিন্তু কীসের প্রেরণায় আমি লিখি—প্রেমের না পশ্চিমের—আমার প্রথম জীবনে এটা সুস্পষ্ট ছিল না। অবশেষে নিয়তিই আমার গতি স্থির করে দেয়। আমি পশ্চিমেই যাত্রা করি। ফলে পশ্চিমকে অবলম্বন করেই আমার প্রকৃত সাহিত্যিক জীবনের সূচনা। পরে দেশে ফিরে এসে রাজকর্ম উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে ঘুরি, নানা স্তরে মিশি, জীবনের বহু অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু জনগণের শরিক হতে পারিনি। প্রকৃতির সঙ্গেও আমার নিবিড় আত্মীয়তার সুযোগ মেলেনি। আবার নাগরিক সভ্যতার কাছেও আমি নিজেকে বিকিয়ে দিইনি। জীবনধারণের সঙ্গে সাহিত্যের ধরন কিছুটা হাত ধরাধরি করে চলে। তাই রাজকর্ম থেকে অকালে অবসর নিয়ে আমি সাহিত্যকে প্রধান আশ্রয় করি। আমার সাহিত্যিক জীবনে টলস্টয়ের কাছে পেয়েছি সত্যের প্রতি অনুরাগ, রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছি সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ। যদিও আমার প্রধান কাজ সৃষ্টি, সৃষ্টি করি আর একটুর পর একটু মুক্ত হই, তবু আমাকে কখনও কখনও সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে দেশের ও কালের ভাবনার ভাগ নিতে ও দিতে হয়। নইলে আমি হব পলায়নবাদী।

কয়েকটি থিম : প্রেম, সৌন্দর্য, সত্য, রিনিউয়াল

প্রশ্ন ॥ বহু বড়ো লেখকের রচনায় থিমের দিক থেকে একটা কক্ষ-পথের বা সার্ত্রের ভাষায় "central function"-এর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন বিভূতিভূষণে প্রকৃতি-মানুষ-ঈশ্বর। জ্যোতিরিন্দ্রে প্রকৃতি-মানব

প্রকৃতি-নারী। হেমিংওয়েতে বিরুদ্ধ-শক্তি ও ম্যানলিনেসের সংঘাত থেকে উঠে-আসা human quality যা সমালোচকের ভাষায় 'ultimately leads or adds to spirit of mankind'। আপনার লেখায় থিমের দিক দিয়ে অনুরূপ কোনো সমীকরণ পাওয়া যায় কি না ভাবছিলাম। মানুষের স্বাধীনতা, মানবের মুক্তি নিয়ে আপনার সাহিত্য ভেবেছে। এই মুক্তি আপনার মতে জীবনসংগ্রামেরই মধ্য দিয়ে হয়, নারীর মধ্য দিয়ে হয়। নারীর কাছে আমরা কী চাই? চাই যৌন সুখ, সন্তান সুখ, গৃহ সুখ, সঙ্গ সুখ। এই নারী জীবনসংগ্রামেরই একটি অংশ যে সংগ্রাম শুধুমাত্র কোনো একক ব্যক্তির নয়, বিশ্বব্যাপী সমস্ত মানুষের আজ হোক কাল হোক, biological need / safety need / ego need / social need মেটাবে। আপনি নিজের সাহিত্যের প্রধান থিমটি নিয়ে কিছু বলুন ও কীভাবে বিভিন্ন কন্‌সেপ্টের মধ্য দিয়ে তাকে চূড়ান্ত রূপ দেন তাও।

উত্তর॥ সাহিত্যিকমাত্রেরই কিছু-না-কিছু বক্তব্য থাকে, যেটা তার নিজস্ব বক্তব্য, অন্য আর কোনো সাহিত্যিকের মতো নয়। কিন্তু আমার বক্তব্য যে কী সেটা কি আমি নিজেই প্রথমে ভালো করে জানতুম? একটু একটু করে, পদে পদে, ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে জানতে পেরেছি। অল্প বয়স থেকে দুটো জিনিসকে বড়ো বলে জেনেছি, একটা হচ্ছে নরনারীর প্রেম, আর একটা আর্টের প্রতি অনুরাগ। নরনারীর যে প্রেম, তা সারাজীবন ধরে সাধনা করলেও শেষ হয় না। নর আর নারী—তারা দুটি আত্মা। আমি ও আমার প্রিয়া আমরা যেমন দুজন, তেমনি আমরা একই সত্তার দুটি দিক, আমাদের মধ্যে একটা একাত্মতা রয়েছে। সেই একাত্মতা দেহে দেহে, মনে মনে, আত্মায় আত্মায়। দেহের মিলনই সব নয়, তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, আরও একটু গভীরে যেতে হবে, আরও একটু উপরে উঠতে হবে, সেইটিই লক্ষ্য। সেইটিই প্রেমের আদর্শ। তা কার জীবনে কতটুকু সম্ভব বলা যায় না, তবে চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি নিজে সম্পূর্ণ হই আর না হই, আমার প্রিয়া সম্পূর্ণ হন কি না হন, আমি বিশ্বাস করি, eternal বলে একটা কিছু আছে। তা কী সেটাই আমার প্রশ্ন, সেটাই আমার ধ্যান। গল্পে, উপন্যাসে তাকেই আমি ধরতে চেয়েছি। এই শাশ্বত প্রেমের অন্বেষণে আমি নিয়োজিত আছি, এই-ই আমার অন্বেষা। আমার আরও একটা অন্বেষণ আছে, সৌন্দর্যের, রসের, এক কথায় বলা যায়, আর্টের। সেটাও একটা সম্পূর্ণতা, আর তার অন্বেষণ এক নিরন্তর প্রসেস। আমি সুন্দরকে অনুসরণ করে যাচ্ছি, কিন্তু সে আমাকে ধরা দিচ্ছে না, এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত অসুন্দর, সমস্ত কুশ্রীতার মধ্য দিয়ে আমি তাকে অনুসরণ করে চলেছি, আমার তো কোনো শর্টকাট পথ নেই, আমার পরিত্রাণের পথ জীবনের

অসুন্দর থেকে পলায়নে নয়, পলায়মানা সৌন্দর্যদেবীর অন্বেষণে। আমাকে কঠিন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সুন্দরকে পেতে হবে, পেলে আমার মুক্তি। কখনও কখনও এই সুন্দরের সঙ্গে প্রেমের মিলন ঘটে, যা সুন্দর তা প্রেমময় হয়ে ওঠে, সে এক সুগভীর অভিজ্ঞতা। আমার আরও একটা অন্বেষণ আছে সত্যের অন্বেষণ। সত্য কী, তা এককথায় বলা যায় না। সেই experiment with truth নিয়ে 'সত্যাসত্য' উপন্যাস লেখা। যেমন প্রেমের অন্বেষণ নিয়ে লেখা 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাস।

প্রশ্ন ॥ আপনার সাম্প্রতিক উপন্যাস 'ক্রান্তদর্শী'র কথায় আসছি। ৩৫ বছর ধরে এই বই লিখবেন বলে তৈরি হয়েছেন, চার খণ্ডে লেখা হবে, জীবনের বড়ো একটা কাজ। চার খণ্ড শেষ করেছেন, তা পড়েওছি। বক্তব্য ও বিবরণ প্রধান। বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে একটা দেশের সন্ধিকালকে ধরতে গেলে বক্তব্যের কিছুটা প্রাধান্য ঘটবেই। সার্ত্রের Roads to Freedom উপন্যাসমালাতেও তা ঘটেছে, এতে কোনো ক্ষতি নেই। 'ক্রান্তদর্শী' পড়ে একটা অদ্ভুত মননশীল ও নান্দনিক তৃপ্তি পাওয়া যায়। টেলিস্কোপে দূরের জগৎ দেখার মতো উত্তেজনাময় ও স্পন্দনশীল এক অনুভূতি। 'বারাব্বাস'-এর যেমন অদৃশ্য নায়ক যীশুখ্রীস্ট, 'ক্রান্তদর্শী'র নায়ক তেমনি গান্ধী—the invisible hero। এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও কাঠামো সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চাই।

উত্তর ॥ সত্য, প্রেম, সৌন্দর্য: এ ছাড়াও আর-একটা থিম বহুদিন ধরে আমাকে নাড়া দিচ্ছিল, তা হল 'রিনিউয়াল'। একটা দেশের, একটা জাতির রিনিউয়াল। যা একটা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বলতে হবে। যদ্দিন পারি এই থিমকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষে দেখলুম আমি ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, কেননা আমার কাছে যত তথ্য আছে তেমন আর কারুর কাছে নেই। তখন লেখায় হাত দিলুম। রিনিউয়ালের কোনো বাংলা হয় না, শেষকালে তাই উপন্যাসের নাম রাখলুম 'ক্রান্তদর্শী'। একদিকে দিয়ে দেখলে একে 'সত্যাসত্য'-এর সিকোয়েল বলতে পার। তবে এতে মহাত্মাজিকে এনেছি। তাঁকে পরোক্ষভাবে রেখেছি এ বইয়ে, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে আঁকার শক্তি আমার নেই, কারও আছে কি না সন্দেহ। তেমন করে আঁকতে বহুকাল লেগে যাবে। পরোক্ষভাবে তাঁকে এনেছি, তাঁর উপস্থিতি নানাভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই বইয়ের পথ খুব কঠিন পথ। অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনা। বহু বাস্তব ও কাল্পনিক চরিত্র। তার মধ্যে কোন্ কোন্‌টাকে রাখব ভেবে বের করতে হয়েছে। কীভাবে রাখব তাও ভাবতে হয়েছে। চার খণ্ড শেষ করে যে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট তা নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালোভাবে আর করা গেল না। মানুষ যা ভাবে

সবসময় তা হয় না। তবে যেটা হয় সেটাও কিছু কম নয়। এ আমি আমার নিজের জীবনেই দেখেছি। জীবনের কোনো ঘটনা বা নিজের কোনো সৃষ্টি হয়তো best হল না কিন্তু 'next to the best' হতে পারে। 'ক্রান্তদর্শী' যা লিখেছি হয়তো খুব ভালো হয়নি, তবে খারাপও হয়নি। লিখতে লিখতে অনেক আনফোরসীন্, আনপ্রেডিক্টেবল জিনিস এসেছে, ফলে গল্পের ধারা বদলে গেছে, অনেক ঘটনাকে রিইন্টারপ্রেট করার সুযোগ পেয়েছি। তবে সাধারণভাবে দেশের স্বাধীনতা-ই মূল বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে। বইটা শেষ করার তাগিদটাই বড়ো ছিল, কেননা তা হলে একটা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই।

এর পর আর কোনো উপন্যাস লেখার দায় আমার নেই। যদি লিখতে পারি তবে সৌন্দর্যের অন্বেষণ নিয়ে লিখব, বুক অব্ বিউটি। এটা উপেক্ষিত রয়ে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ যে সৌন্দর্যচিন্তা তা মনের মতো হচ্ছে না। ফলে আরও একটা বই লেখার দরকার হতে পারে। জানি না তা কোনোদিন পারব কিনা।

ছোটগল্প

প্রশ্ন ॥ আমার সবচেয়ে ভালো লাগে আপনার গল্প। প্রায় পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে আপনার গল্প একাধিক পর্যায়ের ভেতর দিয়ে গেছে। প্রথম পর্যায়ে আপনার গল্প মূলত ঘটনামূলক, রিয়্যালিটির বাইরের দিক নিয়ে লেখা, সেগুলো উইথ্ টি ন্যারেটিভের। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে রয়েছে রিয়্যালিটির ভিতরের দিকের কথা, এক প্রকার ইনার ভিশনের উপস্থিতি, সেগুলোতে সংলাপের প্রাধান্য। আরও একটি পর্যায় না হলেও ধরন আমি খুঁজে পাই 'সোনার ঠাকুর মাটির পা', 'বারুণী', 'পমক্রেট' প্রভৃতি গল্পে। 'দি ডেথ অব ইভান ইলিচ' গল্পে যেমন এমন একটি কনসেপ্ট গল্পে রূপ পেয়েছে যা নিয়ে একখানা বৃহৎ উপন্যাসও লেখা যেত, আপনার কনসেপ্ট ভিত্তিক ওই গল্পগুলিতে তেমনি স্বল্প পরিসরে এত খোরাক দিয়েছেন যে তা নিয়ে এক একটি উপন্যাস লেখা কিছু কঠিন নয়। এইসব গল্পের সংলাপও নেহাত সংলাপ নয়, এক ধরনের বিদগ্ধ বিতর্ক। এ গেল অ্যাটিচুডের দিক। এ ছাড়া আছে শৈলী ও মননশীলতার গল্প, গল্পর আত্মজৈবনিক উপাদান। আমি আপাতত এখানে জানতে চাই বিষয়গত ও আঙ্গিকগত উভয়ভাবে আপনার ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে।

উত্তর ॥ এক একটা উপন্যাস লেখা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, তার জন্য কঠিন পরিশ্রমের দরকার। তবু আমি উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম।

ছোটগল্প লিখতে আমার সাহসে কুলোয়নি। ছোটগল্পের যে ওস্তাদি তা আমার আয়ত্তে ছিল না। ফলে গল্প ভয়ে ভয়েই আরম্ভ করা গেল। দু-চারটি লিখে দেখা গেল তেমন সুবিধের হচ্ছে না। তখন হঠাৎ খেয়াল বশে 'প্রকৃতির পরিহাস'-এর গল্পগুলো মনে এল। একটু ব্যঙ্গাত্মক, জীবনের কৌতুককর দিক, মানুষের চরিত্রের অসংগতি ইত্যাদি নিয়ে লেখা। তবে গল্পের এনটারটেনিং ভ্যালু সম্পর্কে আমার আগ্রহ চিরকাল কম. ফলে ক্রমে ব্যঙ্গ কৌতুক কমিয়ে আরও গভীরে যেতে চেষ্টা করলুম। তখন লেখা হল 'মন পবন', 'কামিনী কাঞ্চন,' 'রূপের দায়'। এসব গল্পে ইমোশনের প্রাধান্য ঘটল।

এর পর আমি অনুভব করলুম আমার গল্পের উপজীব্য হবে কোনো না-কোনো বিশেষ উপলব্ধি। গল্পে শুধুই কাহিনী নয়, একটা অন্তর্দর্শনেরও প্রতিফলন থাকবে। এ রকম গল্প আমি অনেকদিন ধরে লিখলুম। তারপর এই পর্বটাও শেষ হয়ে এল, দেখলুম এরকম গল্প আর আসছে না। এদিকে তখন আমার গল্পের একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে, ফলে গল্প লিখতে হচ্ছে, তাই কিছু ঘটনামূলক গল্প লেখা শুরু করলুম। বাইরের ঘটনা অবলম্বন করে লেখা হলেও এগুলোর মধ্যে কাল্পনিক উপাদানও ছিল। কল্প না হলে গল্প হয় না। তবে বিশুদ্ধ গল্প এগুলো নয়, দেশ কাল ও জনতার বিভিন্ন ভাবনা ও সমস্যার কথা এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে তা যাতে নিছক বিবরণী না হয়ে পড়ে সেদিকে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। কোথায় তার নিগূঢ় অর্থ, সূক্ষ্ম তাৎপর্য—এই আমার জিজ্ঞাসা। গল্পে এরই উত্তর পেতে ও দিতে চাই। এই পর্বটা শেষ হয়ে গেল 'বিনা প্রেমসে না মিলে' গল্প দিয়ে। এর পর গল্প আর আমি লিখিনি। গল্পের অনুরোধ আসে, কিন্তু সাধারণ, বাজার চলতি গল্প আমি লিখতে পারব না।[১]

কবিতা

প্রশ্ন ॥ আলাপ করতে হবে কবিতা নিয়ে। আপনি অনেকদিন আগে বলেছিলেন, আমার আসল কাজ কবিতায়। কবিতা না লিখলে আমার মুক্তি পরিপূর্ণ হবে না। কিন্তু তার আগে আমাকে উপন্যাসের কাজ কমিয়ে আনতে হবে। নইলে আমার কবিতা হবে না। অর্থাৎ কবিতাকে আপনি খুবই জোর দিয়েছিলেন।

উত্তর ॥ আমি আগে ছড়া লিখতুম না, কবিতা লিখতুম। পরে ছড়া লিখতে গিয়ে যে কারিগরি দক্ষতা আয়ত্তে এল তা আমার কবিতায়ও কাজে আসে। আমার হাত তৈরি হয়, ফলে কবিতা লিখতে গিয়ে ভাব নিয়ে বিষয় নিয়ে আমাকে ভাবতে হয় কিন্তু ভাষা নিয়ে ছন্দ নিয়ে আর ভাবতে হয়

না। কবিতার গভীর ব্যাপ্তি, তা যে কোনো ভাবে হয়, যে কোনো ছন্দে, এমনকি গদ্যেও। আমি কিছুকালের জন্য 'ম্যান অব্ অ্যাকশন' হয়েছিলুম, কিন্তু মূলত আমি 'ম্যান অব্ থট্।' আমার সব কিছুই ইচ্ছাকৃত, চিন্তাকৃত। কবিতা কিন্তু কবির কাছে থটের চাইতে বেশি কিছু দাবি করে। বিশুদ্ধ আবেগ ও গভীর আনুগত্য তার দাবি। আমি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নানান জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। তারই ফাঁকে প্রতি বছর দুটো একটা করে সনেট লেখা হয়, আর কিছু হয় না, কবিতা একটা সাধনা খুব কম কথার মধ্যে বেশি কথা বলতে পারাটা একটা সাধনা। এর জন্য নিয়মিত সময় দেওয়া চাই। কবিতার মুড না এলে আমি কবিতা লিখিনে। স্বতঃস্ফূর্তি তার প্রথম শর্ত। চাকরিতে জড়িয়ে পড়ে আমি সময় যদি-বা পাই মুড পাইনে, স্বতঃস্ফূর্তি পাইনে। অমনি করে কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক কেটে যায়। চাকরি থেকে বেরিয়ে এসেও নানা কাজে হাত দিই। কবিতা হয় উপেক্ষিতা। তার বৈরী হয় গদ্য। প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প। বছরে একটা কবিতাও আসে না। আসত, যদি আমি ছন্দ মিলের ধার না ধারতুম। যদি ফ্রী-ভার্স লিখতুম। কিন্তু আমার রুচি অন্যরূপ।

কবিতা লেখা বন্ধ রাখার আরও এক কারণ ছিল। কবিতার ভাষা সেকেলে হয়ে উঠেছিল। তাকে একেলে করা সহজসাধ্য ছিল না। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, ছড়ার ভিতর দিয়েও কিছু কিছু করেছি। বছর পঞ্চাশ আগে কবিতা লিখতে লিখতে আমার মনে হয়েছিল কবিতার ভাষা ঠিক না হলে কবিতা ঠিক হবে না। ভাষা নিয়ে দশ বছর খাটতে হবে আমাদের কবিদের। দেখলুম, বাংলা গদ্যের বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পদ্যের ভাষার তেমন কিছু পরিবর্তন হয় নি। কবিতাকে পদ্য রেখে পদ্য ছন্দের শাসন মেনে তার ভাষা বদলে দেওয়া যায় কি না এই হল তখনকার দিনে আমার প্রথম জিজ্ঞাসা। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিজ্ঞাসা হল ছন্দ যথেষ্ট হয়েছে, এবার একটু সুর এলে মন্দ হয় না। সুর কিন্তু গানের সুর নয়। গানের সুর সংগীতের রাজ্যের ব্যাপার। সংগীত আমার পক্ষে পররাজ্য। আমি চাই কবিতার সুর, কথার সুর। গায়কের সাহায্য না নিলেও যে সুর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। লক্ষ্য করলুম অমিয় চক্রবর্তী এ লাইনে কিছু কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর কবিতার ছন্দ পদ্যছন্দ নয়, গদ্যছন্দ। একটা প্রচ্ছন্ন সুর তাঁর কবিতায় গুনগুন করে।

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই সমস্যাটা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ছড়ায় মন দিতে চেয়েছিলেন। লেগে থাকলে সেই মার্গে সমাধান পাওয়া যেত।

প্রশ্ন॥ আপনার যে সুন্দরের পিপাসা তার ও আপনার জীবন-দর্শনের সবচেয়ে প্রগাঢ় ও সবচেয়ে অন্তরঙ্গ প্রকাশ কবিতায়। কবিতায়

আপনার প্রধান থিম প্রেম, প্রেমের প্রধান মোটিফ রাধাতত্ত্ব—যেমন এই সমস্ত কবিতার নাম করা যায় : কৃষ্ণ, রাধা, মাথুর, পঞ্চসপ্ততিপূর্তি, অর্ধ, শতবর্ষ পরে, বাণী উন-অশীতিতমা, বাণী অশীতিতমা, বাণী এক-অশীতিতমা, ইত্যাদি। আপনার 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসমালায় এবং আরও কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পেও রাধা মোটিফ ও রাধাতত্ত্বের কথা এসেছে। এই বিষয়ে কিছু বলুন। আধুনিক ও নাগরিকমনা ব্যক্তির জীবনে এই তত্ত্ব কীভাবে কার্যকর হতে পারে?

উত্তর॥ সৈয়দ আলী আহসান মশাইও একবার আমাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি আধুনিক জীবনের মধ্যে বৈষ্ণব রসের আস্বাদনকে কী করে সার্থক করবেন?' তোমাকে বলেছি, আমি বিশ্বাস করি, ইটার্নাল বলে একটা কিছু আছে। সেই শাশ্বত প্রেমের অন্বেষণে আমি নিয়োজিত। 'রত্ন ও শ্রীমতী' সেই অন্বেষণের কাহিনী। সেখানে আদর্শ প্রেমের সমুন্নত প্রকাশ। নর-নারীর প্রেমকে আমি কোনো কালেই বিশুদ্ধ নিরামিষ বা নিছক সামাজিক করে রাখিনি। প্রথমে প্রণয়, তারপরে প্রণয়কে কামনার অগ্নিদাহনে বিশুদ্ধ করে জানা, অবশেষে সকল সম্পর্কের উপরে উঠে চিত্তের গভীরে প্রণয়কে আবিষ্কার। বৈষ্ণব রসের আনন্দকে প্রকাশ করতে হলে দ্বিতীয়বার সেই অনুভূতির রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। আমি বহুজনের জীবনে বহুকাল ধরে জীবনলাভ করতে চাই। সীমার ভিতর অসীমকে পুরতে জানাই আর্টের বিষয়। আমি মনে করি, সর্বোচ্চ সত্যকে জানতে গেলে মিস্টিক অনুভূতিও চাই। শুধু ইনটেলেক্ট দিয়ে হয় না। আবার গুরুর কাছে গিয়ে, শাস্ত্র পড়ে, তীর্থ পর্যটন করেও সত্যকে জানা যায় না। এটা জানা যায় দৈবক্রমে। আমি ভগবানের কৃপায় বিশ্বাস করি। হায়ার পাওয়ার বলে কিছু একটা আছে।

প্রশ্ন॥ এই প্রসঙ্গে আপনার আর একটি থিম, পরমা নারীর কথাও আসে। The Eternal Feminine। আপনার ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'She who is everywhere and nowhere—the Woman among Women—the womanly spirit or feminine principle—who is not to be possessed but felt.'

উত্তর (হেসে)॥ ঠিক-ঠিক। আইডিয়াটা পাই আমি গ্যেটের কাছ থেকে—The Eternal-Womanly draws us above, সে-ই সেরা রমণী, চিরন্তন তবু চির নতুন রাধা, সৃষ্টির হ্লাদিনী শক্তি, প্রেমের সাধ্য শিরোমণি—

দেবী নয়, নারী, তবু উর্ধ্বে নিয়ে চলে
উর্ধ্ব হতে আরো উর্ধ্বে, বৈকুণ্ঠ যেথায়
কবিপ্রিয়া বিয়াত্রিস সরণি দেখায়
কবি তার সংগ রাখে একা নভস্তলে।

ছড়া

প্রশ্ন॥ আপনার ছড়া তো প্রবাদপ্রতিম। তার ভাব ভাষা ছন্দ সুর আর বক্তব্য বারবার প্রণিধানযোগ্য। সে বিষয়ে কিছু শুনব।

উত্তর॥ কী ভাগ্যি রবীন্দ্রনাথের সংগে একদিন রেল পথে নিভৃত ভ্রমণ ঘটে। তিনি বলেন, 'আমি আজকাল ছড়া লিখছি। তুমিও লেখো না কেন?' আমি সবিনয়ে নিবেদন করি, 'ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না'। তিনি কলকাতা ফিরে গিয়ে কী মনে করে আমাকে তাঁর 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন। সেই একটি উপহারই আমি কবিগুরুর কাছ থেকে পেয়েছি। তাতে তাঁর নিজের অনেকগুলি ছড়া ছিল। তিনি কি চেয়েছিলেন যে আমিও সেরকম কিছু লিখি? তেমন ক্ষমতা বা অভিলাষ আমার ছিল না। যুদ্ধের মাঝখানে বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে কবিতা লিখতে গিয়ে হঠাৎ আমার ছড়ার হাত খুলে যায়। 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের জন্যে বুদ্ধদেব বসু ষোলটা কবিতা চেয়েছিলেন। তখন ছড়া পড়তুম। ইংরেজি ক্লেরিহিউ, লিমেরিক, রুথলেস্ রাইম, ব্যালাড। ছড়া লিখতুম না। বুদ্ধদেববাবুর তাগিদে হঠাৎ কিছু ছড়া তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু সেসব ছড়া ছোটোদের জন্যে লেখা নয়। বড়োদের জন্যে লেখা।

প্রশ্ন॥ কিন্তু এর আগেই ১৯২৭ / ১৯২৯ বা ১৯৩০ সনে ছোটোদের জন্য আপনি লিখেছেন 'লণ্ডন ফগ্', 'লণ্ডনের শীত', 'লণ্ডনের গ্রীষ্ম', 'উই পোকাদের গান' এইসব ছড়া, ও সেগুলো মৌচাকের মতো কাগজে বেরিয়েছে।

উত্তর॥ এগুলো যখন লিখেছি তখনও ছড়া লিখব এমন অভিলাষ আমার হয়নি। অনেকটা পদ্যের মতো করেই এগুলো লেখা। ছড়া লিখব—পরিষ্কারভাবে এই সিদ্ধান্ত নিই পরে। তখন দেখা যায়, আমার কতক ছড়া ছোটোদের জন্যে, কতক বড়োদের জন্যে, কতক ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সকলের জন্যে। ছোটোদের জন্যে লেখার খেয়াল যখন জাগে তখন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' আমার আদর্শ হয়। রবীন্দ্রনাথের ছড়া নয়। সুকুমার রায়ের ছড়াও নয়। যদিও আমি এঁদের ছড়ার ভক্ত।

প্রশ্ন ॥ ছড়া লেখার বহুল প্রচলন ও সচেতন হয়ে ছড়া লেখার অভ্যাস সাম্প্রতিক, বিগত এই কয়েক দশকের। আর এই সময়ের স্বাভাবিক ও সার্থক ছড়াকাররা প্রায়ই অন্য কোনো বিষয়ে সচেতন লেখক, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, পরিশীলিত মনের অধিকারী। তো ছড়া লিখবেন—এই সিদ্ধান্তের পিছনে আপনার কোন্ সচেতন চিন্তা কাজ করেছিল?

উত্তর ॥ একটা লক্ষ্য ছিল আমার। জনসাধারণের কাছ থেকে আমি কত কিছু নিচ্ছি, কত কিছু পাচ্ছি, তার বদলে তাদের দেব কী? যারা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে আরামে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের শ্রমের ঋণ আমি শোধ করব কী উপায়ে? আমি তো চাষি বা কারিগর বা মজুর নই। এ ঋণ অর্থ দিয়ে শোধ করা যায় না। সেইজন্যে গান্ধীজি বলেছেন সুতো কেটে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ঋণ শোধ করতে। কায়িক শ্রমে আমার মন নেই। জোর করে চরকা কেটেছি, ছেড়ে দিয়েছি, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ইত্যাদির মতো এটাও এক প্রকার ঋণ। কাব্যে বা উপন্যাসে বা প্রবন্ধে এ ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি। পারবও না। কোনো মতেই সেসব রচনা সহজ-বোধ্য হবে না। সহজবোধ্য করতে গেলে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। সেটা আমার নীতি নয়। তা হলে আমি কী করব? আমি ছড়া লিখব। কিন্তু লিখতে পারব কি? 'না' 'না' করতে করতে একদিন লিখেই ফেলি।

প্রশ্ন ॥ অর্থাৎ সকলের উপযুক্ত করে কিছু লেখার জন্য একপ্রকার জনসাহিত্যের মতো আপনি ছড়াকে নিয়েছিলেন। এমন লেখা যা আত্মসচেতন না হয়ে পড়ে। যা পড়ারও দরকার নেই। শুনলেই সবাই বুঝতে পারে—

উত্তর ॥ আমাদের সাবেক কালের ছড়া ছিল মৌখিক ঐতিহ্যের, মুখে মুখে কাটা হত, কানে শুনে মনে রাখা হত। কাগজ কলম নিয়ে মাথা খাটিয়ে বানানো হত না। ঠাকুমা দিদিমা মাসি পিসির বা চাষাভুষার অশিক্ষিত মুখের ছড়া এক জিনিস আর চালাক-চতুর সেয়ানা লেখকের পাকা-হাতের ছড়া আর-এক জিনিস। আমি মৌখিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করতে চাই। তাই অচেনা অজানা ছড়াকারদেরই গুরুবরণ করি। ছল চাতুরি সযত্নে পরিহার করি। কলেজে পড়াশুনো করে বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, সরকারি চাকরি করতে করতে আমার মনে পাক ধরেছিল। আমার উপন্যাস প্রবন্ধ বা গল্প পড়তে গেলেই সেটা টের পাওয়া যেত। সেই আমি সব রকম কৃত্রিমতা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যখন ছড়া লিখতে বসে পড়ি তখন আমি অন্য ধাতের মানুষ। আমার অন্য এক স্বরূপ। আমি মনে করি ছড়া যদি কৃত্রিম হয় তবে তা ছড়াই নয়, তা হালকা চালের পদ্য। গল্প উপন্যাস বানিয়ে বানিয়ে লেখা যায়, ছড়া বানাতে গেলে তা ছড়ার মতো শোনায় না। পদ্যের মতো শোনায়। তাতে বাহাদুরি থাকতে

পারে, কারিগরি থাকতে পারে কিন্তু তা আবহমান কাল প্রচলিত খাঁটি দেশজ ছড়ার সঙ্গে মিশ যায় না। মিশ খাওয়ানোটাই লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারি তবেই আমার ছড়া মিশ খাবে নয়তো নয়।

প্রশ্ন ॥ আপনার বহু ছড়াই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং আপনার ছোটোদের জন্য লেখা ছড়াও বহু বয়স্ক ব্যক্তি নিয়মিত পড়েন ও পড়ে মনে রাখবেন। এইসব দিক দিয়ে বিচার করলে আপনার ছড়া কালজয়ী ও সর্বজনীন হয়েছে বলতেই হবে।

উত্তর ॥ ছড়ার জন্য আমি অসংখ্য ফরমাস পাই। কিন্তু আমার নিয়ম হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত না হলে ছড়া না লেখা। ম্যানুফ্যাকচার না করা। কিন্তু কী করি, কেউ চাইলে 'না' বলতে পারি নে। সময় চেয়ে নিই। সবুরে মেওয়া ফলে। ছড়ার প্রেরণা আসে। ছড়া কত রকমের হয়। ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় তার অশেষ বৈচিত্র্য। বাংলায় এত রকমের বৈচিত্র্য নেই। চেষ্টা করেছি কিছু বৈচিত্র্য যোগ করতে। কিন্তু জোর করে নয় কেননা ছড়া লেখা একটা ইন্ডাস্ট্রি নয়। ছড়া লেখা একটা আর্ট। সেই শিল্পের সাধনা করে আসছি বহুদিন ধরে। আমার ছড়া কালজয়ী হয়েছে কি না বলতে পারিনে! যাদের জন্য লেখা তারা বিচার করবে।

প্রশ্ন ॥ এই প্রসঙ্গে এবার আমরা ছড়ার আঙ্গিকের কথায় আসব।

উত্তর ॥ বলেছি, আমার কাছে আদর্শ ছড়া ছিল, 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', 'খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল', 'হাট্টিমা টিম টিম' এইসব। খাঁটি লোকসংস্কৃতি মুখে মুখে যা ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষানুক্রমে যা সঞ্চারিত হয়। একদিকে এই আর একদিকে হিউমারাস বা ননসেন্স কিছু। এইসব লোকছড়ায় কতদিনের অভিজ্ঞতা, ফোক উইসডম ধরা থাকে। এ ছাড়া নানান সম্প্রদায়ের ছড়ায় নানা এথনিক ব্যাপারও থাকে। আধুনিক ব্যঙ্গ বা সূক্ষ্ম কল্পনার চেয়ে আমি চেয়েছিলুম ছড়ার মধ্যে দিয়ে ওই সাধারণদের জন্য বলতে। এমনিতে কবিতার মতো ছড়ার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, ছড়া বানাবার। ছড়া হয় আকস্মিক, ইররেগুলার। সেখানে আর্ট আছে, আরটিফিসিয়ালিটির স্থান নেই। ছড়া হবে ইররেগুলার, হয়তো একটু আনইভেন। বাকপটুতা, কারিকুরি নয়। কবিতা থেকে ছড়া আলাদা, ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে কবিতাকে ব্যাপ্ত করে নিতে হয়। কবিতা তো যে কোনো ভাবেই হয়, যে কোনো ছন্দে, এমনকি গদ্যেও। ছড়ার কিন্তু একটাই ছন্দ রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ছড়ার ছন্দ, একটু দুলকি চালে চলে, শাস্ত্রসম্মত নামও একটা আছে তার। ছড়া ওই ছন্দেই লেখা যায় শুধু। আমিও ওতেই লিখেছি মূলত। হয়তো কোথাও কোথাও

অন্যরকম করেছি, কিন্তু আসল ছন্দটা ওই। আর ছড়ার মিল দু সিলেবল হবে, তিন সিলেবল হলে আরও ভালো হয়। আর শেষে কোনো যুক্তাক্ষর থাকবে না। এসব অনেকে এখন মানেন না, এক সিলেবল মিল দিয়ে ছেড়ে দেন, ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের মিল, যত সব ফাঁকিবাজি। ইংরেজি ছড়ায় দেখেছি শব্দ কখনো পুরোটা উচ্চারণ না করে অংশত লিখে ছেড়ে দেয়। বাংলা ছড়াতেও এটা এখন আসছে।

ছন্দ ও মিল তো থাকবেই, এ ছাড়াও ছড়ার থাকবে ইমেজ ও ভাব। ছড়ার ইমেজ মিল রেখে আসে না, পারম্পর্য কম। হাট্টিমা টিম টিম / তারা মাঠে পাড়ে ডিম / তাদের খাড়া দুটো শিং—শিং দিয়ে মিলিয়ে দেয়া হল। কমলাপুলির টিয়েটা / সুয্যিমামার বিয়েটা—ইমেজ আসছে হঠাৎ হঠাৎ। ছড়ার ঐতিহ্য অনেকদিনের বহু পুরাতনের স্পিরিট। আর এর সম্ভাবনা তো অসীম, অনেক কিছু করা যায়। ছড়া হলেই হালকা সরস হবে তা কেন? সবকিছু নিয়েই ছড়া হয়েছে, বীভৎস রস নিয়েও হয়েছে। ধাঁধা, প্রবচন, লোকগীতি, গাথা সবই তো আর সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে না আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। ছড়া যদি জনসাধারণ নেয়—শুধু আমি বা আমরা কয়েকজন ছড়া লিখব তা কোনোদিনই চাই না, সবাই লিখুক অনেকে লিখুক, তার কিছু বেঁচে থাকবে—তা হলেই ছড়ার—ছড়ার ফর্মের সারভাইভ্যাল সম্ভব।

প্রশ্ন ॥ আচ্ছা, ছড়ার বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে বলা যায়, ছড়া কখনও কবিতার মতো—ব্রত ভাসাও জলে, কন্যা / ব্রত ভাসাও জলে ; / তোমার মুখে আগুন কন্যা / পাড়ার লোকে বলে। কখনো গানের মতো—লিয়ানা গো লিয়ানা / সোনার মেয়ে তুই / কোন্ পাহাড়ে তুলতে গেলি / গন্ধভরা জুঁই? কখনো শ্লোকের মতো—সুবচনী কুচবরণী ফুল ছড়ানো গা / মাটির মায়া জলে ভাসে আগুনে ফেগে পা। কখনো ধাঁধার মতো—বকুল বকুল বকুল / বৃন্দাবন গোকুল / একে চন্দ্র তিনে নেত্র / কাশী আর কুরুক্ষেত্র। ইত্যাদি। একে কি ছড়ার আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য বলা যায়?

উত্তর ॥ না। আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য বলতে কত বিচিত্র আঙ্গিকে ছড়া লেখা যায়। যেমন লিমেরিক। যেমন ক্লেরিহিউ। যেমন রুথ্‌লেস রাইম্। যেমন ব্যালাড। যেমন ছড়া নাটিকা ইত্যাদি। তুমি যে উদাহরণ গুলো দিলে সেগুলোতে মুডের বৈচিত্র্য অ্যাপ্রোচের বৈচিত্র্য। সার্বিক আঙ্গিকের বৈচিত্র্য নয়। বিশেষ কোনো আঙ্গিকের ভেতর সেই আঙ্গিক নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা আঙ্গিকের অন্তর্বর্তী বৈচিত্র্য। সার্বিক আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এর থেকে আলাদা। যেমন ব্যালাড ঠিক ছড়া নয় কিন্তু জনসাহিত্যের শামিল।

প্রশ্ন ॥ আমি মনে করি কবি / লেখকরা, যে কথা অন্যভাবে বলছেন না বা বলতে পারছেন না, ছড়া তাঁদের দিয়ে ছড়ায় তা বলিয়ে নেয়। অত্যন্ত রাশভারী মানুষটিও যেমন পার্টি পিকনিক বা অন্য কোনো প্রমোদ অনুষ্ঠানে আচার আচরণে ও হাবভাবে স্বভাববিরুদ্ধ এমন অনেক কিছু করে থাকেন যা অন্য সময়ে করলে ভীষণ খেলো মনে হত ও ছেলেমানুষি, খুব গুরুগম্ভীর আর গুরুত্বপূর্ণ মানুষটিও যেমন ঘরে ফিরে এসে মনের মানুষের কাছে কত খোলামেলা হয়ে যান আর অন্তরঙ্গ, ছুটির দিনে দৈনিক রুটিনে যেমন স্বেচ্ছায় এমন অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে যায় যা অন্যদিনে ঘটলে হয়ে উঠত স্বেচ্ছাচার বা বিশৃঙ্খলা, ছড়াও আসলে তেমনি ওই ছুটির দিনের জিনিস, ভিতর ঘরের জিনিস, ছড়ার নাম প্রমোদন। এ বিষয়ে আপনার মত জানতে ইচ্ছে করে।

উত্তর ॥ ছোটোদের জন্যে লেখা আর বড়োদের জন্যে লেখা একই কলমে লেখা। যে লেখে সে একই মানুষ। তার মানসে বা হৃদয়ে দুটো পরিচ্ছন্ন ভাগ নেই। তবু সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে একই লেখকের দুই চরিত্রের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আমার নিজের কথায় বলতে পারি আমার মধ্যে একজন ছেলেমানুষও ছিল। যে চাইত ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি করতে। তাই একই সময়ে লেখা হয় 'বিচিত্রা'র জন্যে 'পথে প্রবাসে' আর 'মৌচাক' এর জন্যে 'ইউরোপের চিঠি' কিস্তিতে কিস্তিতে। আমি যে ভিতরে ভিতরে একটি শিশু আমাকে দেখে অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এক মহাশিশু। মহাশিশু ও মহাশিল্পী। ছড়া লেখার জন্যে তেমনি ছেলেমানুষ হতে হয়।

আমার পণ ইংরেজিতে কত সুন্দর সুন্দর ব্যালাড আছে, বাংলায় নেই, বাংলায় যাকে ব্যালাড বলে চালানো হচ্ছে তা অন্য জিনিস, অনেকদিন থেকে আমি চেষ্টা করছি ব্যালাড লিখতে কিন্তু ব্যালাড রচনায় আমার প্রগতি বেশি দূর নয়। তবে ব্যালাড আমি লিখবই যদি ছেলেমানুষ হতে ভুলে না যাই।

প্রশ্ন ॥ আমার 'অনন্ত চতুর্দশী' উপন্যাসে কয়েকটি ছড়া ছিল। সেগুলো সম্পর্কে একটা চিঠিতে আপনি আমাকে লিখেছিলেন, আর বইয়ে যে ছড়াগুলো সেগুলো যেন আপনার লেখা নয়, যেন গ্রাম বাংলায় যুগ যুগান্ত ধরে সেগুলো প্রচলিত ছিল এমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু আধুনিক কালে সত্যি সত্যি কারও পক্ষে কি আর গ্রাম্য বা লোকছড়া লেখা সম্ভব?

উত্তর ॥ এটা তো আত্মস্বাতন্ত্র্যের যুগ। চেহারায় পোশাকে আচরণে

সকলে প্রায় এক রকম হলেও শিল্পে সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজস্বতায় বিশ্বাসী। তাই আধুনিক ছড়ায় লোকছড়ার কালেক্‌টিভ সেন্সটা আর নেই! আজ প্রত্যেকের লেখায় একটা নিজস্ব ঢং এসেছে। মিল ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেকের এক এক রকম। আমারটা পড়লে বোঝা যায় এটা আমার ছড়া। আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়লে বোঝা যায় এটা কার ছড়া। সকলে মিলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে তবেই ছড়া বেঁচে থাকবে নয় তো নয়। তবে সব ছড়াই তো আর ছড়া নয়, বেশির ভাগই পদ্য।

প্রশ্ন ॥ আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একশো ছড়া' বইয়ের ভূমিকায় আপনি বলেছিলেন যে আপনার ছড়াও কখনো কখনো সেলফ্‌-কনশাস্‌ ও সফিস্‌টিকেড হয়ে পড়েছে।

উত্তর ॥ হ্যাঁ আমারও তো ভয় হয় যে কখনো কখনো আমি ছড়া লিখতে গিয়ে পদ্য লিখেছি, পথভ্রষ্ট হয়েছি। না, আমার ছড়া সব সময় ছড়া হয়নি। বোধ হয় অত বেশি না লিখলেই হত। আমি যে ভিতরে ভিতরে একটি শিশু সে-কথা যখন আমি নিজেই বিশ্বাস করি না বা ভুলে যাই, তখনই আমার ছড়া কৃত্রিম হয়ে পড়ে। পদ্যের মতো শোনায়। তবে ছড়া লিখতে গিয়ে আমার আর একটা লাভ হয়েছিল। ছড়া লিখতে গিয়ে যে কারিগরি দক্ষতা আয়ত্তে এল তা আমার কবিতারও কাজে আসে। আমার হাত তৈরি হয়, ফলে কবিতা লিখতে গিয়ে ভাব নিয়ে বিষয় নিয়ে আমাকে ভাবতে হয় কিন্তু ভাষা ছন্দ নিয়ে আর ভাবতে হয় না। ছড়ার ক্ষেত্রে আমি শুধু আমার কর্তব্যটুকুর দায়িত্ব নিয়েছি। জনগণের হৃদয়ে যদি সামান্যতম স্থান পাই. আমার একটা ছড়াও যদি তাদের মনে গাঁথা থাকে, কানে কানে সঞ্চারিত হয়, মুখে মুখে পরম্পরানুক্রমিক হয়, তা হলেই আমি ধন্য। একদিকে এই জনসাধারণ অন্য দিকে বাংলা ছড়ার নিরবধিকাল, দুইদিকে দুই মালিক আমাকে কান ধরে ছড়ার ঘরে ওঠ বোস করিয়েছে।

প্রশ্ন ॥ গানের সাথে ছড়ার নিবিড় সম্পর্ক। 'ছড়া গান' শব্দের ব্যবহারে তা বোঝা যায়। ছড়ার গীতিরূপ নিয়ে সম্প্রতি রেকর্ড বা ক্যাসেটও বেরোচ্ছে। আপনার ছড়া নিয়ে আমার গ্রন্থনায় প্রকাশিত হয়েছে ক্যাসেট—'রাঙা মাথায় চিরুনি।' অন্যেরাও আপনার বা সুকুমার রায়ের ছড়ার গীতিরূপ দিয়েছেন। এই প্রকার গীতিরূপ সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য? এতে ছড়ার জনপ্রিয়তা বাড়বে কি?

উত্তর ॥ আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ ছড়ায় লেগে থাকলে সেই মার্গ ছন্দের সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি তো বাঁচলেন না। বড়ো রকম

পরীক্ষা চালাবার মতো বয়সও তখন তাঁর নয়। আর তাঁর ছড়াও আমার কানে ছড়ার মতো লাগেনি। ছড়ায় লাইন ওভাবে শেষ হয় না। ও ধাঁচটাই ছড়ার নয়। তবে তার ভাব ভাষা ছন্দ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আর সুর। ছন্দে ছড়ানো শব্দচ্ছটা, সুরে ধরা ধ্বনিময় প্রাণ।

এখন গায়কের সাহায্য নিয়ে ছড়াকে গানের রূপ দিলে তার জনপ্রিয়তা বাড়বে মনে হয় না। হিতে বিপরীতও হতে পারে। 'তেলের শিশি' রেকর্ড হবার আগেও যেখানে গেছি সেখানেই শুনেছি। তবে ছড়ায় যারা সুর দেবেন তাদের দেখতে হবে সুরের ভারে ছড়া যেন হারিয়ে না যায়। সুরে যেন জটিলতা বা বেশি কারিকুরি না থাকে। বাদ্যযন্ত্র যেন জগঝম্প না হয়ে পড়ে। সুরে বা আবহে এমন কিছু থাকবে না যাতে ছড়ার ভাব অর্থ বা ব্যঞ্জনা নষ্ট হয়। ছড়ার গঠন যে কেমন ও রস যে কোন্‌খানে এটা তাদের বুঝতে হবে।

প্রশ্ন ॥ সমাপ্তিতে ছড়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ॥ একশো দুশো পাঁচশো বছর আগে সচেতন কবি লেখকরা ছড়া লিখতেন না। যারা ছড়া বানাত—মেয়েরা চাষিরা শিশুরা—তাদের নাম কেউ জানে না। আজ সীরিয়াস লোকেরাও ছড়া লিখছেন। ছড়ার মধ্যে সত্যি কিছু না থাকলে এটা হত না। ছড়ার ঐতিহ্য বহুদিনকার, ছড়ার ভবিষ্যৎও নিরবধি।

বিবিধ

প্রশ্ন ॥ আমি আর generalised কোনো প্রশ্ন করছি না, সেই ধরনের অনেক আলোচনা হয়ে গেল। এখন খুব particular কয়েকটা প্রশ্ন করব।

উত্তর ॥ করো।

প্রশ্ন ॥ আপনি লিখেছিলেন, 'বেশ কিছুদিন থেকে আমার লেখার উদ্দেশ্য সৃষ্টির দায় থেকে মুক্তি। রসের দায় থেকে মুক্তি। রূপের দায় থেকে মুক্তি। এই মুক্তির আস্বাদন পেলেই আমি তৃপ্ত। এক-একটা গল্প যদি উতরে যায় তা হলে তার মতো মুক্তি আর নেই। তেমন আস্বাদন যে প্রত্যেকবার পেয়েছি তা নয়। কিন্তু কয়েকবার।'[১] এটা কোন্‌ কোন্‌ গল্প বা রচনার ক্ষেত্রে? সেই রচনাগুলোর সূক্ষ্ম পয়েন্ট কী?

উত্তর ॥ দ্যাখো, আমি দেখেছি, গল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল, কোথায় শুরু করবে আর কোথায় শেষ করবে—Where to begin and

where to end। এও দেখেছি, সত্য কল্পনার মতোই বিচিত্র, এমনকি truth is stranger than fiction। কিন্তু এটা জানি যে, এই বাইরের রিয়ালিটি ও পারফেকশন ছাড়িয়ে অন্তঃসারে পৌঁছোতে হবে। আর্টের অন্তঃসার জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যে, জীবনে অন্তঃসৌন্দর্যে। অন্তরের অন্তঃসার হয়েই তা আর্টের অন্তঃসার। আর অন্তঃসারের পরবর্তী পর্যায় অন্তঃসৌন্দর্য। বছর পঞ্চাশ বয়সে হঠাৎ একদিন দৃষ্টি খুলে যায় আমার। আমি নিরীক্ষণ করি এ বিশ্বের অন্তরে আছে এক সৌন্দর্যলোক। সেই অন্দর মহলে যে প্রবেশ করে সে অন্ধকারেও পায় আলোর দিশা, অসুন্দরেও সুন্দরের দেখা, অমঙ্গলেও মঙ্গলের আভাস। আমার উপর বরাত আমাকে আরো ভিতরে যেতে হবে। আরো গভীরে। যেখানে রয়েছে সার সৌন্দর্য বা এসেনশিয়াল বিউটি। শুধুমাত্র বাইরের রূপ নিয়ে আমি করব কী, যদি অন্তঃসৌন্দর্য আমাকে ধরা না দেয়? সেই আমার সাধ্য শিরোমণি। তো মীনপিয়াসী গল্পে, ও গল্পে, বিনা প্রেমসে না মিলে গল্পে; রাজঅতিথি উপন্যাসে, কুৎসার সোনাটা কবিতায়, রাতের অতিথি কাব্যনাট্যে—এই সমস্ত রচনায় আমি মুক্তির আস্বাদন পেয়েছি।

প্রশ্ন॥ মীনপিয়াসী / ও / রাতের অতিথি—এগুলোর যা থিম তা নিয়ে তো উপন্যাসও লেখা যেত?

উত্তর॥ পাঠক লেখকের কাছ থেকে চায় নব নব আখ্যান। আখ্যান সদা নতুন না হলেও তার ব্যাখ্যান হওয়া চাই নিত্য নতুন। ফলে মীনপিয়াসী কী রাতের অতিথি নিয়ে আর উপন্যাস লেখার কথা ভাবিনি। ও সৌন্দর্যের অন্বেষণের কাহিনী। কিন্তু দি বুক অব বিউটি যদি লিখি তবে তা ও থেকে আলাদা কিছু হবে।

প্রশ্ন॥ আমার কেন জানি মনে হয়, আপনার একাধিক ছোটগল্প আসলে বড় আকার উপন্যাস, কনসেপ্টধর্মী বড় মাপের থিমকে ছোটগল্পের পরিসরে ঢোকাতে গিয়ে সেখানে সংলাপে অনেক খোরাক দিতে হয়েছে।

উত্তর॥ আয়তনে ছোটো হলেই যে গল্প বা আয়তন বৃহৎ হলেই যে মহাকাব্য বা এপিক উপন্যাস হয় তা নয়। ক্যানভাস বড় না হলে সত্যিকার ভালো উপন্যাস হয় না, এটা ঠিক। কিন্তু ক্যানভাসের চেয়ে আরও বড়ো জিনিস জীবনদৃষ্টি। সেই জীবনদৃষ্টি সবাইকে দেওয়া হয় না। অনেক দীর্ঘ উপন্যাস লেখা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে এপিকের জীবন-দৃষ্টি নেই।

প্রশ্ন॥ এক আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর মত হল, Truth is stupid,

perfection is boring। তো সত্যের অন্বেষণ আপনার উপন্যাসের একটা প্রধান থিম। আর আপনার ছড়া হল নিখুঁত রচনাকর্মের এক অনবদ্য উদাহরণ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জানতে ইচ্ছে করছে, ওই উক্তি সম্পর্কে আপনার কী মত? এটা কি ঠিক?

উত্তর ॥ মোটেই না। ট্রুথ স্টুপিড হবে কেন, কোন্ যুক্তিতে। আমি জানি না, কে কোন্ প্রসঙ্গে এসব কথা বলেছেন। আমার মতে, truth is pure, absolute। তুমি তাকে হৃদয়ংগম করতে পার কী না পার। ট্রুথ আবার ক্রুয়েলও, তুমি তাকে সহ্য করতে পার বা না পার। হ্যাঁ, অনেকে হয়তো আপেক্ষিক সত্যের কথা বলবে বা সত্যের আপেক্ষিকতার কথা। তো নেতি নেতি করেও তো সত্যকে জানা যায়, ইতি ইতি করেও যেমন জানা যায়, সেও এক প্রকার সত্যের অভিজ্ঞতা। ট্রুথকে ট্রুথের জন্যই গ্রহণ করতে হবে। যদিও আলটিমেট ট্রুথ কী তা হয়তো কেউ জানতে পারে না। তাই ট্রুথ যতটা না একটা আলটিমেট গোল, তার চাইতে বেশি একটা প্রসেস। ট্রুথের জন্য আর্জ মানুষের চিরকালের। বিজ্ঞানের উন্নতি, সভ্যতার উন্নতি তো সেইভাবেই হয়েছে। বলতে পার, ট্রুথ স্টুপিডিটি অতিক্রম করার উপায়। তেমনি পারফেকশন। তার জন্য আর্জও মানুষের চিরকালের। এই তাগিদ পশুপাখির নেই, শুধু মানুষের আছে। যদিও পারফেকশন বলে অবশ্য কিছু হয় না। এই জগৎ পারফেক্ট বা নিখুঁত নয়, মানুষ নিখুঁত নয়, শিল্পকর্ম নিখুঁত নয়। কিন্তু পারফেকশনের জন্য আমাদের নিত্য চেষ্টা।

প্রশ্ন ॥ আচ্ছা, একটা কথা বলা হয় যে, খুব পারফেক্ট কোনো সাহিত্য বা শিল্পকর্ম হয়তো very good হতে পারে কিন্তু great হতে পারে না। মহৎ শিল্পকর্ম তার ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়েই মহৎ।

উত্তর ॥ নিখুঁত শিল্পকর্ম বলে তো কিছু হয় না। তবে এ-কথা বলতে পারি, মহামানবরা তাঁদের কর্মপ্রয়াসে সাকসেসফুল হন না। যীশু হননি, বুদ্ধ হননি, গান্ধী হননি। যাঁরা সাকসেসফুল হয়েছেন তারা হয় ততটা মহান নন, অথবা তাঁদের সাধনা ততটা কঠিন বা উঁচুদরের ছিল না। কিন্তু জীবনে, কর্মে, সাধনায়, সভ্যতায় পারফেকশনের জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন ॥ আপনি রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, নান্দনিকভাবে — সমস্ত দিক থেকেই একজন মুক্ত লেখক (free writer)। আবার দার্শনিকদের মতে freedom is responsibility। আপনার প্রবন্ধ সাহিত্যে সেই দায়িত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। আপনার কিছু

প্রবন্ধ সমসাময়িক। কিছু প্রবন্ধ চিরকালীন। আপনার মতে চিরকালীন কোন্‌গুলো? আর সমসাময়িক কোন্‌ প্রবন্ধই বা যুগোত্তীর্ণ হতে পারে?

উত্তর॥ যদিও আমার প্রধান কাজ সৃষ্টি, একটির পর একটি সৃষ্টি করি আর একটুর পর একটু মুক্ত হই, তবে আমাকে কখনো কখনো সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে দেশের ও কালের ভাবনার ভাগ নিতে ও দিতে হয়। আমার ডান হাত চিরকালের মতো পিওর ডিলাইটের জন্যে রাখা। কর্তব্যের জন্যে বাম হাত। আমার অধিকাংশ প্রবন্ধই একজন ইনটেলেকচুয়ালের কর্তব্যপালন। এগুলি ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা। ফল ফলবার পর তার আর প্রয়োজন থাকে না। সমসাময়িক সমস্যা ও তার সম্ভবপর সমাধান আমাকে ভাবায়, আমিও দশজনকে ভাবাই। তো সমসাময়িক কোন্‌ প্রবন্ধ যুগোত্তীর্ণ হবে তা আমি বলতে পারিনে। মহাকাল বলবে। তুমি হয়তো বাংলাদেশ যুদ্ধ বা ভারতে জরুরি অবস্থা নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলিকে সাময়িক ধরনের বলবে, কিন্তু দেশ ভাগ, নতুন দেশ সৃষ্টি বা একাধিক দেশের একত্র মিলে একটি নতুন দেশ গঠন একটা সনাতন বা চিরকালীন প্রসঙ্গ হতে পারে, যেমন যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালেই জরুরি অবস্থা নানাভাবে প্রতিভাত হতে পারে এবং এর সঙ্গে জনগণের ভাগ্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার যে প্রশ্ন জড়িত তাও এক চিরকালীন প্রশ্ন। যেমন একশো বছর পরে হরিজন সমস্যা হয়তো থাকবে না কিন্তু বিভেদের সমস্যা তখনো থেকে যাবে। ফলে সমসাময়িক প্রসঙ্গও চিরকালীন হতে পারে। মনে হয় সাহিত্যিক প্রসঙ্গে আমার উপলব্ধির প্রকাশ যে প্রবন্ধগুলি—সাহিত্যগুরুদের প্রসঙ্গ তার মধ্যে পড়ে—সেগুলি কালোত্তীর্ণ হতে পারে।

প্রশ্ন॥ বৃদ্ধের একটা অর্থ প্রাজ্ঞ। আপনার বৃদ্ধত্ব ও বার্ধক্য অর্জনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন। In the mirror of old age আপনি নিজেকে কী রকম দেখছেন? যৌবনে যদি থাকত প্রজ্ঞা, বার্ধক্যে যদি থাকত কর্মক্ষমতা—ফরাসি প্রবচনের এই আক্ষেপ আজ আপনার মধ্যে পরিপূরণ পেয়েছে। যে সময় থেকে আপনার মধ্যে বার্ধক্যের প্রজ্ঞা ও যৌবনের কর্মক্ষমতা—এই দুটোর মিলন ঘটেছে তখন থেকে আপনার লেখায় গুণগত ও ভাবগত কী কী পরিবর্তন এসেছে?

উত্তর (হাসতে হাসতে)॥ না-না, নিজেকে আমি বৃদ্ধ মনে করি না। আর প্রাজ্ঞ হয়েছি কী না তাও বলতে পারব না। হ্যাঁ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, ম্যাচিওরিটি এসেছে। এখন জেনেছি, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। এই বয়সে রত্ন ও শ্রীমতী লেখা আর সম্ভব নয়। যেমন ক্রান্তদর্শীও যৌবনে লিখতে পারতুম না। এর নায়ক

অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, যা ঘটেনি তাও দেখতে পায়, সেই অতিক্রান্ত দৃষ্টি যৌবনে সম্ভব ছিল না। ক্রান্তদর্শী-র অন্য খামতি আছে, যেমন এখানে প্রকৃতির বর্ণনা খুব কম, তবু লিটারেরি অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে দেখলে বোধহয় এটাই আমার সেরা লেখা। বিনুর বই (২য় খণ্ড) যদি লিখে উঠতে পারি[২], তাহলে হয়তো এর চেয়ে ভালো হতেও পারে। এই ম্যাচিওরিটি, এই জীবনদৃষ্টি সময়ের দান। তবু নিজেকে আমি এখনও প্রবীণ বলে ভাবি না, নবীন বলেই ভাবি। তবে এও মানি, আয়ুষ্কালকে অযথা প্রলম্বিত করে কী হবে? যে-কাজ বাকি আছে সেটুকু সারতে পারলেই হল। কিছু কবিতা লিখতে চাই, ব্যালাড লেখার সংকল্প রয়েছে, আরও একটা ছোট উপন্যাসের কল্পনাও লালন করছি। জীবনটা পুরোপুরি নিখুঁত না হলেও নিতান্ত অসার্থক বা অচরিতার্থ না হলেই আমি তুষ্ট। এখনো কিছু দেবার আছে। দিয়ে যেতে পারলেই আমি ধন্য।

---

১. দীর্ঘকাল পরে আবার একটি গল্প লিখেছেন তিনি, নীলনয়নীর উপাখ্যান, ১৯৯৪-র পুজোয়।

২. বিনুর বই (২য় পর্ব) ইতিমধ্যে রচিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনকথা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

এক প্রাচীন শাক্ত পরিবারে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ ওড়িশার এক দেশীয় রাজ্য ঢেংকানালে অন্নদাশংকর রায়ের জন্ম। পিতা নিমাইচরণ, মাতা হেমনলিনী। যাঁর হাতে জন্ম তাঁর নাম মিসেস অ্যান্ডারসন। ধর্মে ক্রিশ্চান। যতদিন ঠাকুরদা শ্রীনাথ রায় বেঁচে ছিলেন ততদিন বাড়িতে ধর্মীয় আচার বিচার চলত শাক্ত মতে। দুর্গাপুজোতে প্রতিমার পরিবর্তে একটা তরবারির পুজো করা হত শক্তির প্রতীক রূপে।

অন্নদাশংকরের যখন ছ-সাত বছর বয়স তখন ঠাকুরদা শ্রীনাথ রায়ের দেহান্ত ঘটে। তারপর নিমাইচরণ সপরিবারে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। ওড়িশার মৃত্তিকাজ সংস্কৃতি বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত। তখন থেকে বাড়িতে বৈষ্ণব আচার অনুষ্ঠানের শুরু। কীর্তন, মহোৎসবের আসরে চেনা-অচেনা বহু মানুষের সমাগম হত। মা গাইতেন জয়দেবের দশাবতার বন্দনা, বাবা গাইতেন বিদ্যাপতি। অন্যান্য কীর্তনিয়ারা বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনপদ গাইতেন। কীর্তন আসরে যাঁরা বাংলাতে মৈথিলিতে গান করতেন তাঁরাই আবার নিজেদের সংসারে ও হাটে-বাজারে কথা বলতেন ওড়িয়া ভাষাতে। এভাবে বাংলা ওড়িয়ার একটা সমন্বিত সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকেন অন্নদাশংকর।

পদাবলি শুনে শুনে ছোটবেলাতেই অন্নদাশংকরের মর্মে গেঁথে যায় দুটি চরণ। জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল / লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল। তখন থেকেই অস্পষ্ট ভাবে তিনি উপলব্ধি করেন রূপের দায় আর রসের দায়। তারপরে বছর বারো বয়সে স্কুলের কমন রুম লাইব্রেরিতে অন্নদাশংকর 'সবুজপত্র' এবং তার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী তথা বীরবলকে আবিষ্কার করেন। এর বছর তিন-চার আগে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ লাভ করে বিশ্ববিখ্যাত হন। কিন্তু নোবেল প্রাইজ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের থেকে 'সবুজপত্র'-এর রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভঙ্গি বিষয়-ব্যঞ্জনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। প্রথম জন নিবেদনের কবি আর দ্বিতীয় জন জাগরণের কবি। অন্নদাশঙ্কর জাগরণের কবি রূপেই

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চিনেছিলেন। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ১৯৯৭-র সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে অন্নদাশঙ্কর বলেন যে 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা / ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ / আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' ইত্যাদি পদগুলোই তাঁর জীবনের গায়ত্রীমন্ত্র।

রূপের দায়, রসের দায় আর জীবনের গায়ত্রীমন্ত্র ছাড়াও 'সবুজপত্র' থেকে অন্নদাশঙ্কর আরও দুটি বিশেষ ভাব পেয়েছিলেন। একটি হল ইটারনাল ফেমিনিন বা চিরন্তন নারীর ভাবনা আর একটি হল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন সাধনা। তাছাড়া কোন্ ভাষাতে লিখব আর কেমন করে লিখব এই দুটি প্রশ্নও বালক অন্নদাশঙ্করের মনে জাগিয়ে দিয়েছিল 'সবুজপত্র'। পরবর্তী কালে এগুলি থেকে বিকশিত হয় তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসা।

।। দুই ।।

এই সময় বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়ে ঢেঙ্কানালের কৃতী সন্তান রূপে দেশে ফিরে আসেন সারঙ্গধর দাস। ঢেঙ্কানালের যুবসম্প্রদায় সারঙ্গধরকে নিয়ে মেতে ওঠে। তাঁর সংবর্ধনার জন্য যে-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার উদ্বোধনী সংগীত লিখে দেন অন্নদাশঙ্কর। আমেরিকায় লেখা পড়া করতে করতে কীভাবে রোজগার করা যায়, সেখানকার সমাজ কত উদার, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কীভাবে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছিল— এসব বলে সারঙ্গধর যাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্করই সম্ভবত ছিলেন কনিষ্ঠতম। অন্নদাশঙ্কর স্থির করেন যে তিনিও সারঙ্গধরের মতো আমেরিকায় যাবেন।

আমেরিকায় যাওয়ার জন্য অপর একটি প্রেরণা ছিল বাবা নিমাইচরণের একটি উক্তি, 'বড়ো হয়ে তুই ওয়াশিংটন হবি।' বাবা অন্নদাশঙ্করকে জর্জ ওয়াশিংটনের একখানি জীবনী দিয়েছিলেন। তখন আমেরিকা তাঁর কাছে স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র। কিন্তু ওয়াশিংটন হবার জন্য আশীর্বাদ করলেও বাবা মা যে তাঁকে কাজের সময় সত্যি সত্যি আমেরিকায় যেতে দেবেন না এ ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। ফলে তিনি মনে মনে আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করে সারঙ্গধরের পেছনে ঘোরাঘুরি শুরু করেন।

শুধু আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যানই করেননি, আমেরিকায় গিয়ে জীবিকা হিসেবে কী করবেন সেটাও তখনই অন্নদাশঙ্কর স্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি হবেন সন্ত নিহাল সিঙের মতো সাংবাদিক। তখন সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। মাসিক 'মডর্ন রিভিয়ু', সাপ্তাহিক 'টেলিগ্রাফ', বাংলা মাসিক 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রপত্রিকা আনিয়ে পড়তেন। লালা লাজপত রায়ের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাও আনান, কিন্তু যখন দেখেন

যে সেখানা আসলে উদ্দুপত্রিকা তখন তাঁর চক্ষুস্থির। তাঁর ভাবগতিক দেখে মা বুঝতে পারেন যে ছেলের মতলব হচ্ছে বাড়ি পালিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেওয়া। তখন তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে তাঁকে না জানিয়ে ছেলে কোথাও যাবে না।

কিন্তু অন্নদাশঙ্কর যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কটক গেলেন সেই অবসরে মা হেমনলিনী নিজেই ছেলেকে কিছু না বলে অজানা কোন্ দেশে চলে গেলেন। পরীক্ষা দিয়ে ঢেঙ্কানালে ফেরার পথে অন্নদাশঙ্কর মায়ের চলে যাওয়ার খবর পেলেন।

অতঃপর সাংবাদিক হবার সংকল্প নিয়ে অন্নদাশঙ্কর এলেন কলকাতায়। সম্পাদকদের দরজায় দরজায় ধর্না দিয়ে অবশেষে বুঝলেন লাফ দিয়ে সম্পাদকের আসনে বসা সম্ভব নয়। তার জন্য অন্তত একটা গ্র্যাজুয়েশনের ডিগ্রি চাই। এদিকে মেসে হোটেলে খেয়ে শরীরও খারাপ হচ্ছিল। কাকা যখন একবার ফিরে আসার জন্য সাধলেন তখন দ্বিরুক্তি না করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন। অর্থাৎ কটকে কাকার বাড়িতে। ভরতি হলেন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে।

কোথায় ওয়াশিংটনের মতো স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করবেন তা নয়, ঢুকলেন গিয়ে ইংরেজের গোলাম তৈরির কারখানায়। পরাজয়ের লজ্জায় মাথা হেঁট। কিন্তু কটকের কলেজ জীবনে পেয়ে গেলেন চমকপ্রদ বন্ধু-ভাগ্য। বন্ধুদের মধ্যে সকলেই পরবর্তী কালে কৃতী হন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বিখ্যাত হন কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী এবং বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক। সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুদের সাহচর্যে অন্নদাশঙ্করের জীবন সম্পর্কিত পরিকল্পনায় পরিবর্তন সূচিত হয়। তখন তিনি আর সাংবাদিক হতে চান না, চান সাহিত্যিক হতে। কলেজের সাহিত্যপ্রেমী পাঁচ বন্ধু মিলে প্রতিষ্ঠা করেন ননসেন্স ক্লাব নামে একটি সংস্থা। তাঁরা যে সাহিত্যধারা ওড়িয়ায় প্রবর্তন করেন তা পরবর্তী কালে বিখ্যাত হয় সবুজসাহিত্য নামে। বন্ধুরা পরিচিত হন 'সবুজগোষ্ঠী' নামে এবং সবুজদলের মধ্যমণি রূপে স্বীকৃত হন অন্নদাশঙ্কর রায় স্বয়ং।

কলেজ জীবনে ইবসেন, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, বার্নার্ড শ, ডিকেন্স প্রভৃতির উপন্যাস পড়ে পড়ে অন্নদাশঙ্করের মনে ইয়োরোপীয় সাহিত্য তথা ইয়োরোপীয় দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। এই কৌতূহল তীব্রতর হয় কটক র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাটনা কলেজে পড়তে এসে। বিশাল গ্রন্থাগারে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিশাল সম্ভার। রমাঁ রলাঁ, ডি. এইচ লরেন্স, ভার্জিনিয়া উলফ, এলেন কেই প্রভৃতির লেখা পড়তে পড়তে তাঁর মনে হয়, যদি ইয়োরোপে যেতে না পারেন

তাহলে জীবনটাই বৃথা। আমেরিকার জন্য আকর্ষণ রহিত হল, তার পরিবর্তে প্রবল আকর্ষণ জাগল ইয়োরোপে যাওয়ার জন্য। যেন ইয়োরোপটাই তাঁর আত্মার দেশ, তাঁর আসল স্বদেশ।

॥ তিন ॥

ইতিমধ্যে ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্কর একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছেন। প্রথমত কবি হিসেবে, দ্বিতীয়ত প্রাবন্ধিক হিসেবে। বাংলা সাহিত্যে তখনও তাঁর প্রকাশ দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু 'প্রবাসী'র পাতায় তাঁর 'কৃষ্ণ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। তাছাড়া 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ 'পারিবারিক নারী সমস্যা' জাগিয়েছে অপ্রত্যাশিত বিতর্ক। অবশ্য এর আগেই কটক কলেজের ম্যাগাজিনে অধ্যাপক শচীন্দ্রলাল দাস বর্মার An Anti-feminist Cry কবিতাটির উত্তরে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন A Feminist Counter-cry নামে একটি কবিতা। ওড়িয়াতে 'নর চক্ষুরে নারী' প্রবন্ধটি ওড়িশাতে নারী সম্পর্কিত চিন্তার ধারায় নতুন চিন্তার সূচনা করে। তাছাড়া 'প্রলয় প্রেরণা' 'সৃজন বেদনা' প্রভৃতি কবিতা আজও ওড়িয়া সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হয়। তখনকার কালে এসব কবিতা ছিল ওড়িয়া সাহিত্যের অভিনব সম্ভাবনা।

অন্নদাশঙ্কর যখন পাটনা কলেজে বি. এ. পড়ছেন ইংরেজি অনার্স নিয়ে তখন 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বারোয়ারি উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। তাই দেখে অন্নদাশঙ্কর ও কালিন্দীচরণ স্থির করেন যে ওড়িয়াতেও তাঁরা বারোয়ারি উপন্যাস লিখবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিশ্বনাথ কর সম্পাদিত 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায় অন্নদাশঙ্কর ও তাঁর বন্ধুবর্গ 'বাসন্তী' নামে একটি বারোয়ারি উপন্যাস লেখা শুরু করেন। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে 'বাসন্তী' এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এইটেই ওড়িয়াতে প্রথম বারোয়ারি উপন্যাস। আর অন্নদাশঙ্করের জীবনে 'বাসন্তী'র গুরুত্ব এই যে এইটেই গল্প-উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রয়াস।

অন্নদাশঙ্কর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বি. এ. ইংরেজি অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হন। ওড়িয়া, ইংরেজি, বাংলা এই তিন ভাষাতেই তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করবেন, না তিনটির কোনও একটিতে করবেন? কোনও সাহিত্যিকের পক্ষে কি একসঙ্গে একাধিক ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব? বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্যের সামনেও ছিল একই প্রশ্ন। ইংরেজি, না বাংলা? কিন্তু তিনি মনোনয়ন করেছিলেন ইংরেজি ভাষা। পক্ষান্তরে অন্নদাশঙ্করের কাছে প্রশ্নটা ছিল অপেক্ষাকৃত জটিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে তিনি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর

অসাধারণ কর্তৃত্ব। আর ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সবুজ যুগের প্রধান প্রবক্তারূপে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। ইংরেজি ও ওড়িয়ার তুলনায় বাংলাতেই তিনি অজ্ঞাতকুলশীল। পাটনা থেকে কলকাতায় এসে 'কল্লোল' পত্রিকার আপিসের সামনে দিয়ে ঘুরে গেছেন, কিন্তু ভেতরে ঢোকার ভরসা পাননি। তবু তিনিই বাংলা ভাষাকে সাহিত্য সাধনার জন্য মনোনয়ন করলেন।

অন্নদাশঙ্করের সামনে আরও একটি প্রশ্ন ছিল, জীবিকার প্রশ্ন। একদা ভেবেছিলেন গান্ধীজির বারদোলি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে যাবেন। কিন্তু গুরুজনদের নির্বন্ধে ভরতি হলেন কটক কলেজে। মেধার দৌলতে বিহার-ওড়িশার মধ্যে আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পেলেন প্রাদেশিক বৃত্তি; তখন বাধ্য হলেন পাটনায় এসে বি. এ. পড়তে। কারণ বি. এ. না পড়লে ওই বৃত্তি তিনি পেতেন না। ইতিমধ্যে ইয়োরোপীয় ইতিহাস ও সাহিত্য পড়ে তাঁর উদগ্র ইচ্ছা হল ইয়োরোপ দেখবার, সেই যে বারো বছর বয়সে প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা'র সোমনাথের গল্পে ভেনাস ডি মাইলোর উল্লেখ পেয়েছিলেন তার দশ বছর পরে তাঁর মনে হল নিজের চোখে সেই বিশ্বসুন্দরীকে না দেখতে পেলে জীবনটাই বৃথা। কিন্তু কী করে যাবেন? সবচেয়ে সহজ উপায় হল আই সি.এস প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া। আরও একটা কারণ হল একজন বিপন্ন নারীকে আর্থিক ও নৈতিক নিরাপত্তা দান।

কিন্তু প্রথমবার আই সি.এস প্রতিযোগিতায় তিনি পঞ্চম স্থান পেলেও তাঁর পরিবর্তে সরকারি মনোনয়ন পেলেন যাঁরা তাঁরা প্রতিযোগিতায় তাঁর চেয়ে অনেক পেছনে স্থান পেয়েছিলেন। এই ব্যর্থতায় তাঁর জেদ চেপে গেল, পরের বারের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেতেই হবে। ইতিমধ্যে তাঁর বন্ধু কৃপানাথ মিশ্র জানালেন যে 'বিচিত্রা' নামে বাংলায় একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কৃপানাথ খুব ভালো ভাবে চেনেন। কৃপানাথের মারফত অন্নদাশঙ্কর একটি প্রবন্ধ পাঠালেন 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের জন্য। প্রবন্ধটি 'রক্তকরবীর তিনজন' নামে 'বিচিত্রা'য় পত্রস্থ করে উপেন্দ্রনাথ আরও লেখা চাইলেন অন্নদাশঙ্করের কাছে। ততদিনে অন্নদাশঙ্কর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের আই.সি.এস প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে ইংলন্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। 'বিচিত্রা'র সম্পাদককে জানালেন যে তাঁর ইয়োরোপ ভ্রমণের কাহিনী কিস্তিতে কিস্তিতে লিখে পাঠাবেন। অবশেষে ১৯২৭-এর ভরা বর্ষায় শুরু হল তাঁর বহু বাঞ্ছিত ইয়োরোপ যাত্রা। একই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের রাজপথেও তাঁর জয়যাত্রা শুরু হল। কারণ তাঁর ইয়োরোপ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে 'বিচিত্রা'য় শুরু হল তাঁর 'পথে প্রবাসে'র প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্করের খ্যাতির সূচনা।

উপন্যাস নয়, কবিতা নয়, নয় কোনও সৃষ্টিশীল সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী

লিখেই অন্নদাশঙ্করের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ প্রবেশ। 'দেশ'-এর জন্য ১৯৯০-এ বর্তমান লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন ইটালিতে যাই তখন আমার ইউরোপ প্রবাসের অন্তিম পর্ব। কিন্তু ইটালির ইতিহাসে পুরোদস্তুর ফাসিস্ত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর্ব। মানুষের ইতিহাসে এক অশুভ অধ্যায়ের আরম্ভ।' স্পষ্টতই ১৯২৯-এ ফাসিজমের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায়নি। কিন্তু যখন তিনি 'সত্যাসত্য' উপন্যাস লেখা শুরু করলেন তখন ইয়োরোপের ইতিহাসে ডিকটেটরশিপের প্রকৃতি ও স্বরূপ অনেকখানি পরিষ্কার রূপ পেয়েছে। 'পথে প্রবাসে'র ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে ইয়োরোপের প্রতি লেখকের গভীর ভালোবাসা। বৈনাশিক চরিত্রের পাশাপাশি সংযুবনী প্রতিভার প্রকাশ।

॥ চার ॥

ইয়োরোপে থাকাকালে অন্নদাশঙ্কর যখন ধারাবাহিক ভাবে 'পথে প্রবাসে' লিখছেন 'বিচিত্রা' পত্রিকার পাতায় তখন অকস্মাৎ বাংলা সাহিত্য সচকিত হয়ে উঠল একজন নতুন শক্তিশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাবে। 'কল্লোল' পত্রিকার পক্ষ থেকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং 'কালিকলম' পত্রিকার পক্ষ থেকে মুরলীধর বসু ও শিশির নিয়োগী তাঁকে লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ইয়োরোপে সেটা যুদ্ধোত্তর মন্দার প্রতিক্রিয়ায় প্রবীণদের বিরুদ্ধে নবীনদের আন্দোলনের যুগও বটে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে সংগতি রেখে অন্নদাশঙ্কর 'কালিকলম' পত্রিকায় সাতটি প্রবন্ধ লেখেন আর সেগুলির 'তারুণ্য' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে 'নীতি-জিজ্ঞাসা', 'স্ত্রীপুরুষ', 'রবীন্দ্রাদিত্য', 'মনে মনে' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন 'কালিকলমে' ও 'কল্লোলে'। তাছাড়া তিনি যৌনজিজ্ঞাসাকে মানুষের একটি মৌল জিজ্ঞাসারূপে উপলব্ধি করেন। বহুকাল ধরে যৌনজিজ্ঞাসা ছিল প্রকাশ্যে আলোচনার অযোগ্য বিষয়। কিন্তু তিনি ঘোষণা করলেন যে আলাদীনের গুপ্তগুহার রহস্যের মত যৌনজিজ্ঞাসার বদ্ধ অর্গলকে একালের বিজ্ঞানীরা অবারিত করে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেছেন। সৃষ্টিজিজ্ঞাসা থেকেই যৌনজিজ্ঞাসার শুরু।

১৯২৯-এর অক্টোবরে অন্নদাশঙ্কর যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বাংলাসাহিত্যে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। কলকাতায় এসে তিনি কয়েকদিনের জন্য আমহার্স্ট স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে একটা হোটেলে অবস্থান করলেন। তাঁর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ পরিচয় করলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক। তাঁকে অচিন্ত্যকুমার সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন প্রমথ চৌধুরী ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সকাশে। প্রমথ

চৌধুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'পথেপ্রবাসে'র ভূমিকা লিখে দিতে চাইলেন। আর উপেন্দ্রনাথ চাইলেন 'বিচিত্রা'র জন্য একখানি উপন্যাস। প্রথমে অন্নদাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস লেখার বিষয়ে একটা আশঙ্কা ছিল। সেই 'বাসন্তী'র তিনটে কি চারটে পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন। তারপর ইংলন্ডে থাকতে লিখেছিলেন 'দুজনার' নামে একটি গল্প। কিন্তু তখনকার কালের মানদণ্ডে ওই গল্প যে বিশেষ ওতরায়নি এটা অন্নদাশঙ্কর ভালো করেই বুঝেছিলেন। অথচ মনে মনে দুরন্ত অভিলাষ যে একখানি উপন্যাস লিখে উলটে দেবেন রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য আর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পরিণতি। 'নৌকাডুবি'র গল্পাংশ সম্বন্ধেই ছিল তাঁর প্রবল আপত্তি। একজন পুরুষ ও একটি নারী কিছুকাল স্বামী ও স্ত্রী রূপে বাস করল, পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসল। তারপর তারা জানল যে তারা আসলে স্বামী স্ত্রী নয়, বিয়ের অব্যবহিত পরে পরস্পরকে মুখ ও গড়ন দেখে ভালো করে পরিচয়ের তথা চেনার আগেই নৌকাডুবি হয়ে অপর এক দম্পতির সঙ্গে জুড়ি বদল হয়ে যায়। কিন্তু এরা যে এতদিন স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই জীবনযাপন করল তার কী হবে? চেনাশোনা নেই, কোনরকম ভালোবাসা নেই, আছে শুধু তৃতীয় পক্ষের খেয়াল অনুসারে কয়েকদিনের জন্য মিলন, তারপর আবার সেই তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছাক্রমেই আসে অনিবার্য বিচ্ছেদ। 'পারিবারিক নারী সমস্যা'র লেখক অন্নদাশঙ্কর অন্যরকম পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাকে 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে নতুনভাবে যাচাই করতে চাইলেন।

একদিকে বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, আর একদিকে সমাজের কাঠামোর মধ্যে এক দম্পতির সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ। সেইসঙ্গে বিশ্ব জুড়ে মানবিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্বের বিপুল আলোড়ন। এইসব চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের গান্ধীবাদও এক নতুন মাত্রা। আবার তার সঙ্গে যোগ করলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনের কাহিনীকে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবল উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্নদাশঙ্কর শুরু করে দিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সত্যাসত্য'। সেটা ১৯৩০ সাল। কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশ করতে থাকলেন 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। প্রথম কয়েক সংখ্যায় লেখকের নাম থাকত লীলাময় রায়। কারণ বিশ্ব সৃষ্টিকে তিনি উপলব্ধি করেছেন স্রষ্টার লীলারূপে

অন্নদাশঙ্কর তখন মুর্শিদাবাদ জেলার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। থাকেন অপর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিজেন মজুমদারের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ সদর বহরমপুরে এক বাসা ভাগাভাগি করে। আর সরকারি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং 'সত্যাসত্য' লেখার ফাঁকে ফাঁকে দু মাসের কঠিন পরিশ্রমে শেষ করে ফেললেন 'অসমাপিকা' নামে একখানি নতুন উপন্যাস। 'অসমাপিকা'র

পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন 'তারুণ্য'র প্রকাশক এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সের কাছে। কিন্তু এম সি সরকার তখনই 'অসমাপিকা' প্রকাশ না করে পাণ্ডুলিপি ধরে রাখলেন নিজেদের সুবিধে মতো কোনও সময়ে প্রকাশ করার জন্য।

॥ পাঁচ ॥

ইতিমধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর শান্তিনিকেতনে গেলেন রবীন্দ্রসন্দর্শনে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ 'পথেপ্রবাসে' পড়েছেন এবং তাঁর কাছে অন্নদাশঙ্কর রায় একটি সুপরিচিত নাম। তিনি জানতে চাইলেন, একজন আই সি এস.-এর তো কর্মপ্রদেশ হিসেবে ভারতের যে কোনও প্রদেশ পছন্দ করার অধিকার থাকে, বাংলার চেয়ে যুক্তপ্রদেশই তো শান্তি, স্বাস্থ্য ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে কাম্য ছিল আর অন্নদাশঙ্কর নিজেও তো মানুষ হয়েছেন ওড়িশায় ও বিহারে, অর্থাৎ বাংলার বাইরে, তাহলে কেন নিযুক্তি চেয়ে নিলেন বাংলায়। উত্তরে অন্নদাশঙ্কর বললেন, তিনি চাকরির দিক থেকে বিষয়টাকে দেখেননি, দেখেছেন সাহিত্যের দিক থেকে এবং ইয়োরোপ দেখবার জন্য যেমন আই সি.এস হয়েছেন তেমনই আই.সি.এস. হওয়ার সুযোগ নিয়ে বাংলা দেখবেন। প্রকৃতপক্ষে চাকরির সুবাদে তিনি যেভাবে বিস্তীর্ণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল দেখেছেন সেভাবে খুব কম বাঙালি-সাহিত্যিক বাংলাকে দেখেছেন, জেনেছেন ও চিনেছেন।

অচিন্ত্যকুমারের বিবাহ হয় ১৯৩০-এর আগস্ট মাসে। এই বিবাহ উপলক্ষে বহরমপুর থেকে অন্নদাশঙ্কর এলেন কলকাতায়। বউভাতের অনুষ্ঠানে পরিচয় হল গৈরিকধারী নজরুল ইসলাম এবং খদ্দরধারী গোপাল-দাস মজুমদারের সঙ্গে। প্রথম আলাপেই ডি. এম. লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী গোপালদাসবাবু অন্নদাশঙ্করের কাছে প্রকাশার্থে একখানি নতুন উপন্যাস চাইলেন। মাত্র কয়েকদিন আগেই অন্নদাশঙ্কর 'অসমাপিকা'র পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরিত করেছেন। আর নতুন উপন্যাস বলতে ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা'য় যা লিখছেন সেই 'সত্যাসত্য'। অন্নদাশঙ্কর ভালো করেই জানতেন যে 'সত্যাসত্য'র মতো সিরিয়াস গুরুভার উপন্যাসের প্রকাশক জুটবে না, তাই ভেবে রেখেছিলেন যে ওই উপন্যাস প্রকাশের ব্যয়ভারের অর্ধাংশ তিনি নিজেই দেবেন। কিন্তু গোপালদাসবাবু বললেন, তিনিই ওই উপন্যাস প্রকাশ করবেন. তবে তার আগে চাই নতুন একখানি লঘুভার উপন্যাস। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে লেখা হল 'আগুন নিয়ে খেলা' উপন্যাসটি। এক-একটি পরিচ্ছেদ শেষ করেন আর বহরমপুর থেকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেন গোপাল-দাসবাবুকে। যেমন ঝড়ের বেগে অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসটি লিখলেন তেমনই ঝড়ের বেগে গোপালদাসবাবু উপন্যাসটি প্রকাশ করলেন।

যখন লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে দুরন্ত দৌড় চলছে তখন পৃথিবীর বিপরীত প্রান্ত থেকে অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ নামে এক বিশ বৎসর বয়স্কা মার্কিন তরুণী লন্ডন থেকে ভবানী ভট্টাচার্যের সূত্র ধরে বহরমপুরে অন্নদাশঙ্করের কাছে এলেন। অচিরে সেই পরিচয় পরিণত হল প্রণয়ে এবং শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে। যাঁর নাম ছিল অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ তাঁর নতুন নাম হল লীলা রায়। মার্কিন বংশোদ্ভূতা স্ত্রীর এই নতুন নামকরণের মধ্যে নিহিত আছে অন্নদাশঙ্করের আধ্যাত্মিক ভাবনা। লীলা হল সৃষ্টি আর সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ। আর এই স্রষ্টাই হলেন পরমসত্তা। এখন থেকে ঘরনি লীলার মধ্যে অন্নদাশঙ্কর দেখলেন অন্যতর সৃষ্টির লীলা। 'সত্যাসত্য' রচনার পদে পদে ঘরনিই লেখকের সাহায্যকারিণী। ইয়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে যতই দিন যেতে লাগল অন্নদাশঙ্কর ততই বিস্মৃত হতে লাগলেন পাশ্চাত্য আচারপ্রথার খুঁটিনাটি আর তখন সেগুলি পুষিয়ে দিতে লাগলেন লীলা রায়। 'সত্যাসত্য'র স্বরূপ সন্ধানে লীলা রায়ের যে একটা নেপথ্য ভূমিকা আছে তা অন্নদাশঙ্কর নিজেই বারবার স্বীকার করেছেন।

॥ ছয় ॥

বহরমপুরে এসে কর্মজীবন শুরু করার অল্পদিন পরেই, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে অন্নদাশঙ্কর আর অচিন্ত্যকুমার দুই বন্ধু মিলে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'লোকলক্ষ্মী গর্ভিনী'। এই কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে যে গর্ভিনী নারীর যেমন একমাত্র চিন্তা হল গর্ভ রক্ষা করা তেমনই শিল্পীরও একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত, শিল্পের জন্য যে-আবেগকে অন্তরে ধারণ করেছেন শিল্পী, তাকে কেমন করে লোকসমক্ষে উপস্থাপন করবেন। এই আদর্শ অনুসারে অন্নদাশঙ্করের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত ছিল কেমন করে সর্বাগ্রে 'সত্যাসত্য' লেখা সম্পূর্ণ করবেন। কিন্তু প্রথম খণ্ড 'যার যেথা দেশ' লেখার মধ্যে 'অসমাপিকা' আর 'আগুন নিয়ে খেলা' দুখানি উপন্যাস লিখেছেন, সেটলমেন্ট ক্যাম্পের ট্রেনিং নিয়েছেন, ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়েছেন এবং জীবনের একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিবাহ করেছেন। প্রথম খণ্ড লেখার পরে এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড 'অজ্ঞাতবাস' ১৯৩৩-এ এবং তার এক বছরের মধ্যে তৃতীয় খণ্ড 'কলঙ্কবতী' ১৯৩৪-এ এবং তার এক বছরের মধ্যে চতুর্থ খণ্ড 'দুঃখমোচন' ১৯৩৫-এ লেখেন যদিও 'দুঃখমোচন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে।

অন্নদাশঙ্কর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জুডিসিয়াল ট্রেনিংয়ের জন্য প্রথমে চট্টগ্রামে

ও তারপরে ঢাকায় বদলি হন। চট্টগ্রামে তিন মাস আর ঢাকায় নয় মাস থাকাকালে 'অজ্ঞাতবাস'-এর অনেকখানি আর 'কলঙ্কবতী'র খানিকটা অংশ লেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি লিখে ফেলেন 'পুতুল নিয়ে খেলা' উপন্যাসটি আর 'প্রকৃতির পরিহাস' পর্যায়ের কতকগুলি ছোটগল্প। এই রচনাগুলিতে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের ভদ্রতার আড়ালে ভণ্ডামির রূপ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গান্ধীজির আবির্ভাবের সময় থেকে অন্নদাশঙ্কর গান্ধীবাদে অনুপ্রাণিত, তখন থেকে খদ্দরের ভক্ত, লণ্ডনে থাকাকালেও মধ্যে মধ্যেই খদ্দর পরতেন, চাকরিতেও খদ্দরের স্যুট পরতেন। সত্য ছিল যেমন গান্ধীজির পরীক্ষানিরীক্ষার একটা আবশ্যিক বস্তু তেমনই অন্নদাশঙ্করের জীবনেও। শুধু জীবন দর্শনে ও জীবন যাপনে নয়, শিল্প সাধনেও। প্রকৃতপক্ষে গূঢ়তর অর্থে 'পুতুল নিয়ে খেলা' উপন্যাসে এবং প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিতেও তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার বিষয় শুধু শিল্পের রূপ নয়, সত্যের রূপও।

অন্নদাশঙ্কর যে-বছর নদীয়ার জেলা শাসকের পদে উন্নীত হলেন সেই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে পৌঁছে আমরা একবার পেছন ফিরে অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যিক বিকাশের গতিপ্রকৃতি ঝটিতি আলোচনা করে নিতে পারি। শুরু করেছিলেন ওড়িয়া, বাংলা ও ইংরেজি তিন ভাষায় এবং বিশ বছর বয়সের মধ্যে ওড়িয়া সাহিত্যিক রূপে চমকপ্রদ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু বাইশ বছর বয়সে স্থির করেন যে শুধু বাংলায় সাহিত্য সাধনা করবেন এবং সেজন্য বাংলায় থাকা যাবে ও বাংলাকে জানা যাবে এরকম কোনও জীবিকা মনোনয়ন করবেন। যে প্রদেশে ছিল স্থায়ী ঠিকানা সেই প্রদেশের বদলে বাংলায় এসে কবিতা ও প্রবন্ধের সঙ্গে শুরু করলেন উপন্যাস লেখা। বিবাহ করলেন মার্কিন দুহিতাকে। চার বছরের মধ্যে হলেন দুই সন্তানের জনকজননী। এই রায় পরিবারের নীরব সাধনা হল নিজস্ব বাংলাদেশ সৃষ্টি করা। এই বাংলা দেশ কোনও নথিভুক্ত অথবা মানচিত্রে সুচিহ্নিত স্থান নয়, এই বাংলা একটা অনুভবসাধ্য সত্তা।

॥ সাত ॥

নদীয়া জেলা শাসক হওয়ার পর থেকে অন্নদাশঙ্কর সরকারি দায়দায়িত্বে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়লেন যে সাহিত্যের সাধনায় অবহেলা হল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে শিল্পীর প্রথম কাজ হল শিল্প সৃষ্টি করা। কিন্তু সরকারি কাজে সুখ্যাতির দুরাশাতে তিনি কর্মবীর হয়ে ওঠেন। রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকাতে তিনি নিজেই লিখেছেন, 'সেই যে মাথায় ভূত চাপে সে ভূত

'আর নামতে চায় না। আমি তিনটি বছর বন্যহংসীর পশ্চাদ্ধাবন করি।' কিন্তু জেলা শাসকের দায়িত্বভারে থাকাকালে তাঁর সবকিছুই অসাংস্কৃতিক বা অসাহিত্যিক অন্বেষণে অপচিত হয়নি। এই সময় পাতিসরের জমিদার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজশাহী জেলা শাসক অন্নদাশঙ্করের এমন একটা যোগাযোগ ঘটে যার পরিণাম আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হয়েছে।

তবে ওই যোগাযোগের কাহিনী বলার আগে উল্লেখ করি অন্নদাশঙ্করের বহুমুখী মানসিকতার একটি নতুন মুখ বা নতুন ধারা কী ভাবে যুক্ত হল তার কথা। এই নতুন ধারাটি হল সাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রতিক সমস্যা সম্বন্ধে এক জিজ্ঞাসু ও সচেতন মনের প্রকাশ। সাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ প্রসঙ্গগুলির মধ্যে দেশের সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলির অথবা বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির স্থান নেই, থাকলেও তা কবিতায় বা কথাসাহিত্যে বা নাটকে বিশেষ দেশ কাল ও পাত্রকে আশ্রয় করে পরিস্ফুট হয় শিল্পের ব্যঞ্জনায়। অন্নদাশঙ্কর সাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রতিক জিজ্ঞাসাগুলিকে আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তব জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত করলেন, বুঝিয়ে দিলেন যে ব্যাধির সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা উদাসীনতা ব্যাধির হাত থেকে বাঁচার উপায় নয়, ব্যাধিকে নির্ণয় করে তার সঙ্গে মোকাবিলা করাই হল প্রকৃত প্রতিকার।

অন্নদাশঙ্কর যখন নওগাঁর মহকুমা শাসক তখন তিনি লক্ষ করলেন যে সেই লবণ সত্যাগ্রহের দেশব্যাপী আলোড়ন নওগাঁবাসীদের তেমন ভাবে স্পর্শ করল না। আবার ওই যুগেই বাংলার নানাস্থানে, বিশেষত চট্টগ্রামে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিচলিত করল ব্রিটিশ প্রশাসনকে। অন্নদাশঙ্কর না চাইতেই তাঁর জন্য মোতায়েন হয়ে গেল দেহরক্ষী এবং তারা আইন মোতাবেক সর্বত্র তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অথচ নওগাঁতে সন্ত্রাসবাদও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। এর কারণ ছিল নওগাঁর সাধারণ মানুষ ছিল মুসলিম এবং গ্রামীণ মুসলিমরা ওই সব জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে ছিল নিস্পৃহ। অন্নদাশঙ্কর মহকুমা শাসক রূপে একবার হাতেনাতে দুজন ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। যখন তাঁদের গ্রেপ্তার করেন তখন তাঁদের একজন উপবিষ্ট ছিলেন খাটে, অপরজন মেজেয়। খাটের উপরে উপবিষ্ট ষড়যন্ত্রকারী হিন্দু আর মেজের উপরে উপবিষ্ট ষড়যন্ত্রকারী মুসলিম। মহকুমা শাসক তাঁদের সদরে চালান করলে জেলা শাসক পত্র পাঠ সেই মুসলিম ভদ্রলোককে মুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে সমাজের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের যে ভেদাভেদ বর্তমান তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে প্রশাসন। আর অন্নদাশঙ্কর অনুধাবন করেন যে হিন্দু মুসলমানের বিভেদটা বাস্তবে জমির মালিক জমির কৃষকের সমস্যা। এর ফলে জমি নিয়ে বিবাদ কী ভাবে জটিল ঘটনা চক্রের মধ্যে দিয়ে ধর্ম নিয়ে বিরোধে রূপান্তরিত হচ্ছে তার মামলা আসত আদালতে। এইসব মামলাকে

বলা হত সার্টিফিকেটের মামলা। স্পেশাল অফিসার ছিল সার্টিফিকেট মামলা করার জন্য।

নওগাঁর পরে জুডিসিয়াল ট্রেনিঙের জন্য অন্নদাশঙ্করকে বদলি করা হল চট্টগ্রামে ও ঢাকায়। তখন তিনি আরও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করে দেখলেন যে শুধু বাংলায় নয়, পাঞ্জাবেও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কৃষিজীবী, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে এবং যুক্তপ্রদেশ বিহার বম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিমরা বাণিজ্যজীবী, সেখানে তারা আর্থিক দিক থেকে প্রভাবশালী, কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে তারা দুর্বল অর্থাৎ সংখ্যালঘু। সংক্ষেপে এই হল দেশের সাম্প্রদায়িক বিন্যাসের চিত্র এবং তাদের আর্থিক অবস্থার চরিত্র। এই পরিস্থিতির সমাধান কল্পে ১৯৩২-এর অগাস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। স্বভাবতই তাতে প্রতিফলিত হয়েছে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হুকুমত কায়েম রাখার ব্রিটিশ প্রশাসনিক নীতি।

অন্নদাশঙ্কর যখন ঢাকায় ছিলেন তখন স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমীরা তাঁর কাছে আসাযাওয়া শুরু করলেন। তাঁদের একজন যখন পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন তখন অন্নদাশঙ্করই সেই পত্রিকার নাম দেন 'সবুজ বাংলা' এবং সেই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'মাদ্রাসী বাঙলা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধটিতে তুলনামূলকভাবে আরবি ফারসি শব্দ বহুল এক দুর্বোধ্য বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রয়াসকে অন্নদাশঙ্কর মাদ্রাসা শিক্ষার কুপ্রভাব বলে সমালোচনা করেন। ওই পত্রিকা ছাড়াও আর একটি পত্রিকার বিশেষ প্রচার ছিল স্থানীয় সাহিত্য সমাজে—হাবিবুল্লাহ বাহার আর শামসুন নাহার দুই ভাইবোন পরিচালিত 'বুলবুল'। দুজনেই পরে বাংলার রাজনীতিতে ও সংস্কৃতিতে প্রসিদ্ধ হন। তাঁদের অনুরোধে অন্নদাশঙ্কর 'সাঙ্গা', 'জীবিকা' 'হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন। জনগণনার সময় সমাজের কতকগুলি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়, ফলে সমাজ-চিত্রের বিশেষ কতকগুলি দিক যেমন ধর্ম, আচার-প্রথা, জীবিকা ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়। 'বুলবুল' পত্রিকায় অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধগুলি আমাদের সমাজের কতকগুলি ছায়াচ্ছন্ন দিকে অর্থপূর্ণ আলোকপাত করে। এবং এই সূত্রে বহু মুসলিম লেখক-লেখিকার সঙ্গে তাঁর পত্রসম্পর্ক স্থাপিত হয়। যাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাঁদের মধ্যে সুফিয়া এন হোসেন তখনই কবি হিসেবে সুপরিচিতা ছিলেন। তিনি পত্রে অন্নদাশঙ্করকে ওই সব বিতর্কিত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে গল্প-উপন্যাস লেখার জন্য পরামর্শ দেন। পরে যখন তিনি বেগম সুফিয়া কামাল নামে আরও প্রসিদ্ধ

হন তখন আবার তিনিই হন সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ক অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধাবলির একজন প্রধান প্রচারক।

দেশ ভাগের পরে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিশ্লেষণে এবং ওই বিষয়ে সমাধানের সন্ধানে অন্নদাশঙ্কর ক্রমশ এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তার সূচনা হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরে। একটা বিশেষ ভৌগোলিক অভিব্যক্তির মধ্যে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও জমির জন্য সংগ্রাম, জীবিকার সংগ্রাম, ধর্মের জিগির, রাজনীতিবিদদের নেপথ্যচারিতা ইত্যাদি কতরকম প্রশ্ন যে ডালপালা ছড়িয়ে চারদিকের বাতাসকে ভারি করে তোলে তার অনুধাবনে অন্নদাশঙ্কর বাঙালি মনীষার এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ।

মানুষে মানুষে বিরোধের-মূল কারণটা বা সত্যটা নানা রকম মতবাদ তথা তত্ত্বের পরিচ্ছদ পরিধান করে আবির্ভূত হচ্ছে ইতিহাসে। এটা শুধু এই দেশে নয়, বহির্বিশ্বের ক্ষেত্রেও সত্য। এই মানদণ্ডে অন্নদাশঙ্কর বিচার করলেন বিশ্বমন্দার পরিপ্রেক্ষিতে মুসোলিনি হিটলার ফ্রাঙ্কো প্রমুখ ডিকটেটরদের আবির্ভাবের পরিণামকে। যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় অন্নদাশঙ্কর 'ডিক্টেটরশিপ' নামক প্রবন্ধটি লেখেন তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেকের কাছেই অবাস্তব বা অবিশ্বাস্য ছিল। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কাছেও ছিল, তাই মুসোলিনির আতিথ্য গ্রহণে বাধেনি তাঁর। আর ১৯৩৯ সালে মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর জার্মানির নাৎসিবাদের প্রশস্তি রচনা করেন 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড'-এর ৩৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায়। পক্ষান্তরে ১৯৩৫-এই অন্নদাশঙ্কর লেখেন, 'একই বীজ থেকে কী করে দুই জাতের চারা হতে পারে তা আমাদের সকলের জেনে রাখা ভালো। নইলে বুনব ডেমক্রেসি আর ফলবে ডিকটেটরশিপ।' এই স্বকালমনস্কতা তাঁর মহত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে অন্যান্য সৃষ্টিশীল লেখকদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

॥ আট ॥

একটু আগে বলেছি যে জেলা শাসকের দায়িত্ব ভারে থাকাকালে অন্নদাশঙ্করের সময়টা পুরোপুরি বৃথা যায়নি। তিনি যখন ১৯৩৭ সালে রাজশাহীর জেলা শাসক তখন হঠাৎ একদিন একটা টেলিগ্রাম আসে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আত্রাইঘাটে অন্নদাশঙ্করের উপস্থিতি কামনা করেছেন। গিয়ে দেখেন ঘাটে সারি সারি প্রজাদের ভিড়, দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো মুসলমানদের চোখে জল। সবাই বুঝতে পারছিলেন যে বাবুমশায়ের সঙ্গে এই তাঁদের শেষ দেখা। রবীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশঙ্কর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি বসেন, ট্রেন এলে একসঙ্গে নাটোর পর্যন্ত যাত্রা। এই প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালে

ধীমান দাশগুপ্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর বলেন, 'তিনি বলেন, আমি আজকাল ছড়া লিখছি। তুমিও লেখোনা কেন? আমি সবিনয় নিবেদন করি, ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না। তিনি কলকাতা ফিরে গিয়ে কী মনে করে আমাকে তাঁর 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন।' বইখানিতে অনেকগুলি ছড়া ছিল। সেগুলি রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট ছড়া। মার্জিত, শীলিত ও সংস্কৃত। তার সঙ্গে ছড়া সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের ধারণার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি প্রায়ই মনে মনে নাড়াচাড়া করেন। ছড়া লিখতে হবে।

লণ্ডনে শিক্ষানবিশি কালে অন্নদাশঙ্কর গোটা তিনেক ছড়া লিখেছিলেন। তখন সেগুলি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'মৌচাক' পত্রিকায়। আসলে সেগুলি ছড়ার মত পদ্য। যা হোক তারপর আর ছড়া লেখা নিয়ে ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথের কথায় আবার নতুন করে ভাবলেন, উৎসাহিত হয়ে লিখে ফেললেন কতকগুলি লিমেরিক, কতকগুলি ক্লেরিহিউ এবং একটি রুথলেস রাইম। বাংলা ছড়ায় কিছু কিছু বিদেশি ঢং আমদানি হল বটে, কিন্তু বাংলা ছড়ার মজা ঠিক জমল না।

এদিকে সরকারি কাজের চাপে 'সত্যাসত্য' লেখা কার্যত বন্ধ। রাজশাহী থাকাকালে একবার এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যে মাঝরাতে বিছানা থেকে উঠে ছুটতে হল কলেজ হস্টেলে ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রমকে সামলাতে। সেদিনকার মতো দাঙ্গা নিবারণ সম্ভব হলেও সমস্যাটার নিরাকরণ হয় না। ইতিমধ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এই ব্যবস্থায় ফজলুল হকই তখন বাংলার একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী। তিনি মুসলিম ছাত্রদের 'আমাদের বালকগণ' সম্বোধন করে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। কোনভাবে সেটি কলকাতার কাগজওয়ালাদের হাতে পড়ে এবং ফ্যাকসিমিলি সমেত ছাপা হয়। কেমন করে ওই টেলিগ্রাম কাগজওয়ালার হাতে পড়ে? এজন্য ফজলুল হক বোধহয় জেলা শাসককেই দায়ী করেছিলেন। অন্নদাশঙ্করকে জেলা শাসকের পদ থেকে অতিরিক্ত জেলা জজের পদে বদলি করা হল চট্টগ্রামে। পরের বার কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা জজের পদে। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাকে প্রশাসন থেকে সরানো হল বিচার বিভাগে।

চট্টগ্রামে থাকাকালেই অন্নদাশঙ্কর জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর পরবর্তী নিযুক্তি হবে বিচার বিভাগে। গত দু বছর ধরে তিনি যে সাহিত্য ভুলে গিয়ে সরকারি কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন তার জন্য কি এই পুরস্কার? প্রচণ্ড অভিমান হল। ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেলেন কলম্বো বম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে। তার আগে ছড়া লেখার একটা নতুন ধরনের পরীক্ষা

করেন, 'আমার যদি এপিটাফ লিখতে হয় / তবে লিখো—' ইত্যাদি। কিন্তু এই ছড়া তাঁকে আরও নতুন নতুন ছড়া লেখায় অনুপ্রাণিত করল না। অথচ অন্নদাশঙ্কর পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন, কথ্য ভাষায় কাব্য চর্চার জন্য চাই ছড়ার পুনরুদ্ধার এবং কাব্য বা ছড়াকে সহজে স্মরণযোগ্য করতে হলে পদ্য ছন্দকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ তো ছিলই। আর সেই সঙ্গে ছিল শিল্প সম্বন্ধে টলস্টয় রম্যাঁ রলাঁ প্রমুখের বক্তব্য। শিল্প হবে সরল এবং তাতে ঘটবে জনগণের জীবনের প্রতিফলন এবং এভাবেই সমাজের ঋণ শিল্পী পরিশোধ করবেন। কিন্তু শিল্পের জন্য প্রত্যয় পর্যাপ্ত নয়, তার জন্য চাই উপযুক্ত প্রেরণা। ফলে ছড়া লেখার প্রেরণার জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া কিছু করণীয় ছিল না অন্নদাশঙ্করের।

অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত প্রেরণা এল ১৯৪২ সালে। বুদ্ধদেব বসু তখন 'এক পয়সায় একটি' নামে ষোলটি কবিতার পুস্তিকা সিরিজ প্রকাশ করছিলেন। ওই সিরিজের জন্য তিনি অন্নদাশঙ্করের কাছে ষোলটি কবিতা চেয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর প্রথমে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর হাতে কোনও কবিতা নেই। কিন্তু তার পরেপরেই ঝরঝর করে এসে গেল এক ঝাঁক ছড়া। সেই ছড়াগুলি যখন 'উড়কি ধানের মুড়কি' নামে প্রকাশিত হল তখন বাংলা সাহিত্যে একটা তাজা হাওয়া বয়ে গেল। ধীমান দাশগুপ্তের সঙ্গে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর বলেন, 'আমাদের সাবেক কালের ছড়া ছিল মৌখিক ঐতিহ্যের। মুখে মুখে কাটা হত, কানে শুনে মনে রাখা হত। ...আমি মৌখিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করি। ...কলেজে পড়াশুনো করে, বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, সরকারি চাকরি করতে করতে আমার মনে পাক ধরেছিল। ...সেই আমি সব রকম কৃত্রিমতা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যখন ছড়া লিখতে বসি তখন আমি অন্য ধাতের মানুষ। আমার অন্য এক স্বরূপ।' তখন সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, লোক সমাজের আশা ও ব্যথা, লোক জীবনের কল্পনা ও ঘটনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায় তাঁর ছড়ায়। আকস্মিকভাবে ১৯৪২ সালে যা শুরু হয়েছিল আস্তে আস্তে তার একটা নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে ওঠে! তাতে যেমন বাংলা ছড়ার মৌখিক ঐতিহ্য বজায় থাকে তেমনই লোক জীবনের সীমানাও হয়ে যায় বহু বিস্তৃত। তার সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষ সম্বন্ধে অনন্ত কৌতূহলে জীবন্ত এবং মানবিক বিকাশে বিশ্বাসী এক সৃষ্টিশীল চেতনা।

॥ নয় ॥

অন্নদাশঙ্কর 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের 'দুঃখমোচন' খণ্ড লেখার পর থেকে অর্থাৎ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাহিত্যের চেয়ে চাকরিকে অগ্রাধিকার দিলেন।

কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তাঁর ভূমিকা প্রথম থেকেই বিতর্কিত। নওগাঁর মহকুমা শাসক থাকাকালে রাজশাহীর শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপার, বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক থাকাকালে বাঁকুড়ার শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপার এবং কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসক থাকাকালে শ্বেতাঙ্গ ডি.আই.জি. সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। তাছাড়া রাজশাহীর জেলাশাসক থাকাকালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের সন্দেহ হয় যে তিনিই প্রধানমন্ত্রীর গোপন টেলিগ্রাম পেঁছে দিয়েছেন খবরের কাগজে। ফলে তাঁকে প্রশাসন বিভাগের পক্ষে অবাঞ্ছিত মনে করা হয়। তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয় বিচার বিভাগে। তিনিও কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা জজের দায়িত্বভার নেওয়ার আগে লম্বা ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেলেন সিংহলে বা শ্রীলঙ্কায় এবং সেইসঙ্গে দক্ষিণ ভারতে। ফেরার পথে গেলেন কটকে। সেখানে চিকিৎসা বিভ্রাটে শোচনীয় মৃত্যু হল তাঁর দ্বিতীয় সন্তান চিত্রকামের। পুত্রের মৃত্যুতে হঠাৎ যেন তাঁর চৈতন্যোদয় হল। নিজের জীবনকে খতিয়ে বিচার করলেন। উপলব্ধি করলেন যে ১৯৩৬ থেকে সাহিত্যের দায় নামিয়ে রেখে চাকরির দায় কাঁধে তুলে নিয়ে ভুল করেছেন। চাকরিটা তাঁর জীবিকা, সাহিত্যই তাঁর জীবন' কুমিল্লায় আবার 'সত্যাসত্যে'র পঞ্চম খণ্ড লেখা শুরু করলেন এবং সেইখানেই ১৯৪০ সালে 'মর্তের স্বর্গ' নামক পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত করলেন।

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল এক অর্থে ডেমক্রেসির সঙ্গে ডিকটেটরশিপের যুদ্ধ। 'সত্যাসত্যে'র ঘটনাকাল যদিও ১৯২৭-২৯ তবু এর প্রথম পাঁচ খণ্ডের রচনাকাল ১৯৩০ থেকে উৎসারিত হয়ে ১৯৪০ পর্যন্ত বিস্তারিত। এই পর্বে প্রমাণিত হয়ে গেছে ডিকটেটরশিপের অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা। বর্তমান লেখকের সঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার জন্য পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর বলেন, 'ডিকটেটরদের পৃথিবীতে বাদলরা বাঁচবে কী করে? ওদের মরতেই হবে। না মরলে মারা হবে। সত্যাসত্যের হতভাগ্য লেখককে শেষ কাজটি করতে হয়েছে।' উপন্যাসের নায়কের মৃত্যু পঞ্চম খণ্ডে হয়নি, হয়েছে 'অপসরণ' নামক ষষ্ঠ খণ্ডে, ১৯৪২ সালে যেটি অন্নদাশঙ্কর সম্পূর্ণ করেন বাঁকুড়ায় জেলাজজ থাকাকালে। তার শোচনীয় মৃত্যুর বীজ বপন করেছিলেন তার বাবা মহিমচন্দ্র সেন। তিনি একই সঙ্গে টুর্গেনিভের 'ফাদার্স অ্যান্ড সন্স' থেকে নেমে আসা বাবা আবার দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ইতিহাস থেকে নেমে আসা ডিকটেটর। কিন্তু 'সত্যাসত্য' শুধু ডেমক্রেসির সঙ্গে ডিকটেটরশিপের বোঝাপড়ার কাহিনী নয়, অনেকান্ত তাৎপর্যে 'সত্যাসত্য' সমৃদ্ধ। এ-উপন্যাস ঘটনাপ্রধান নয়, ভাবনাপ্রধান। চরিত্রগুলির মৌল বিকাশের ধারা অনুসরণ এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য বিশ্ব ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে মানব অস্তিত্বের স্বরূপ সন্ধান।

॥ দশ ॥

'সত্যাসত্যে' মানুষের অস্তিত্বের শর্তাবলি বহিরাশ্রিত, ভাবনাগুলিও সেখানে বহির্মুখী। চিত্রকামের মৃত্যুর পর থেকেই অন্নদাশঙ্কর ব্যক্তিত্বের গভীরে নিহিত সত্তার স্বরূপ সন্ধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু 'সত্যাসত্য' শেষ না করা পর্যন্ত সাহিত্যসাধনায় নতুন পথে অভিযান শুরু করতে পারছিলেন না। 'সত্যাসত্য' শেষ করে লিখে ফেললেন 'মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না' নামে একটি ছোটগল্প। মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব থাকে সেটাই এই গল্পের উপজীব্য। তার পরে লিখলেন 'দু কান কাটা'। এখানে গল্পের নায়ক সুকুমার যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে, কিন্তু মনের মানুষকে সে সমাজ-সম্মত পথে পায়নি, পেয়েছে হৃদয়ের পথে। অন্নদাশঙ্কর এই গল্পে চাওয়া পাওয়ার অর্থটাকেই একটা সংশোধিত নতুন রূপ দিয়েছেন। মননপ্রধান সাহিত্যিক এখানে মরমীসাধনার সাহিত্যিক। আপন ব্যক্তিত্বকে যাচাই করেছেন সমাজের দর্পণে। তাঁর এই ধারার অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে 'সবার উপর মানুষ সত্য', 'হাসন সখী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ছোটগল্পের শিল্পরূপের মধ্যে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রক্ষেপ করতে গিয়ে বোঝা গেল যে ঐ রূপের এমন কতকগুলি শর্ত আছে যেগুলি মেনে চলতে গেলে নিজের সত্তা খানিকটা দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং বাদ পড়ে যায় অনেকখানি। ঐ সত্তাকে অবিকল রাখার জন্য অন্নদাশঙ্কর এক নতুন ঢঙে উপাখ্যান রচনা করলেন, এই উপাখ্যানের যে নায়ক তার নাম দিলেন বিনু। ওই নামের আড়ালে তিনি নিজের চেতনা উন্মেষের কাহিনী লিখলেন 'বিনুর বই'-এ। তার ভূমিকায় ১৯৪৪-এ তিনি নিজেই লেখেন, 'এটি কিন্তু কাহিনী হলো না। কাহিনী যদি হয়ে থাকে তবে জীবনের নয়, মনের। কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে নয়।' কবিতার এক একটি স্তবকের মত এর এক একটি পরিচ্ছেদ। বাক্যের স্পষ্টতা হল চিন্তার স্বচ্ছতার দ্যোতক। গভীর কথাকে গম্ভীর না করে বলেছেন সরল করে। পাণ্ডিত্যকে বর্জন করে গ্রহণ করেছেন বৈদগ্ধ্যকে। শিল্পচর্চার সঙ্গে সন্ধান করেছেন জীবনচর্যার সমন্বয়। একজন বিবেকবান শিল্পীর বহুতর প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণাকে এই গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন। 'আত্মানং বিদ্ধি'র তত্ত্বকে তিনি এখানে উলটে দিয়ে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে 'আমি কে'? এই জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ করেছেন।

লক্ষণীয় যে অন্নদাশঙ্কর যখন 'মন পবন' পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি লিখছেন তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটে যাচ্ছে বিস্ময়কর সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলি অথচ সে সব কাণ্ডকারখানার কোনও ছায়া পড়েনি তাঁর ছোটগল্পে অথবা

আত্মকথামূলক বিনুর উপাখ্যানে। অথচ এই সময়ই ঘটছে ঐতিহাসিক অগাস্ট বিপ্লব আবার এই সময়ই মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে উপস্থাপিত হচ্ছে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'।

তবে ১৯৪২ সালে লেখা 'আদিম পাপ' ও 'জন্মস্বত্ব' প্রবন্ধ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অত্যল্পকাল পরেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করল স্বাধীনতা সংগ্রাম। আবার এই পর্বেই মন্বন্তর জর্জরিত বাংলার বুক থেকে উঠল দারুণ হাহাকার। এই অস্থিরতার যুগকে বাংলার বহু সাহিত্যিক গল্প উপন্যাসে কবিতায় রূপ দিয়েছেন, কিন্তু অন্নদাশঙ্করের মত একান্তভাবে কালসচেতন ও দেশসচেতন সাহিত্যিককে 'রূপদর্শন' 'অজাতশত্রু' প্রভৃতি ছোটগল্প অথবা 'বিনুর বই'য়ের মতো আত্মকথা লিখতে ব্যাপৃত দেখে অবাক হতে হয়। আসলে এখানে তাঁর সাহিত্যিক সত্তা এবং সাংবাদিক সত্তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অস্থির চঞ্চল সমকালীন ঘটনাবলি যতক্ষণ না একটা কোনও সুস্পষ্ট পরিণতি পাচ্ছে ততক্ষণ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর প্রতীক্ষা করেছেন।

আরও গূঢ় কথা আছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি গোপন সম্পর্ক রেখেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে, ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে গোপন দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের কারও কারও সঙ্গে, ব্যক্তিগতভাবে আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিতে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারেরর ঊর্ধ্বতন কর্মচারী হিসেবে নিজেকে শিল্পে সাহিত্যে কোনও পক্ষভুক্ত করেননি। 'লোকলক্ষ্মী গর্ভিনী'—রবীন্দ্রনাথের এই প্রজ্ঞা অনুসারে সমকালীন পরিস্থিতির প্রতিচিত্রণ বা বিশ্লেষণ থেকে তিনি সচেতনভাবে বিরত থেকেছেন, নির্বাচন করে নিয়েছেন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা।

এবং এই পর্যবেক্ষক নিরুৎসুক নন, সম্পূর্ণ উৎসুক। এই পর্বে সমকালীন ঘটনাবলির পর্যবেক্ষক রূপে অন্নদাশঙ্করের মানসিক প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে সার্থক রূপ পেয়েছে। যখন ১৯৪৫-এর জুন মাসের সিমলা বৈঠকে জিন্না দাবি করলেন যে ভাইসরয়ের কাউনসিলে মুসলিম লিগের সদস্য নন এমন কোনও মুসলিম সদস্য থাকতে পারবেন না তখন সমঝোতার সব সম্ভাবনা নষ্ট হল। এই উপলক্ষে অন্নদাশঙ্কর 'রামরাজ্যবাদীর বিলাপ' নামে একটি ছড়া লেখেন। তারপর দেশভাগের আলোচনার উপরে বড়োদের জন্য লেখেন 'দুই রাণী' আর একই সঙ্গে ছোটোদের জন্য 'দুই বেড়াল ও এক বাঁদর' নামে দুটি ছড়া। চার বছর পরে 'দুই বেড়াল ও এক বাঁদরে'র পরিপূরকরূপে যোগ করেন 'পিঠে ভাগের পরে' নামের ছড়াটি। ইতিমধ্যে 'তেলের শিশি ভাঙল বলে / খুকুর পরে রাগ করো / তোমরা যে সব বুড়ো খোকা / ভারত

ভেঙে ভাগ করো! / তার বেলা?' ছড়াটি সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে প্রবাদের পর্যায়ে উপনীত।

বিশেষত সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার পরে অন্নদাশঙ্করের ছড়ার গোমুখী উন্মুক্ত হল, অচিরে তাঁর ছাড়াগুলি পরিণত হল বাংলা সাহিত্যের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগে কিংবা একটি স্বতন্ত্র শিল্প-রূপে। একদা তিনি চেয়েছিলেন সাংবাদিক হতে। কিন্তু সাংবাদিকের গুটিপোকা কেটে বের হল সাহিত্যিক প্রজাপতি। অন্নদাশঙ্করের ছড়া সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের বা সুকুমার রায়ের পরিশীলিত সুসম সুসংস্কৃত ছড়া নয়, অন্নদাশঙ্করের ছড়া অসম স্বতঃস্ফূর্ত ছড়া, স্বদেশের ও স্বকালের লোক-মানসের শিল্পিত প্রকাশ। তাঁর ছড়া একাধারে সভাসাহিত্য ও লোকসাহিত্য।

এই ছড়াসাহিত্যের পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্য। অর্থাৎ তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস। অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় অন্নদাশঙ্করের কথাসাহিত্যের পরিমাণ কম। পরিমাণে কম হলেও সেগুলির তাৎপর্য আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। প্রথম পাঠেই স্পষ্ট হয় যে বাংলা ছোটগল্পের অভ্যস্ত রূপ থেকে তাঁর ছোটগল্পগুলির রূপ ভিন্ন, সংজ্ঞার্থ স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে চল্লিশোর্ধ্বে পৌঁছে তিনি যে সব ছোটগল্প লিখলেন সেগুলির কোনও কেন্দ্রীয় ঘটনা বা নাটকীয় মুহূর্ত নেই, আছে একটি আশুচেতন মানুষের জীবন, আছে সেই বিশেষ জীবনের কতকগুলি অর্থবহ অভিজ্ঞতার সংযোগে এক-একটি পরম অনুভূতির আস্বাদন। 'পরীর গল্প' (১৯৫৬), 'মীন পিয়াসী' (১৯৫৯), 'ও' (১৯৬০) প্রভৃতি গল্পগুলিতে তিনি শুধু ছোটগল্পের রূপ-রীতিকেই ভাঙেননি, বাস্তবতা সম্বন্ধে পাঠকের অভ্যস্ত ধারণাকে ভেঙেছেন। এক মুহূর্তের জন্য সৌন্দর্য দেবীর দর্শন পাওয়ার জন্য 'ও' একটি জীবনভর প্রতীক্ষার কাহিনী। গল্পের শেষে না আছে কোনও আকস্মিকতা, না কোনও পরিণতি। কোথাও প্রচলিত রীতির অনুবর্তন নেই, প্রত্যেক গল্পেই করেছেন নতুন রীতির প্রবর্তন। এই অবিরাম সৃষ্টিশীল পরিবর্তনশীলতাই তাঁর গল্পগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থকে তার ছোটগল্প বহুদূর সম্প্রসারিত করেছে।

উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কন্যা' (১৯৫৩) ও 'সুখ' (১৯৬১)-এ অন্নদাশঙ্কর ইচ্ছাকৃত ও সচেতনভাবে রূপকথার রূপ ও কথাকে উপস্থাপন করেছেন বিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে। কৈশোরে প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারি কথা' পড়ে চিরন্তন নারীর যে-কল্পনা জেগেছিল, যা সমৃদ্ধ হয়েছে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্য আর পাশ্চাত্য সাহিত্য-শিল্পের অভিজ্ঞতা থেকে, তার অন্বেষণের নতুন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসে। এর প্রথম

ভাগ ১৯৫৭ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় কিন্তু তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় এক যুগ পরে। তার মধ্যে চিরন্তন নারীর অন্বেষণ নিয়ে লেখা হয়ে গেছে আরও দুখানি উপন্যাস—'বিশল্যকরণী' (১৯৬৭) ও 'তৃষ্ণার জল' (১৯৬৮)—আসলে একই কাহিনীর পরম্পরা। আবার দশ বছর পরে 'রাজঅতিথি' (১৯৭৮) উপন্যাসটির প্রকাশ। তারপরে শুরু করলেন 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাসমালা লেখা। অগাস্ট বিপ্লবে গান্ধীজির উদাত্ত আহ্বান, 'করেংগে য়্যা মরেংগে' এবং ১৯৪৮ সালে গান্ধীহত্যা—এই সময়-সীমার মধ্যে 'ক্রান্তদর্শীর' কাহিনীর বিন্যাস। এই বছরগুলোর মধ্যে ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছে স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং একই সংগে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার উম্মত্ততায়। আর চারদিকে বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়। এই ঐতিহাসিক ঘূর্ণাবর্তে 'ক্রান্তদর্শী'র পাত্রপাত্রীর অসহায় অস্তিত্ব। 'ক্রান্তদর্শী' শুধুমাত্র উপন্যাস নয়, এক দারুণ দুর্দিনের মর্মান্তিক ইতিহাস। অন্নদাশংকর ছিয়াত্তর বছর বয়সে ১৯৮০ সালে এই উপন্যাস শুরু করেন এবং সমাপ্ত করেন একাশি বছর বয়সে ১৯৮৫ সালে। কোন্ বুনিয়াদের উপর আধুনিক ভারতকে নির্মাণ করা হয়েছে তা অনুধাবনের জন্যেও 'ক্রান্তদর্শী' একটা অমূল্য সূত্র।

॥ এগার ॥

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে অন্নদাশংকর ছিলেন ময়মনসিংহের জেলা জজ। বাংলোর পরেই কিছুটা ফাঁকা জমি, তার পরেই ব্রহ্মপুত্র নদ। ছুটির দিনে সেখানে তিনি সাঁতার কাটতে যেতেন। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের এক সপ্তাহ আগে তিনি বদলি হন হাওড়ায়। বাংলো পাননি, থাকেন সারকিট হাউসে। পনেরো অগাস্টের সকালে হাওড়ার নেতারা তাঁকে পতাকা উত্তোলনের জন্য নিয়ে যান প্রথমে হাওড়া ময়দানে, তার পরে আদালতে। আর সন্ধ্যাবেলা অতুল্য ঘোষ নিয়ে যান হরিতকি বাগানের গৃহসভায়। যিনি সভাপতি তিনিই বক্তা। সভাশেষে অন্নদাশংকরের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় সেদিনই শপথ নিয়েছেন এরকম পাঁচজন মন্ত্রীর। অন্নদাশংকর তো শুধু একজন আই.সি.এস. আধিকারিক নন, একজন আদর্শবাদী সাহিত্যিকও। ব্রিটিশ আমলেও আদর্শের প্রশ্নেই বারবার তাঁর বিরোধ বেঁধেছে আরক্ষা আধিকারিকদের সংগে। অগাস্ট বিপ্লবের সময়ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের সংগে যোগাযোগ থেকেছে। জজের বাংলোতে চরকা কেটেছেন। আবার কখনও বাংলো ছেড়ে, বিনা অনুমতিতে স্টেশন ছেড়ে, ব্রিটিশ প্রশাসনের পরম শত্রু গান্ধীজির সংগে দেখা করতে। গান্ধীবাদী বলে সুপরিচিত ছিলেন ব্রিটিশ সরকারি মহলে।

এখন ভারত স্বাধীন। স্বাধীন ভারতে এরকম মানুষের জন্য চাই উপযুক্ত পদ। ওই অগাস্ট মাসেই অন্নদাশঙ্করকে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার ও কৃষি আয়কর ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেন্ট করা হল। কর্মোপলক্ষে প্রতিদিনই কারখানায় কাজ করতে গিয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের দশা দেখতে হত। আর তাদের থেকে চোখ সরালে দেখতেন দেওয়ালে টাঙানো বিকলাঙ্গ ভারতবর্ষের মানচিত্র। দুটি দৃশ্যই মর্মান্তিক, বিকলাঙ্গ মানুষ বিকলাঙ্গ স্বদেশ। সেই ১৯২৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত আঠারো বছরের কর্মজীবনে এই প্রথম কলকাতায় নিযুক্তি।

কলকাতায় মাত্র চার মাস থাকার পরে আবার বদলি হলেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক পদে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন গান্ধীবাদী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ঘোষ-মন্ত্রীসভার বিশেষ ইচ্ছাক্রমে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিরাকরণের জন্য অন্নদাশঙ্করকেই জেলা শাসকের পদে নির্বাচন করা হল। কিন্তু তিনি জেলা শাসকের দায়িত্বভার নেওয়ার অব্যবহিত পরেই ঘটল গান্ধীহত্যা। মুর্শিদাবাদের কোনো কোনো মহলে গান্ধীহত্যার আনন্দে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হল। এটা জেলার সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার পরিচায়ক। ইতিমধ্যে ঘোষ-মন্ত্রীসভার স্থলাভিষিক্ত হন রায়-মন্ত্রীসভা।

একদিন রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে ডেকে পাঠানো হল দুজন জেলা শাসককে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল, একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমান্তের মুসলমানদের তাড়িয়ে দিতে হবে। তাঁরা লিখিত আদেশ চাইলে স্বরাষ্ট্র সচিব বললেন, লিখিত আদেশ মিলবে না। মৌখিক আদেশই যথেষ্ট। কিছুদিন পরে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় আসেন মুর্শিদাবাদে। হাসিমুখে এলেন, ভারি মুখে গেলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় আর কিরণশঙ্কর রায়ের মধ্যে মতান্তর ঊর্ধ্বতন সরকারি মহলের আলোচ্য বিষয় হল। স্বাধীন মতাবলম্বী জেলা শাসককে মুর্শিদাবাদের মত গুরুত্বপূর্ণ জেলার শাসক পদে রাখা বিপজ্জনক মনে করে তাঁকে পত্রপাঠ বদলি করা হল কলকাতায়। কিন্তু তখনই তাঁকে কোনও পদে নিয়োগ করা হল না।

চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন কেন্দ্রে উচ্চতর পদের জন্য অন্নদাশঙ্করের নাম সুপারিশ করেন। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায়ের আসল পরিচয় এই যে তিনি বাঙালি সাহিত্যিক। সেজন্যই আই.সি.এস.-এ যোগ দেওয়ার সময় কর্মস্থল রূপে বাংলা বেছে নিয়েছিলেন। সুকুমার সেন স্বয়ং জওয়াহারলাল নেহরুকেও জানান যে অন্নদাশঙ্করের উপর অবিচার হয়েছে। কিন্তু ততদিনে অন্নদাশঙ্কর পদত্যাগের বিষয়ে মনঃস্থির করে ফেলেছেন। আই.সি.এস. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন যে বেশিদিন

সরকারি চাকরি করবেন না। এমনকি বিয়ের আগে ভাবীপত্নী অ্যালিসকে বলেছিলেন সেকথা, প্রথম সুযোগেই ত্যাগ করবেন অসাহিত্যিক পদ। নানা কারণে সে পরিকল্পনার রূপায়ণে দেরি হয়ে গেল। ততদিনে সুকুমার সেনের স্থলে চিফ সেক্রেটারি হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর অনুরোধে অন্নদাশঙ্কর এক মাসের জন্য জুডিসিয়াল সেক্রেটারির কাজ চালিয়ে দিতে রাজি হন। কিন্তু সেই এক মাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে ছয় মাসে পরিণত হল। ফলে তাঁর কার্যকাল দাঁড়াল একুশ বছর কয়েক মাস। এর ফলে ঘটনাক্রমে তাঁর পুরো পেনসন পাওনা হয়ে গেল।

একে বলে শাপে বর। প্রথম থেকেই তাঁর পদত্যাগপত্র দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এতদিনে দিলেন সে পত্র। তখন তাঁর পুরো পেনসন পাওনা হয়নি। কুড়ি বছরের অতিরিক্ত কার্যকাল সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে পুরো পেনসন পাওনা হল। বড়ো ছেলে বড়ো মেয়ে আগেই চলে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে। দ্বিখণ্ডিত পরিবার আবার পেল অখণ্ড রূপ। অবশেষে ১৯৫১ সালে শুরু হল তাঁদের বহু বাঞ্ছিত শান্তিনিকেতনে বাস।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের আমলে ছিল আশ্রম আর রথীন্দ্রনাথের আমলে হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়। অন্নদাশঙ্করকে এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি এক চাকরি ছেড়ে আর একটা চাকরি করতে চাননি। কথা দেন যে বিশ্বভারতীর প্রথম রেজিস্ট্রারকে তাঁর দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবেন।

অন্নদাশঙ্করের যৌবনের প্রধান অংশই কেটেছে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ সেই ভূখণ্ডে যা ১৯৪৭-এর পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান রূপে নামাঙ্কিত। পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কর্মের সূত্রে, কিন্তু বন্ধনটা আত্মার। রাজনৈতিক ব্যবধানের চেয়ে সত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলন। তবে সম্মেলনের মধ্যে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আছে। তাই অন্নদাশঙ্কর প্রস্তাব দিলেন সাহিত্য মেলার। উপলক্ষ ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি। তার স্মরণে পাকিস্তান ও ভারতের বাঙালি সাহিত্যিকরা দু তিন দিনের জন্যে একত্র হয়ে দেশভাগের পর থেকে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবেন, ভাব বিনিময় করবেন। এটা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আদর্শেরই অঙ্গীভূত। যখন ১৯৫৩ সালের সেই বিখ্যাত সাহিত্যমেলা বসল তখন শান্তিনিকেতনে চলছিল বাৎসরিক বসন্ত উৎসব। 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল। স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।' বর্তমান লেখক সেই ঐতিহাসিক মেলার একজন সক্রিয় অংশীদার। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় আলোড়ন। তার পরোক্ষ প্রেরণা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু উপস্থিত পুরোহিত অন্নদাশঙ্কর।

অন্যদিকে ভারতের রাজধানীতে সংগঠিত হয় সাহিত্য অকাদেমি। জওয়াহারলাল নেহরু তার সভাপতি আর সহসভাপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। শুরু থেকেই অন্নদাশঙ্কর হন সাহিত্য অকাদেমির কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য। অন্যান্য কর্তাদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কে. এম. পানিককর, হুমায়ুন কবির প্রমুখ। যখন সাধারণ সংসদের সভা হত তখন অকাদেমির খরচে অন্নদাশঙ্করকে যেতে হয় দিল্লীতে। অন্য কার্যকর্তারা থাকেন দিল্লিতে। অন্নদাশঙ্করকে শান্তিনিকেতন থেকে যেতে হয় দিল্লিতে, আবার ফিরতে হয় শান্তিনিকেতনে। এক এক বারে পথে চার দিন সময় নষ্ট। ফলে ১৯৫৬ সালে অকাদেমির কার্যকর্তা পরিষদে পদত্যাগ।

চাকরির সুবাদে অন্নদাশঙ্কর জেনেছেন বাংলা ও বাঙালিকে। আর সাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হয় ভারতের সর্বোচ্চ স্তরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির, তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার সস্ত্রীক এক পংক্তিতে ভোজনের সুযোগও হয়। খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও হয় তাঁদের কারও কারও সঙ্গে। কিন্তু বারবার সাহিত্য অকাদেমির কাজে আসা যাওয়া করতে করতে অনেকখানি সময় নষ্ট হচ্ছিল তাঁর, তাতে ক্ষতি হচ্ছিল সাহিত্যের সাধনায়। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের জন্যই ছাড়লেন সাহিত্য অকাদেমির সংসর্গ।

সাহিত্য অকাদেমি ছাড়লেও অন্নদাশঙ্কর পোয়েটস এসেয়েস্টিস নভেলিস্টস সংক্ষেপে পি ই.এন. বা পেন ক্লাবের সদস্যপদ ছাড়েননি। এটি এক আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই সংস্থার সূত্রেও জওয়াহারলাল, রাধাকৃষ্ণন প্রমুখের সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর পরিচিত হন। পি ই.এন. ক্লাবের সদস্য রূপেই অন্নদাশঙ্কর ১৯৫৭ সালে যান জাপান ভ্রমণে। জাপান প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের প্রতিস্পর্ধী এক প্রাচ্য সভ্যতা। প্রাত্যহিক সংগ্রামে পাশ্চাত্য কিন্তু অন্তগূর্ঢ় সাধনায় প্রাচ্য কিংবা আরও নির্দিষ্টরূপে বললে জাপানী। তাঁর জাপান দর্শনের কাহিনী নিছক ভ্রমণের কাহিনী নয়, জাপানের সাধনার স্বরূপ সন্ধানের কাহিনীও বটে। 'জাপানে' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। আবার ১৯৬৩ সালে সাহিত্যিক রূপেই জার্মান রেপাবলিকের আমন্ত্রণে যান জার্মানি এবং পি ই এন.-এর ব্যবস্থাপনায় ফ্রান্স ও ইংলন্ড। যখন যে দেশে গেছেন তখনই সে দেশের সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক অধ্যয়ন ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে গেছেন সে দেশের বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের সমকক্ষতা অর্জন করে। দ্বিতীয় বার ইয়োরোপ ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ফেরা' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে।

পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিন চার দিনের জন্য কলকাতায় বেড়াতে আসেন অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়। কয়েকদিন পরেই একুশে ফেব্রুয়ারি। সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হবেন অন্নদাশঙ্কর রায়। যদিও একুশে

ফেব্রুয়ারি অমর হয়েছে পাকিস্তানের সরকারি ভাষানীতির প্রতিবাদে শহীদ দিবস রূপে, তবু ১৯৬৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির স্মরণসভায় পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব সৈয়দ হাসান ইমাম যোগ দিতে রাজি হন। সেই উপলক্ষে অন্নদাশঙ্কর আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে। এক অর্থে ১৯৬৭ সালের শহীদ দিবস হবে ১৯৫৩ সালের সাহিত্য মেলার জের। ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছ থেকে ফিরে এসে দেখেন ইতিমধ্যে লীলা রায় পড়ে গিয়ে উরুদেশের হাড় ভেঙেছেন। অবিলম্বে অপারেশন চাই। যেদিন অমর একুশের অনুষ্ঠান সেদিনই অপারেশন। সভাপতি হিসেবে অন্নদাশঙ্কর নির্দেশ দেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি গাইবার জন্য। সভাস্থ অনেকেই উদ্দীপ্ত হয়ে গলা মেলালেন গায়কদের সঙ্গে। চার বছর পরে এই গানই হয় স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। আর যে সার্জন অপারেশন করলেন তিনি বললেন পেসেন্টকে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে ভাঙা হাড় ঠিকভাবে জোড়া লাগছে কিনা। আর নিয়মিত পরীক্ষার জন্য দু বছর লীলা রায়কে কলকাতাতেই থাকতে হবে কোনো একতলা বাড়িতে। তখন থেকে শুরু হল অন্নদাশঙ্করের কলকাতা বাস।

অন্নদাশঙ্করের আই.সি.এস. চাকরিতে ঢোকার অন্যতম কারণ ছিল বাংলা ও বাঙালিকে জানার ঐকান্তিকতা, চাকরি ছাড়ার তাৎক্ষণিক কারণ ছিল বাঙালি ঐক্য ভাঙার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সাহিত্য মেলায় তাঁর উৎসাহের কারণ ছিল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে বাঙালি সংহতি রক্ষার জন্য আহ্বান জানানো এবং কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের উপলক্ষ ছিল সোনার বাংলার স্বপ্ন। অবশেষে সেই স্বপ্ন আংশিকভাবে সত্য হল ১৯৭১ সালে। অন্নদাশঙ্কর লিখলেন, 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা / গৌরী মেঘনা বহমান / ততকাল রবে কীর্তি তোমার / শেখ মুজিবর রহমান।' কিন্তু এই স্বপ্নের মূল স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট আততায়ীদের হাতে নিহত হন। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অন্নদাশঙ্কর লিখলেন 'কাঁদো, প্রিয় দেশ' নামে একটি প্রবন্ধ। সমগ্র উপমহাদেশে তখন দারুণ উত্তেজনা। পাছে আন্তর্জাতিক বিতর্কে ভারত জড়িয়ে পড়ে তাই সে-প্রবন্ধ প্রকাশে কেউ রাজি হয় না। পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। ততদিনে স্বাধীন বাংলাদেশের মূল স্থপতির সহকারীরাও নিহত। অপূর্ণ থেকে যায় অন্নদাশঙ্করের স্বপ্ন। এক হিসেবে অন্নদাশঙ্করের জীবন দল-ধর্ম-রাজনীতি-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে চিরন্তন বাঙালির অন্বেষণ।

॥ বারো ॥

অন্নদাশঙ্করকে শুধু চিরন্তন বাঙালির অন্বেষক বলে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁর ব্যক্তিত্ব বহুমুখী। সেই ব্যক্তিত্বের একটা তাৎপর্যপূর্ণ মুখ হল তাঁর সৃষ্টিশীলতা। সৃষ্টির দার্শনিক তাৎপর্যের দুঃসাহসিক অন্বেষণে ব্যাপৃত না হয়েও বলা যায় যে অন্নদাশঙ্করের কাছে সৃষ্টির প্রাথমিক তাৎপর্য হল সাহিত্য সৃষ্টি। কিন্তু এই সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে আছে অন্নদাশঙ্করের শিল্প জগৎ। কাকে বলে শিল্প? এই প্রশ্নের উত্তর অন্নদাশঙ্কর বিশদভাবে দিয়েছেন আর্ট'' নামক গ্রন্থে। শুরু করেন ১৯৪৪ সালে, পর্বে পর্বে শিল্প রহস্যের উন্মোচন সম্পূর্ণ করেন ১৯৬৮ সালে। বাংলায় শিল্পতত্ত্বের সুগভীর, সুবিন্যস্ত ও মৌলিক বিশ্লেষণে 'আর্ট'' আজও অদ্বিতীয়। 'আর্ট''এ তিনি বলেছেন সর্বকালীন সাহিত্যের কথা আর 'সাহিত্যে সঙ্কট' শীর্ষক ভাষণমালায় বলেছেন সমকালীন সাহিত্যের কথা। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাসের সংকট 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে পেয়েছে এক রকম রূপ আর দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ের পাশ্চাত্য সাহিত্যে উল্লিখিত সংকট পেয়েছে অনেকান্ত রূপ। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সীমানাকে সম্প্রসারিত করলে পাওয়া যাবে সাম্প্রতিক বিশ্ব সাহিত্য। এখানে সাম্প্রতিকতার অর্থ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ যেহেতু এই বক্তৃতামালা প্রদত্ত হয় ১৯৫৫ সালে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গান্ধীর আবির্ভাবের সময় থেকেই অন্নদাশঙ্কর গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ। অসহযোগ আন্দোলনের উন্মাদনায় ভেবেছিলেন ব্রিটিশদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ না করে যোগ দেবেন আন্দোলনে। ঘটনাক্রমে তাঁকেই যৌবন অতিবাহিত করতে হল ব্রিটিশ সরকারের পরিষেবায়। কিন্তু শিক্ষানবিশির কালে ইংলণ্ডে এবং চাকুরিকালে এদেশে তাঁর বেসরকারি পরিধান ছিল খদ্দর। পরিস্থিতি অনুসারে সরকারি স্থানেও পরতেন খদ্দরের স্যুট। গান্ধীহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন 'প্রত্যয়' নামক প্রবন্ধ-মালা। সে একটা যুগ এসেছিল যখন গান্ধী বিরোধিতা ছিল জাতীয়তাবাদের অপর নাম, আর জাতীয়তাবাদের মুখোশের আড়ালে সাম্প্রদায়িকতা। এরকম জাতীয়তাবাদের উৎপীড়নই ছিল অন্নদাশঙ্করের পদত্যাগের উপলক্ষ। পরে ১৯৬৯ সালে প্রকাশ করেন 'গান্ধী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ। যা পরে ১৯৭৬ সালে 'Yes, I Saw Gandhi' নামে প্রকাশিত হয়। আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে গান্ধীর মতবাদ ও ব্যক্তিত্বকে অন্নদাশঙ্কর অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'গান্ধী' জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির ভক্তিপূর্ণ জীবনী নয়, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে তাঁর 'গান্ধী' হলেন আন্তর্জাতিক ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক।

অন্নদাশঙ্করের কাছে রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্য স্বভাবতই অনেকান্ত। রবীন্দ্রনাথের অর্থ আনন্দ তারুণ্য সৌন্দর্য। কল্যাণবৃত্তি ও বিকাশশীলতা, মানবিকতা ও সহযোগিতা। সেই প্রথম যৌবনে 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন 'রক্তকরবীর তিনজন' শীর্ষক রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধটি লিখে। সম্পাদক আরও লেখা চাইলে অন্নদাশঙ্কর 'পথে প্রবাসে' লেখা শুরু করলেন। 'পথে প্রবাসে'র লেখকের কাছে 'কল্লোল'-এর পক্ষ থেকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লেখা চেয়ে পাঠালে অন্নদাশঙ্কর লন্ডন থেকে 'রবীন্দ্রাদিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন। ইয়োরোপ থেকে ফিরে অচিন্ত্যকুমারকে সঙ্গে নিয়েই অন্নদাশঙ্কর শান্তিনিকেতনে গেলেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখী' দেওয়ার জন্য। যখন ১৯৪০ সালে অন্নদাশঙ্কর সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে যান তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন লীলা রায়কে, 'শুনেছি তুমি কর্মিষ্ঠা মেয়ে। এখানে এত রকম বিভাগ। একটা কোনও বিভাগে যোগ দাও।' পরের বছর—তখন অন্নদাশঙ্কর বাঁকুড়ার জেলা জজ—পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে রচিত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন অন্নদাশঙ্করকে : 'শূন্য ঝুলি আজিকে আমার ; / দিয়েছি উজাড় করি / যাহা কিছু আছিল দিবার, / প্রতিদানে যদি কিছু পাই / কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা / তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই। পারের খেয়ায় যাব যবে / ভাষাহীন শেষের উৎসবে।' রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬১ সালে অন্নদাশঙ্কর প্রকাশ করলেন 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একখানি গ্রন্থ। মৌলিক মননে ও স্বকীয় সংজ্ঞায় সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন থেকে যায় রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য আবির্ভাবের অনেকান্ত পটভূমি সম্বন্ধে। অন্নদাশঙ্কর ১৯৭১ সালে উক্ত পটভূমির উজ্জ্বল ও বিশদ মানচিত্র এঁকেছেন 'বাংলার রেনেসাঁস' নামক গ্রন্থে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যে সাংস্কৃতিক জাগরণ হয় তার প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়ে বহু রচনা ও বহু বিতর্কের মধ্যে 'বাংলার রেনেসাঁস' লেখকের নিজস্ব বৈদগ্ধ্যে স্বতন্ত্র। এই রেনেসাঁস তাঁর দৃষ্টিতে প্রথাসিদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদ। একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তি যখন পাণ্ডিত্যমূলক বিষয়ের মূল্য নির্ণয় করেন তখন স্বভাবতই তার তাৎপর্য উন্নীত হয় উচ্চতর স্তরে, তার উপরে যদি সেই ব্যক্তির অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা হয় গভীর ও ব্যাপক তাহলে তার প্রতিফলনে গবেষণামূলক রচনাও পায় সৃষ্টির দ্যোতনা।

একথাটা অন্নদাশঙ্করের প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণীয় যে তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করার মানুষ তিনি নন। 'সত্যাসত্যে'র বাদল কর্তার কর্তৃত্বের কাছে একবার মাথা নোয়াবার খেসারত দিয়েছে তার সমস্ত জীবন দিয়ে। ইংরেজ আমলে শাসন বিভাগে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে বারবার সংঘর্ষ হয়েছে একথা আগে বলেছি। আর স্বাধীন ভারতে যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে

তাঁর মতভেদ হয়েছে তখন সভ্যভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে সরে এসেছেন কর্তৃত্বের কবল থেকে। ব্যক্তিগত অসুবিধা হতে পারে ভেবে তিনি নিজের কথা বলা থেকে কখনও নিরস্ত হননি। সুবিধাবাদী মৌননীতি বর্জনে তিনি আপোসহীন। তাঁর কণ্ঠস্বর চিরকালই প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, কিন্তু শুধু এই পরিচয়ের সীমানাতে আবদ্ধ থেকে তাঁর সন্তুষ্টি নেই। পাকিস্তানে যখন ১৯৫৮ সালে গণতন্ত্র উচ্ছেদ করে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হল তখন তিনি তীব্র মর্মদাহে লিখলেন 'চন্দ্রগ্রহণ' ও 'একেশ্বরবাদ' নামে দুটি প্রবন্ধ, 'অপ্রমাদ' নামক গ্রন্থে প্রবন্ধ দুটি ১৯৬০ সালে সংকলিত হয়। গণতন্ত্রের নির্বাসন ও একনায়কতন্ত্রের প্রবর্তন পৃথিবীর যেখানেই হোক-না কেন অন্নদাশঙ্করের অনুভবে তা জাগায় প্রবল প্রতিবাদ। আবার ভারতে যখন ১৯৫৯ সালে কেরলে গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট গভর্নমেন্টকে সংবিধানের ৩৫৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদ অনুসারে উৎখাত করা হয় তখনও অন্নদাশঙ্কর প্রতিবাদ জানান 'সূর্যগ্রহণ' নামক প্রবন্ধে এবং অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের মতো বিশ্লেষণ করে দেখান যে কেন এক্ষেত্রে ওই বিশেষ অনুচ্ছেদটি প্রয়োগের অযোগ্য। এই প্রবন্ধটি ১৯৬১তে প্রকাশিত 'দেখা' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এবং তার ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছেন, 'সূর্যগ্রহণ লেখার পর রাজনীতির উপর আমার ঘেন্না ধরে যায়।' ভেবেছিলেন সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে আর লিখবেন না। তাই ১৯৬০ সালে অসমে যেসব মর্মন্তুদ কাণ্ড ঘটে সেসবেও প্রথমে নীরব ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখে ফেললেন 'ড্রাগনের দাঁত' নামে একটি প্রবন্ধ। ওই প্রবন্ধ আনন্দবাজার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হলে কোনো কোনো শহরে সংখ্যাটি কেড়ে নিয়ে পোড়ানো হয়। আবার যখন ১৯৬২ সালে চীন ও ভারত সীমান্ত নিয়ে বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে তখন অন্নদাশঙ্কর 'দেশ' পত্রিকায় লেখেন 'যোগভ্রষ্ট'। তখন 'দেশ' সম্পাদক দেশ বিপন্ন হলে শিল্পীর দায়িত্ব কী এ বিষয়ে বহু সাহিত্যিকের মতামত 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পত্রিকায়। সবার বক্তব্য থেকে স্বতন্ত্র ছিল অন্নদাশঙ্করের বক্তব্য। এবং অবশ্যই সবচেয়ে তথ্যসমৃদ্ধ। আবার ১৯৬৪ সালে ভারত উপমহাদেশে হজরত-বাল নিয়ে বাধল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! অন্নদাশঙ্কর লিখলেন 'নক্ষত্রের আলো'। কিন্তু দেশবাসীর কাছে সেই অন্ধকার দুর্দিনে 'নক্ষত্রের আলো' পৌঁছে দেবে কে? বিভিন্ন পত্রিকা থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে হতে শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হল 'পরিচয়' পত্রিকায়। এ-রকম অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যায় যেখানে অন্য অনেকে নিরুত্তর, প্রতিবাদী শুধু একা অন্নদাশঙ্কর। আবার ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিম বাংলা যখন মুক্তির দশকের উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত, বুদ্ধিজীবী সমাজ যখন মনীষীদের সম্ভ্রম পাতনে সন্ত্রস্ত, তখন অন্নদাশঙ্কর ঘোষণা করলেন

'প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার'। আর বাংলাদেশে মুজিব ও অন্যান্য নেতৃবর্গের হত্যাকাণ্ডে অন্নদাশঙ্করের প্রতিক্রিয়ার কথা আগেই বলেছি।

ঘরে বসে সাহিত্য তথা সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় একথার প্রতিবাদ অন্নদাশঙ্কর জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন। যখন প্রতিবেশী দেশের এক সাহিত্যিকের উপর কয়েকজন অখ্যাত ধর্মান্ধ মৃত্যুদণ্ড জারি করে তখন উননব্বই বছরের বৃদ্ধ অন্নদাশঙ্কর প্রতিবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। মানুষকে তিনি জাতপাত জেলা মহকুমার সীমানা দিয়ে আবদ্ধ করতে প্রস্তুত নন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে সব দেশের সব মানুষই এক সংহত মানব পরিবারের অন্তর্গত এবং এই মানব পরিবারের ধারণার উপরেই ১৯৪৮ সালে রচিত হয়েছে মানবাধিকারের সনদ। শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত মানুষের সামনে অন্নদাশঙ্করের জীবন বিবেক ও সাহসের উৎস।

অন্নদাশঙ্করের প্রতিবাদী জীবনের নেপথ্যকাহিনী তিনি নিজেই উন্মোচন করেছেন 'বিনুর বই : দ্বিতীয় পর্ব" নামক আত্মকথামূলক অসাধারণ সাহিত্যে। এ বই শুধু একজন সাহিত্যিকের জীবনের ঘটনাগুচ্ছের সংকলন নয়, কী ভাবে সেই সাহিত্যিক কায়েমি ব্যবস্থার থেকে ক্রমে ক্রমে সরে গিয়ে এক স্বকীয় ব্যক্তিত্বে বিকশিত হল, কোন্ কোন্ বিন্দু থেকে তাঁর অমোঘ অপসারণ ও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁর রূপান্তরিত আত্মাবর্তন সেসব বৃত্তান্তে 'বিনুর বই : দ্বিতীয় পর্ব" সচেতন পাঠকের জন্য এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এই বইয়ের শেষ অনুচ্ছেদটি এই জীবনকাহিনীরও উপযুক্ত উপসংহার বলে উদ্ধৃত করছি,

> 'মানুষের স্বয়ংসংশোধিকা শক্তিতে বিনুর বিশ্বাস অটল। একটা প্রজন্মের ভুল আর একটা প্রজন্ম সংশোধন করবে। একটা শতকের ভুল আর একটা শতক। তবে কতক মানুষকে সদা সজাগ থাকতে হবে। তারা অতন্দ্র প্রহরী।'

অন্নদাশঙ্কর আমাদের শতাব্দীর একজন অতন্দ্র প্রহরী।

তুলনারহিত অন্নদাশঙ্কর

মহাশ্বেতা দেবী

অন্নদাশঙ্কর রায় এমন গল্পলেখক, যাঁর কোনো উত্তরসূরি নেই। তাঁর পূর্বসূরি হিসেবে নয়, তবু তাঁর গল্প, আমাকে আর দু'জন গল্পলেখকের কথা মনে পড়ায়, চারুচন্দ্র দত্ত ও প্রমথ চৌধুরী। এই তিনজনের লেখার আবেদন কোথাও মস্তিষ্কগ্রাহ্যও বটে। মিল বোধ হয় এখানেই শেষ। তবে অন্নদাশঙ্করের কোনো সার্থক বা অসার্থক উত্তরসূরি নেই। তাঁর লেখায় বুদ্ধিগ্রাহ্যতা যেমন, হৃদয়গ্রাহ্যতাও তেমনই। তাঁর পরিশীলিত কৌতুক-বোধকে "উইট" বলতে পারি, সমার্থক বাংলা শব্দ জানি না। এবং অবশ্যই "উপযাচিকা", বা "দু কান কাটা", বা "স্তনন্ধয়" বা যে কোনো গল্প পড়ে যা আমার বয়সী লোকেরও মনে হয়,—সময়, তাঁর সময়কাল ইতিহাসের মতো ধরা দেয়। বস্তুত ১৯০০-১৯৪০ সময়টা সম্পর্কে, গল্পগুলি আবার পড়তে গিয়ে মনে জাগে নস্টালজিয়া। একেবারে তো অপরিচয় ছিল না সে সময় বিষয়ে। সময় বলতে আমি প্রাক্তন আই.সি.এসের কাজের সময় বলছি না। পুরুষ ও নারী সম্পর্কিত ব্যাপারেও দশক-বদল আছে। আমরা তেমন সমাজ কিছু দেখেছি, কিছু শুনেছি।

কিছু কিছু ব্যাপার তো চিরকালীন, যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহই সব। অন্নদাশঙ্কর পুরুষের চোখে নারীর কত রকম এস্টিমেশান না দেখিয়েছেন। "উপযাচিকা" গল্পে বৃন্দাবন যৌনরোগে আক্রান্ত হয় এবং দৈবাদেশে বিয়ে করে এক বালিকাকে। "হিন্দুধর্মের কি বা মহিমা। বিয়ে করলুম বারো বছর বয়সের অনাঘ্রাত কুসুম। আর দেখতে না দেখতে রোগ গেল ছেড়ে।" সতী স্ত্রী অবশ্যই স্বামীপ্রদত্ত রোগে মারা যায়। বৃন্দাবন আবারও বিয়ে করে, কেননা মেয়ের বাবারা জানেন মেয়ের বিয়ে না দিলে জাত থাকে না। বৃন্দাবনও জানে, "বিয়ে না করলে আবার খারাপ হয়ে যায়"। না, বৃন্দাবনরা, সেই মেয়েরা, মেয়েদের বাবারা, সকলে সমাজেই আছেন!

এই গল্পেই আছে অত্যন্ত ভালো লাগার মতো মেয়ে সুবর্ণ। স্বামী না-মরদ, সুবর্ণ স্বামী ছাড়ে। পড়শিদের সিধা জবাব দেয়, "আমি ব্রহ্মচারিণী হতে পারব না। আপনারা কে কে ব্রহ্মচারী শুনি?" সে মামাবাড়িতেও থাকতে পারে না, কেননা "মামাতো ভাই বোনে প্রেম যদি

না হল, তবে প্রগতি কাকে বলে"। এরপর এই সুবর্ণ নায়কের বাড়ি পাচিকা হতে আসে। ব্যাচেলর নায়ক এবং সুবর্ণের কথার লড়াই অসামান্য। তা একাধারে wit-এ impish, এবং অন্যদিকে কৌতুকের ছুরিতে বিশ্লেষণী। এমন এক একেবারে সংস্কারমুক্ত, প্রকৃতিস্বরূপা রমণীকে শহুরে নায়ক ভয় পান। সুবর্ণ মুসলিম হয়ে এক পেশোয়ারি ফলওয়ালাকে বিয়ে করে। অন্নদাশঙ্কর খুব কম কথায় এটাও বলে দিয়েছেন, একান্নবর্তী বা বড়ো পরিবারে মেয়েদের যৌন অভিজ্ঞতা ঘর থেকেই হত।

আর "দু'কান কাটা" গল্পে বলেছেন নারীসঙ্গের অভিজ্ঞতার আগেই কিশোরদের মধ্যে সমকামিতার কথা। সুকুমার দেখতে সুন্দর ছিল। এবং "চাঁদপানা ছেলেদের পিছনে রাহুর দল ঘুরত।...আমরা নিঃস্বার্থ ছিলুম না। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। সুকু তা জানত তাই আমাদের প্রশ্রয় দিত না"। এই সুকু তার প্রণয়িনীকে শেষ অবধি "রাধা" বলে মেনে নিয়েই সুখী থাকে। রাধা যে, সে তো তার একার হতে পারে না।

"অপ্সরা" গল্পের জীবনবাবু স্ত্রীকে জীবিতকালে দাবিয়ে রাখেন, এবং মৃতা স্ত্রীর কাছে প্ল্যাঞ্চেটে জানতে চান, পরলোকে তিনি সতীত্ব রেখে চলছেন কি না।

"রূপদর্শন", "স্ত্রীর দিদি" মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজে সহস্র সংস্কারবন্ধতার মধ্যে দাম্পত্য ও পরিবার জীবনে নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে অত্যন্ত ধারালো গল্প। অন্নদাশঙ্করের উইটে একসময়কার ইংরেজ লেখকদের কথা মনে পড়ে, যেমন অলডাস হাক্সলি। নির্মল তার ভালোমানুষ স্ত্রী শেফালিকে রেখে (স্ত্রীর দিদি) বড়ো শ্যালিকা সোহিনীর কাছে যায়। সোহিনী তার কৃতী ও বয়স্ক স্বামীর দ্বিতীয়া স্ত্রী। সোহিনীর "গড়নে বজ্র, ধরণে বিদ্যুৎ। তার একটা না একটা অঙ্গ সমস্তক্ষণ কথা কইছে। যেন তাকে গড়বার সময়ে বিধাতা পারদের খাদ মিশিয়েছিলেন"।

নির্মল সোহিনীর বাড়ি এলাহাবাদে হাজির হয় দুর্গ নিয়ে গবেষণার অছিলায়। অতঃপর যা ঘটে, গল্পটি পড়াই ভালো। তবে যৌনতার কথা অন্নদাশঙ্করই এতটুকু ভাল্গার না হয়ে লিখতে পারেন। নির্মল ও সোহিনীর দেহজসম্পর্ক শুরু হয় চুম্বন দিয়ে। সোহিনীর স্বামী দেখেন রবীন্দ্রনাথ জাল করে নির্মল সাতাশটি কবিতা লিখে ফেলেছে। কবিতার খাতার মধ্যে কয়েকটি দীর্ঘ কেশ। অতঃপর নগেন্দ্রর জিজ্ঞাসা, "...আমার মাথাটা তুমি কতদূর কেটে রেখেছ জানতে ইচ্ছা করে। চুম্বন আলিঙ্গনের পরিখা পারে থেমেছ, না দুর্গ জয় করেছ?" নগেন্দ্র যখন গর্জে ওঠেন, "যাও, এটিকে নিয়ে যাও। গিয়ে ওটিকে দাও পাঠিয়ে।" তখন "নির্মল ফণা তুলল"।

"স্তনস্বর" গল্প অবশ্য বঙ্গীয় পুরুষসমাজ বিষয়ে মর্মান্তিক রায়। নবনীমোহন দশ বছর অবধি স্তন পান করেছে, যৌবনেও তার মধ্যে গোপাল ভাব। স্তনই তার চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে। বয়স্কা মহিলাদের কাছে গিয়ে ছলে বলে লুকিয়ে স্তন স্পর্শ করেই তার যৌনতৃপ্তি। "নারীর কাছে যায় নারী মাতৃজাতি বলে। নারীকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারে না।" ইংলন্ডে গিয়ে সে সেখানকার রমণীদের উপর বিরক্ত। "তারা যেন মাতৃজাতিই নয়।" নবনী স্তন ছুঁতে গেলে তারা রূঢ়ভাবে হাত ঠেলে দেয়। নবনী যা করে, তা অসভ্যতা, কিন্তু ভারতীয় গোপাল ভাবে ভাবিত নবনী তা জানে না। অতএব সে যায় প্যারিসে। এক ফরাসিনি ক্যাবারে নর্তকীর ঘরে গিয়ে সে শুধু অনেক ভূমিকা পালন করে স্তন ছুঁতে চায়। মেয়েটি স্তন অনাবৃত করে।

"নবনী কোনদিন অনাবৃত স্তন দেখেনি। দেখে প্রায় মূর্ছা যায় আর কি! চেঁচিয়ে উঠল, "Obscene! Obscene!"

"এইস্থলে বলে রাখতে হয়, নবনী হচ্ছে সেই জাতের মরালিস্ট যাঁরা দুই তিন পক্ষ বিয়ে করেন, এক আধ ডজন পুত্রকন্যার জনক হন, তবু যদি কেউ কোন ক্রিয়ার উল্লেখ করলে, অমনি চেঁচিয়ে ওঠেন, "Obscene! obscene!"

"দাদা তো চেঁচিয়ে উঠলেন, "obscene! obscene!" সুন্দরী বুঝলেন, "চমৎকার! চমৎকার!" তখন বিনা আড়ম্বরে একে একে প্রতি অঙ্গ উন্মোচন করলেন।

"নবনী এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার সংজ্ঞা লোপ হলো।"

আমি তো মনে করি, বাঙালির হিপোক্রিসি এমন যাথার্থ্যে কোনো লেখকই উন্মোচন করেন নি। এই হিপোক্রিসি জাতীয় চরিত্রে সর্বত্র। মানুষে মানুষে সম্পর্কের কথা সাহিত্যে যখন আসে, তাতেও বিশ্লেষণী নিরপেক্ষতার অতীব অভাব। তাই আবারও বলি, গল্পকার অন্নদাশঙ্করের উত্তরসূরি এখনো নেই, হবে বলেও মনে করি না। বাংলা, তথা ভারতীয় সাহিত্যের এক বিশাল ক্ষতি হল, আমরা যথেষ্ট বলিষ্ঠ নই। নিজেদের নিয়ে হাসতে জানি না। নিজেদের দুর্বলতাগুলি নিয়ে যদি, প্রচন্ড ও বলিষ্ঠ ঠাট্টা না করতে পারি, সাবালকত্বও থেকে যায় অনায়ত্ত। বাংলা সাহিত্যের শৈশব আছে, প্রৌঢ়ত্ব আছে, নিখাদ নির্ভেজাল যৌবন নেই।

অন্নদাশঙ্কর ব্যতিক্রম। আমি সাহিত্য আলোচনা বা বিশ্লেষণে খুবই অপারগ মানুষ। কোনোদিন কেউ তাঁর গল্পগুলি নিয়ে সঠিক যোগ্যতায় আলোচনা করুন এমত প্রত্যাশায় এই নবতিপূর্ণ যুবককে সেলাম জানালাম।

অতন্দ্র ভাবুক অন্নদাশঙ্কর

শিবনারায়ণ রায়

অন্নদাশঙ্করের লেখার সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন আমার বয়স তেরো, স্কুলের চৌহদ্দি তখনো পার হই নি। তিনি বয়সে আমার চাইতে সতেরো বছরের বড়ো, কিন্তু যে বইটির সূত্রে আমি তাঁর চিন্তার এবং রচনারীতির অনুরাগী হই সেটি তিনি যখন রচনা করেছিলেন তখন তাঁর বয়স চব্বিশ—অর্থাৎ সেই প্রথম পরিচয় কালে লেখক এবং পাঠকের মধ্যে ব্যবধান ছিল এগারো বছরের। আমি জন্মেছি, বড়ো হয়েছি উত্তর কলকাতার রক্ষণশীল পণ্ডিত-পরিবারে। কিন্তু স্কুলে পড়বার সময়েই আমার কিশোর মনে বিদ্রোহের প্রতিন্যাস পরিস্ফুট হতে শুরু করে। বাড়িতে লুকিয়ে রাত জেগে অন্নদাশঙ্করের "তারুণ্য" প্রবন্ধ গ্রন্থটি পড়ি। মনে হয় আমি যা কিছু অনুভব করি, বলতে চাই, এই বইতে আশ্চর্য স্পষ্টতায় এবং দীপ্তিতে তা লেখা হয়েছে। সেই যে ভাবুক অন্নদাশঙ্করের আমি অনুরাগী হয়ে পড়ি আমাদের উভয়েরই নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও আজ ষাট বছর পরেও সেই অনুরাগ কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি।

কী ছিল তারুণ্যের প্রবন্ধগুলিতে যা সেদিন এই কিশোর পাঠককে উদ্দীপিত করেছিল, এবং এখনও যাকে আমি আদৌ অপ্রাসঙ্গিক অথবা তাৎপর্যরিক্ত মনে করি না? জরার বিরুদ্ধে যৌবন, মোহমুদ্গরের বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির জয়গান, ভোগবৃত্ত নিষেধনীতির বিরুদ্ধে নিত্যপ্রবহমান মুক্তির আহ্বান—অল্প কিছুকাল পরে কলেজে পড়বার সময় এরই বার্তাই তো শুনব বিদ্রোহী শেলি এবং অভিযাত্রী হুইটম্যানের কবিতায়, মানবাধিকারের প্রবক্তা টমাস পেইন-এর প্রবন্ধে, রল্যাঁ-হামসুন-বইয়্যারের উপন্যাসে। সম্প্রতিকালে তসলিমা নাসরিনের লেখায় এই বহ্নিশিখা দীপ্যমান দেখেই না তাঁকে বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও পরমাত্মীয় বলে চিনেছি। আমাদের এই পরম্পরাগ্রস্ত, বার্ধক্য-উপাসক সমাজসংস্কৃতিতে আজও যৌবনের অনুকূল আবহাওয়া গড়ে ওঠে নি। তারুণ্যের দ্বিতীয় সংস্করণ হতে লেগেছে বিশ বছর, তৃতীয় মুদ্রণ ('প্রবন্ধসমগ্র'—প্রথম খণ্ডে) হল চুয়াল্লিশ বছর পরে। অথচ 'তারুণ্য' যার ইস্তাহার বা ঘোষণাপত্র সেই অনির্বাণ উৎকাঙ্ক্ষা এবং কায়েমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার প্রবল প্রকাশ দেখলাম এই শতকের ষাট-সত্তর-এর

দশকে— বর্লিন থেকে বার্লিন, পারি থেকে জাকার্তা, মেক্সিকো থেকে ঢাকায়। প্রাচীনদের আগলে রাখা অচলায়তনে ওলটপালট ঘটায় যুবশক্তি—তা না হলে ইতিহাস পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হত।

তারুণ্যের প্রবন্ধগুলিতে কী সব বৈপ্লবিক কথা ঘোষিত হয়েছিল? "মৃত্যুর চেয়ে জরা ভীষণ"। "বৃদ্ধ হচ্ছে ভূতের চেয়ে ভয়াবহ"। চাই "প্রাচুর্যান্বিত বৈচিত্র্যান্বিত সাহসান্বিত জীবন, যার অপর নাম যৌবন"। "আমাদের (ভারতবর্ষের) দেড় সহস্র বৎসরের ইতিহাস কেবল আত্মরক্ষার ইতিহাস।...গ্রহণহীন বর্জন, ভোগহীন ত্যাগ, আনন্দহীন কৃচ্ছ্রসাধনা—এই হয়েছে আমাদের আত্মহিংসার আদর্শ"। "সৃষ্টির পুষ্পিত ঐশ্বর্যের জন্যে চাই মজ্জাগত স্বাধীনতা-রস, প্রতিভার স্বাধীনতা, প্রেমের স্বাধীনতা। প্রতিভা ও প্রেমকে আমাদের জরা-নিয়মান সমাজ নখদন্তহীন জরদ্গব বানিয়ে নিজেই ঠকে গেছে, সেই জন্য সে সমাজ এমন নিরানন্দ, এমন অচরিতার্থ, এমন বন্ধ্যা"। "প্রেমকে যারা জীবন থেকে বাদ দিয়েছে তাদের যেমন সন্ন্যাস তেমনই গার্হস্থ্য—এক ভস্ম আর ছার। কোনোটাই সৃষ্টিক্ষম নয়।... যার প্রেম যত স্বতঃস্ফূর্ত, যত প্রবল, যত গভীর, তার চরিত্র তত ঐশ্বর্যময়, মাধুর্যময়। নাই-বা হলো সে যতি, নাই-বা হলো সে সতী। মানুষ বহুবার বহুজনকে ভালবেসে শত রূপ উপলব্ধির দ্বারা শতদলের মতো ফুটবে। তার দেহ সে কাকে দেবে তার মন সে কাকে দেবে, সে-ই তা একবার নয় দু'বার নয়, শতবার স্থির করবে"।

এসব কথা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তো বটেই, আজ বিশ শতকের শেষ দশকেও অন্তত আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ার উপমহাদেশে এসব কথা এখনো স্পষ্টতই বৈপ্লবিক। অথচ এই ধরনের ঘোষণা শোনা গিয়েছিল এখন থেকে দুশো বছরেরও বেশি আগে ইয়োরোপে ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে এবং বিপ্লবের কালে। টমাস পেইন-এর উল্লেখ করেছি; ১৭৯২ সালে প্রকাশিত হয় মেরি ওয়লস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌-এর বিখ্যাত বীজগ্রন্থ 'এ ভিনডিকেশান অব্‌ দ্য রাইট্‌স অব্‌ উম্যান'। নারীর সাম্যের সংগত এবং বৈপ্লবিক দাবি তো তিনি করেছিলেনই, উপরন্তু তাঁর মূল প্রস্তাব ছিল স্বাধীনতা, প্রেম, মুক্তবুদ্ধি, অমিতসাহসী যৌবনের প্রবল প্রবাহে স্ফীতকায়, জড়ীভূত, কাল-বিরুদ্ধ, অভ্যাসাশ্রয়ী কায়েমি প্রাচীন ব্যবস্থার নিমজ্জন ও বিলোপ। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে এই কলকাতা শহরে যুবক ডিরোজিয়ো-র তরুণ ছাত্ররাও এইভাবে প্রাচীন অচলায়তনের দেয়াল ভেঙে প্রাণ, মুক্তবুদ্ধি এবং যুবশক্তির প্রবাহ বইয়ে দিতে চেয়েছিল। আমাদের রক্ষণশীল সমাজ সেদিন তাদের প্রয়াস রুদ্ধ করে দেয়, আজ অনেক দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মাতব্বরদের সেই অপচেষ্টা চলেছে।

অন্নদাশঙ্কর 'তারুণ্য' লেখার সময়ে নিশ্চয়ই জানতেন না, আমি বেশি বয়সেই পড়ি যে অন্নদাশঙ্করের গুরুস্থানীয় প্রমথ চৌধুরী যখন 'সবুজপত্র' প্রকাশ করেন তার প্রায় সমকালেই মহাচীনে নব্যভাবনার প্রধান ভাবুক চেন তু-শিউ (Ch'en Tu-hsiu ১৮৭৯-১৯৪২) শাংহাই শহরে প্রতিষ্ঠা এবং প্রকাশ করেন তাঁর পরিখ্যাত পত্রিকা চিং নিয়েন (Ch'ing Nien) বা যৌবন। চেন পড়াশুনো করেছিলেন জাপানে এবং ফ্রান্সে ; পত্রিকাটি বেরোয় ১৯১৫ সালে, পরে নাম ঈষৎ পালটে হয় নব যৌবন (সেপ্টেম্বর, ১৯১৬), চীনা নামের নীচে ফরাসিতে লেখা থাকে La Jeunesse। চেন সূচনা থেকেই প্রবলভাবে আক্রমণ করেন কনফুসীয় ঐতিহ্য এবং তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত চীনের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে। উদ্‌বংশীয় পূজার (ancestor-worship) উচ্ছেদ না ঘটা পর্যন্ত চীনের বর্তমান যেমন অন্ধকার, ভবিষ্যৎ তেমনই শূন্যগর্ভ, লিখেছিলেন চেন। কনফুসীয় রীতিনীতি, আচার আচরণ, পরিবার ও সমাজের কাঠামো ভেঙে ফেলে, বৃদ্ধ পিতামহদের নিয়মনিষেধ মুছে দিয়ে সেখানে আনতে হবে স্বাধীনতার আকুতি, বিজ্ঞানীর কৌতূহল, সাম্যের আদর্শ, গণতান্ত্রিক জীবনচর্যা। এই বিপ্লব ঘটাতে পারে যৌবন, অন্তত চেন-এর তাই মনে হয়েছিল। ১৯১৭ সালে চেন ছিলেন পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যবিভাগের অধ্যাপক এবং ডিন (Dean)। ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন : "আমার কথা কি তোমরা বুঝবে ? যাদের আমি দেখছি তাদের দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন বয়সে তরুণ, কিন্তু মনে জরাগ্রস্ত। শরীরের এই দশা হলে বুঝতে হবে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। সমাজের এই দশায় সমাজে পচন ধরে।...যদি চীনকে বাঁচাতে হয় তাহলে চাই যুবশক্তি, যৌবনই সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে"। চেন পরে মার্ক্সের চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ১৯২৯ সালে মস্কোর নির্দেশে তাঁকে পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয় ; তারপর পাঁচ বছর কাটে কুয়োমিনটাং-এর কারাগারে। শেষ জীবনে তিনি বোঝেন স্টালিন আর হিটলার, বলশেভিজম আর ফাসিজম একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, অন্ধকার যুগের ধর্মীয় জুলুমতন্ত্রের তারা নব্য সংস্করণ। মাও-ৎসে তুঙের চেলারা সম্ভবত চেন-এর নাম-ও শোনেন নি, তাঁর বই পড়াতো দূরের কথা।

অন্নদাশঙ্কর মার্ক্সের দ্বারা প্রভাবিত হন নি, কিন্তু চেনের মতো তিনিও একজন র‍্যাডিক্যাল, এবং তাঁর এই র‍্যাডিক্যাল প্রতিন্যাস যেমন স্পষ্ট 'তারুণ্য' (১৯২৮) এবং 'আমরা' (১৯৩৭) প্রবন্ধসংকলন দুটিতে তেমনি দ্যুতিমান তাঁর দীর্ঘ কাহিনী 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩) এবং গল্প-সংকলন 'প্রকৃতির পরিহাস'-এ (১৯৩৪)। আমার মনে পড়ে আঠারো

শঙ্করের র‍্যাডিক্যাল ভাবুক-শিল্পী ভলতেয়ার এবং বিদরোকে। বাঙালি শিক্ষিত নব্য সমাজও যে কতটা স্থবির, প্রাচীনতা যে সে সমাজকেও কতটা জরাগ্রস্ত করে রেখেছে, তীক্ষ্ণ সকৌতুক ব্যঙ্গে তা উদ্ঘাটিত হয় এই বই দুটিতে। বিলেত ফেরত কল্যাণ সোম পাত্রীর খোঁজে বেরিয়ে আবিষ্কার করে আমাদের জরদ্গব সমাজ কী ভাবে এদেশে শিক্ষিত মেয়েদেরও পুতুল বানিয়ে রেখেছে। নিশ্চল প্রতিমার মতো শিবানী, বীণাবাদিনী সুলক্ষণা, ইংরেজিতে অনার্স অমিয়া, ব্যারিস্টারের বোন প্রতিমা, জেলখেটে আসা 'গান্ধীমায়ী' মায়া মল্লিক—এদের প্রত্যেকের কাছেই স্ত্রীপুরুষের শারীর সম্পর্কের ব্যাপারটা অনুচ্চার্য, অশ্লীল, ধর্মরক্ষার্থে করণীয় হতে পারে কিন্তু কদাচ কহনীয় নয়। তবে অন্নদাশঙ্করের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের উদ্দিষ্ট এই মেয়েরা ততটা নয় যতটা তাদের অভিভাবকগোষ্ঠী—তাদের মানসিক আকিঞ্চন, ভণ্ডামি, সন্দিগ্ধতা, বার্ধক্য এই কন্যাদের মানুষ হতে দেয় নি। মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা আরও ভীরু, আরও মূঢ়, আরও সত্তাবিহীন। কবিযশঃ প্রার্থী কাপুরুষ প্রেমিক স্মরজিৎ আর তার বলীবর্দপ্রতিম অপরূপ পিতা কানাই বাচস্পতি, বিলেতফেরত ব্যাচলার বোস সাহেব যার সংকুচিত প্রত্যাখ্যানে 'জ্বলে ওঠা' সার্থকনাম্নী যুবতী সুবর্ণ পেশওয়ারি ফলওয়ালার ঘরণি হয়ে বাঁচে, সচ্চরিত্র ট্রিপল এম. এ. নবনীমোহন কোনো অছিলায় মেয়েদের বস্ত্রাবৃত স্তন স্পর্শ করেই যে চরিতার্থ, জন্মনিরোধে অকৃতকাম হয়ে পণ্ডিচেরীতে পলাতক বনোয়ারীলাল, পরকীয়ার ছিঁচকেনবিশ অধ্যাপক নির্মল আর হেনরিয়েটা রোডের ধূর্ত লম্পট সরীসৃপ শিকদার—কার্টুনের পর কার্টুন বাঙালি ভদ্রসন্তানদের আত্মপ্রতারণার যত্নার্জিত নিপুণতাকে উদ্ঘাটিত করে।

তাঁর র‍্যাডিক্যাল ভাবনাকে সংগত রূপ দেবার জন্য বেগানা ভলতেয়ারকে নিজস্ব গদ্যরীতি গড়ে তুলতে হয়েছিল। অন্নদাশঙ্করের গদ্যরীতিও একান্ত-ভাবে তাঁর নিজস্ব। প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুকরণ করেন নি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থেই তাঁর নিজস্ব রীতি আকার পায় ; দীর্ঘ দিনের সাধনায় তার বহমানতা এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে বই কমে নি। চব্বিশ বছর বয়সে যিনি লিখেছিলেন, "প্রকৃতিরই ষোড়শী হবার অধিকার আছে, আমাদের ঠাকুমার নেই", আশিতে পৌঁছে তিনিই লিখতে পারেন, "পুরনো বোতলে নতুন মদ থেকেই আমাদের রেনেসাঁস" ('সংস্কৃতির বিবর্তন', ১৯৮৩)। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় এই রীতির বৈশিষ্ট্য তার বাক্যবিন্যাসেই নিহিত—যে বিন্যাসে প্রতিটি উপবাক্য বা অবয়ব পরস্পরের পূরক হয়েও স্বতন্ত্র, এবং যে বিন্যাসের প্রায় জ্যামিতিক প্রতিসাম্যে বাক্যাবলি নির্মেদ, সুতনু ও দ্রুতগামী। কিন্তু এ রীতি আসলে এক বিশেষ

ধরনের মনের রচনা, যে ধরনের মন এই রীতিতেই আপনাকে উন্মোচিত করতে পারে, যে ধরনের মন না থাকলে এ রীতি অর্জুনের গাণ্ডীবের মতোই অপরের অব্যবহার্য। ভাষার টানটান ধনুকে জ্যা রোপণ করে ভাবনার অব্যর্থ শরনিক্ষেপে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম এই মন বিদগ্ধ এবং সুবেদী, সুরসিক এবং বিশ্লেষনিপুণ, বিবেকী এবং সহৃদয়, সাহসী এবং সতর্ক। তাঁর বিচারবুদ্ধি উন্মুক্ত, সদাজাগ্রত এবং ক্ষিপ্র। তাই তিনি লিখতে পারেন, "গত এক শতাব্দীতে আমাদের মধ্যে যত অবতার ভূমিষ্ঠ বা ভুঁইফোড় হয়েছেন, তার আগের তিন হাজার বছরে ততটা নয়" (আমরা, ১৯৩৭)। "আধুনিকতা প্রাচ্যও নয়, পাশ্চাত্যও নয়। আমাদের দেশ মধ্যযুগে এক পা রেখে আধুনিক যুগে আরেক পা রেখে দুই নৌকার দোটানায় সামলাতে পারে না, এই অপরূপ সার্কাস তার পক্ষে প্রাণান্তকর"। "ভারতবর্ষের আদিম ব্যাধি হচ্ছে অস্পৃশ্যতা।...তিন চার হাজার বছরের অপমান যাদের মনের পরতে পরতে জমেছে সেই অস্পৃশ্য ইতর ঘৃণিত জাতেরা যখন জাগবে তখন তারা কিষাণ মজদুর এই স্তোকবাক্যে ভুলবে না। যেমন মুসলমানেরা ভুলছে না স্বাজাত্যের স্তোকবাক্যে। পরাধীনতার জ্বালার চেয়ে শোষণের জ্বালার চেয়ে দারুণ—অপমানের জ্বালা" (আমরা)। মুক্তবুদ্ধি, সত্যসন্ধ, বিবেকী এবং সাহসী না হলে এসব কথা কে শোনাতে পারে? 'তারুণ্য', 'আমরা', 'পুতুল নিয়ে খেলা', 'প্রকৃতির পরিহাস'-এ যাঁকে পাই তিনি একজন খাঁটি র‍্যাডিক্যাল ভাবুক এবং এলেমদার গদ্যশিল্পী।

দুই

যদিও কিশোর বয়স থেকেই আমি তাঁর রচনার অনুরাগী, অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় এবং সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে পঞ্চাশের দশকের সূচনায়। ওই সময়ে আমাকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন (১১/৩/৫২) তিনি নিজেকে বীরবলের শিষ্য বলেন বটে, কিন্তু তিনি চণ্ডীদাসের উত্তরসাধক। তিনি যে শুধু র‍্যাডিক্যাল নন, তাঁর মনে যে অন্য স্রোতও বহমান এ কথা আমি আগেই বুঝতে পারি 'সত্যাসত্য' এপিক-উপন্যাস (১৯৩২-৪২) পড়ে। বাংলাসাহিত্যে এই ধরনের মননশীল মহাকায় উপন্যাস আর কেউ লিখেছেন বলে জানি না—বিশাল পটভূমি, অসংখ্য চরিত্র, বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ, অফুরন্ত আলোচনা। এটির মডেল খুঁজতে গেলে যেতে হয় আঠারো এবং উনিশ শতকের কোনো কোনো মহৎ উপন্যাসের কাছে—আমার বিশেষ করে স্মরণে আসে গোয়েটের "হিভলহেলম মাইস্টারে"র কথা। অন্নদাশঙ্করের যুক্তিধর্মী, বিশ্লেষী, নিরতজিজ্ঞাসু, স্বদেশে পরবাসী,

আধুনিক পশ্চিমের পক্ষপাতী মনের চরম রূপ বাদল; অপরপক্ষে তার সোদরোপম বন্ধু কিন্তু বিপরীত মেরুর মানুষ সুধী প্রজ্ঞায় সুপ্রতিষ্ঠ, তার মার্গ বুদ্ধির নয় বোধির, বিচারবিশ্লেষণের চাইতে উপলব্ধিতেই তার আস্থা। অন্নদাশঙ্করের পরবর্তীকালের লেখায় চৈতন্যের এই ডায়ালেকটিক ক্রমেই স্পষ্টতর হয়েছে।

তবে 'সত্যাসত্যে' প্রাণসঞ্চার করেছে বাদল বা সুধী নয়—তারা শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে অনেকটাই বিমূর্ত—করেছে উজ্জয়িনী যে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এই উপন্যাসে বিকশিত হয়ে ওঠে সংসার-অনভিজ্ঞা কিশোরী থেকে আত্মোন্মোচিতা যুবতীতে। উজ্জয়িনী চেয়েছিল ভালোবাসতে, ভালোবাসার ভিতর দিয়ে সংসারের সঙ্গে যুক্ত হতে। তার সেই চাওয়ার এবং খোঁজার কাহিনী সব চাইতে গভীর, বিস্ময়কর, সাহসী, সতেজ, সরস—জীবনের বাঁকে বাঁকে নানা সম্ভাবনা সে আবিষ্কার করে, তত্ত্বকে রূপ দিতে যায় জীবনে, ভুল করে, দাম দেয়,—তার অয়স্কর্ষণীর উৎস তার সজীবতা। অন্নদাশঙ্কর প্রেমকে তাঁর জীবনচর্যায় বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। প্রেম উজ্জয়িনীর অনুসন্ধান এবং বিবিধ অ্যাডভেঞ্চারের কেন্দ্রে, কিন্তু সেই অনুসন্ধানের ভিতর দিয়েই উজ্জয়িনী উপলব্ধি করে স্বাধীনতারিক্ত প্রেম সত্যকারের প্রেম নয়। সে বলে, "স্বতঃস্ফূর্তিই আমার জীবনের আলো"। বাদলকে সে ভালোবাসতে চেয়েছিল কিন্তু তার বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদ অথবা শেষের দিকে তার আত্মবিলোপী সমাজব্রত উজ্জয়িনীকে টানে নি। কানুর প্রেমে ঘর ছাড়বার পর এই অনভিজ্ঞাকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল লাম্পট্যের সঙ্গে। দে সরকারের সঙ্গে চুম্বন বিনিময় তার যৌনবোধ জাগিয়ে তোলে, কিন্তু সে বুঝতে পারে দে সরকার তার ভালোবাসার যোগ্য পুরুষ নয়। কুলটা-কলঙ্ককে অগ্রাহ্য করে সে সুধীকে ডেকেছিল সঙ্গী হতে, কিন্তু সুধীর প্রজ্ঞা তাকে (সুধীকে) দেশজ সংস্কার এবং ঐতিহ্যলালিত নীতির বন্ধন থেকে মুক্ত করে নি। বিবাহ সুধীর কাছে সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রাচীন পুরুষ-কেন্দ্রিক অনুদার অর্থেই সে সতীত্বকে বিশেষ মূল্য দেয়। "ম্যারেজ না মর্টগেজ?", "ভালোবাসা কখনো পাপ হতে পারে না", "সব আগে স্বাধীনতা", "এখন বুঝেছি স্বাধীনতাই সংসারের সেরা সুখ"—উজ্জয়িনীর এসব প্রশ্ন এবং উপলব্ধি সুধীকে পীড়িত করে। উজ্জয়িনী তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে জীবনের সমঝোতা করার পথেই নিজের ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে, কিন্তু তার প্রেম যোগ্য সাথীর সঙ্গে মিলনে পরিপূর্ণতা পায় নি। বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞার, ভালোবাসা এবং স্বাধীনতার টানাপোড়েনেই এই মহাকাহিনীর বুনট, কিন্তু কোনো ব্যক্তির জীবনে অথবা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের ভিতরে তার সংগতি অনর্জিত। 'সত্যাসত্য' 'গোরা'র মতো কোনো আত্মিক সমাধানে

শেষ হয় নি ; আমরা অনুমান করতে পারি উজ্জয়িনীর আত্মজিজ্ঞাসা তাকে আরও অনেক পথ নিয়ে যাবে।

মনে হয় 'সত্যাসত্য' লেখার শেষ দিকে অন্নদাশঙ্করের মনেও আত্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি থেকে আমরা জানি অল্পবয়স থেকেই তাঁর (বঙ্কিমের) মন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করে যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী, এবং তাঁর সারা জীবন এই উত্তর অনুসন্ধানে কেটে যায়। অন্নদাশঙ্কর যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি সাহিত্যিক ছাড়া আর কিছু নন, তখন প্রথমেই দুটি প্রশ্ন তাঁকে পীড়া দিতে থাকে। কীসের জন্যে সাহিত্য ? কাদের জন্যে সাহিত্য ? এরই মোকাবিলা করার জন্য কল্পনা করলেন বিনু নামে এক চরিত্র যাকে আমরা সম্ভবত ১৯৪০-৪১ সালে প্রথম দেখি 'জীবনশিল্পী' (১৯৪১) সংকলনে। পরে ১৯৪৪ সালে বেরোয় 'বিনুর বই'। প্রমথ চৌধুরী এবং চণ্ডীদাস ছাড়াও তরুণ বয়সে তাঁর চেতনায় অন্য দিশারিরাও দেখা দিয়েছিলেন তা আমরা জানি 'জীবনশিল্পী' এবং 'ইশারা' সংকলনের (১৯৪২) আলোচনাগুলি থেকে। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, গোয়েটে অল্পস্বল্প, টলস্টয় একজন প্রধান দিশারি, এবং রম্যাঁ রলাঁ। এখানে উল্লেখ করা সংগত মনে করি যে পশ্চিমের যে তিনজন ভাবুক তরুণ বয়সে আমাকে এবং আমার প্রজন্মের আরও কিছু চিন্তাশীল তরুণকে প্রভাবিত করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর সেই মার্ক্স, ফ্রয়েড এবং রাসেলের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নি। তাঁর পরিণত চিন্তার সঙ্গে যেখানে আমার চিন্তার কিছুটা ফারাক তার একটা সূত্র সম্ভবত এখানে মেলে।

যদিও অন্নদাশঙ্কর আমাদের জানিয়ে রেখেছেন যে "বিনু কিন্তু সব সময়ে আমি নই", তা সত্ত্বেও তাঁর এ তাবৎ প্রকাশিত রচনাবলি পড়ে আমার ধারণা যে চল্লিশ বছর বয়সে বিনুর মারফত তিনি পাঠকদের কাছে যে জবানবন্দি পেশ করেছিলেন তার ভিতরেই তাঁর সারা জীবনের সন্ধান এবং চর্যার একটা নির্ভরযোগ্য ভূমিকা পাওয়া যায়। তিনি স্রেফ কাহিনীকার নন, শুধু নিজস্ব বিশিষ্ট গদ্যরীতির নিপুণ শিল্পী নন, তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম-এ অতৃপ্ত, তাঁর অভীপ্সা বহুমুখী, এবং যা যা তাঁর বাঞ্ছিত তারা শুধু পরস্পর থেকে পৃথক নয়, অনেক সময়ে স্পষ্টতই পরস্পরের প্রতিযোগী, এমনকি হয়তো বিপরীত, কিন্তু তাদের মিলন সাধনই তাঁর অনুধ্যান। বিনু সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়ে দেশ উদ্ধার করতে চেয়েছিল, হল সাহিত্যিক সোনার তরীতে সোনার ধান না থাকলে যার কাছে সাহিত্যসাধনা পণ্ডশ্রম। কিন্তু বিনু তো জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বা বিভূতিভূষণ নয়। অন্নদাশঙ্কর শুধু কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা সাহিত্য বা প্রকৃতি নিয়ে লেখেন নি, তাঁর কালের এবং সমাজের যখনই যা উল্লেখ্য ঘটনা ঘটেছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন,

সম্পাদকীয় বা নিয়মিত কোনো কলাম না লিখলেও রাজনীতি এবং সমাজনীতি নিয়ে বিস্তর ভেবেছেন এবং লিখেছেন। এদিক থেকে আঠারো শতকের র‍্যাডিক্যাল কাহিনীকার-ভাবুকদের সঙ্গে যেমন তাঁর আত্মীয়তা, তেমনই সহধর্মিতা আমাদের যুগের জাঁ-পল সার্ত্র্-এর মতো ভিন্ন পথের ভাবুকদের সঙ্গে।

বাংলা কথাসাহিত্যের একটা মডেল তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—যাঁরা কাহিনী লেখেন তাঁরাও উৎকৃষ্ট চিন্তাবিদ্ হতে পারেন, আবার প্রয়োজনমতো দেশের এবং সমকালের নানা তাৎক্ষণিক তর্কবিতর্ককে তাঁদের ভাবুকতার বিচ্ছুরণে আলোকিত এবং রঞ্জিত করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ এই মডেলকে আরো সমৃদ্ধ করেছিলেন; অন্নদাশঙ্কর এদিক থেকে তাঁদেরই বলিষ্ঠ উত্তরসাধক। তাঁদের প্রবন্ধ, এমনকি সাময়িক ঘটনা নিয়ে মনস্বী আলোচনা তাঁদের সাহিত্যকর্মের বেশ বড়ো অংশ। এ কথা ঠিক যে তাঁদের সবই সোনার তরীতে সোনার ধান এমন বলা চলে না; বরং তাৎক্ষণিকে এবং তত্ত্ববিচারে তাঁদের আগ্রহ হয়তো তাঁদের উপন্যাসের কখনো কখনো কিছুটা ক্ষতিই করেছে। তবু লক্ষ না করে উপায় নেই এখন যাঁরা বাংলায় জনপ্রিয় কাহিনীকার তাঁরা প্রায় সকলেই চিন্তনবিমুখ, তত্ত্ববিচারে এবং তাৎক্ষণিকের বিশ্লেষণে এবং মূল্যায়নে তাঁরা অপারগ, এবং বাংলা কথাসাহিত্য যে অনেকটাই ফরমুলা অনুসারী বিনোদন সাহিত্যে পর্যবসিত হয়েছে কথাকারদের বৌদ্ধিক আকিঞ্চন তার একটি মুখ্য কারণ।

সাহিত্যিক না সাংবাদিকের চাইতে বড় সমস্যা 'লিখব না বাঁচব', এবং সাহিত্যকে কি জীবিকা করব? বাঁচতে গেলে পথে বেরিয়ে পড়তে হয়, 'সকলের সঙ্গে সব কিছু হতে হয়'। কিন্তু লেখার জন্য চাই নিভৃতি, অবসর, কিছুটা মুরেদ, এবং একাগ্র চর্চা। এই সমস্যা রবীন্দ্রনাথকে কষ্ট দিয়েছিল, টলস্টয়ের জীবনে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, কিন্তু অন্নদাশঙ্কর এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হলেও আর্তবোধ করেন নি। বিনু চেয়েছিল হতে 'চাষীর সঙ্গে চাষী, মাঝির সঙ্গে মাঝি, কাঠুরের সঙ্গে কাঠুরে, বাউলের সঙ্গে বাউল। এদের মধ্যে চাষীর ওপরেই তার পক্ষপাত টলস্টয়ের প্রভাবে'। কিন্তু চাষী উদয়াস্ত খাটে, কখন সে আয়ত্ত করবে লেখকের কুশলতা, জমি এবং সংসারের দাবি মিটিয়ে কোথায় তার লেখার অবসর? অপর পক্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহুরে লেখক কী করে চাষীর সঙ্গে চাষী, মাঝির সঙ্গে মাঝি হবে? সমাজবিদ্যায় যাকে উল্লম্ব সচলতা বা vertical mobility বলা হয়, যার ফলে সমাজে উপর নীচে ওঠা-পড়া অপেক্ষাকৃত সহজ, যন্ত্রবিপ্লবের ফলে পশ্চিমে বিশেষ করে মার্কিন দেশে যা ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে, যার সুযোগে সেখানে বেশ কিছু সাহিত্যিক সমাজের নীচতলা থেকে উঠে শৈল্পিক সামর্থ্যে ওপরতলায় পূর্ণ স্বীকৃতি

পেয়েছেন, সেই উদ্দাম সামাজিক সচলতা আমাদের জাতপাত নিয়ন্ত্রিত সমাজে এখনো অকল্পনীয়। আমার যৌবনকালে বছর দুই অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে কিছুকাল গ্রামে চাষীদের মধ্যে কিছুকাল বস্তিতে-কারখানায় শ্রমিকসংগঠনের কাজ করে দেখেছি, মনের দিক থেকে চাষী মজুরদের সঙ্গে আমার ব্যবধান দুরতিক্রম্য, ফিরে এসেছি যা আমার সাধ্য সেই শিক্ষকতা এবং সাহিত্যচর্চার জীবনে। অন্নদাশঙ্কর সকলের সঙ্গে সব কিছু হবার সাধ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা যে তাঁরও সাধ্যাতীত তাঁর সারা জীবনের মহৎ সাহিত্যকীর্তিই তার প্রমাণ। তাঁর কাহিনীতে চাষী মজুর, নীচের তলার স্ত্রীপুরুষ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি। বিমূর্ত চিন্তাকে বশে আনেন তীক্ষ্ণধী প্রবন্ধকার; কিন্তু গল্পে-উপন্যাসে ধরতে হয় ব্যক্তিকে, আর তার জন্য লাগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনেকটা একাত্মতা। অন্নদাশঙ্করের কাছে মনুষ্যত্বের আইডিয়া খুবই স্পষ্ট—যে মনুষ্যত্ব স্বাধীনতায়, সৃষ্টিতে, প্রেমে বিকশিত হয়। সেই মনুষ্যত্বের তিনি সাধক, তাঁর প্রবন্ধে এবং কাহিনীতে তার কথা আমরা শুনি। কিন্তু সেটি আইডিয়া যা নিয়ে ভাবা যায়, যাকে অনুভব করা যায়, লেখার ভিতর দিয়ে যার কথা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু সংসারে তার যে বিচিত্র রূপ নিজের জীবনে বাঁচার ভিতর দিয়ে তার পরিপূর্ণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা করতে গেলে এক জীবনে কেন অনেক জীবনেও কুলোয় না, তার চাইতেও সংকটের কথা তার জন্য লেখার বদলে বাঁচাকেই বেছে নিতে হয়। অন্নদাশঙ্করের সাধ যাই হোক, লেখাকেই তিনি বেছেছেন। সেটাই শিল্পীর পক্ষে সংগত। কিন্তু জীবনের অনেকটাই যে তার ফলে ফ্রেমের বাইরে থেকে যায়, এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন, "ঠিকমতো বাঁচতে পারাটাই একটা আর্ট"। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বলেছেন জীবনশিল্পী। এ সবই স্বীকার্য, শুধু সংশয় থাকে জীবনকে শিল্প করতে গেলে বুঝিবা জীবনের বেশ খানিকটা বাদ দিয়েই চলতে হয়।

তিন

"কিসের জন্য সাহিত্য?" অনেকদিনের পুরোনো এই প্রশ্নের উত্তরে বিনু বলে, "সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্য"। লেখার ভিতর দিয়ে লেখক আত্মসমর্পণ করেন, রূপ সৃষ্টি করেন, অমৃতের পিপাসা মেটান। "কাদের জন্য সাহিত্য?" "যারা ভালবাসে এবং ভালবাসবে তাদের জন্যে। যারা রস পায় এবং পাবে তাদের জন্যে"। এদিকে অন্নদাশঙ্কর চান সর্বসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হতে। জনসাধারণ কোনো কোনো রসের রসিক, কিন্তু যে রস শিল্পের প্রাণভাণ্ডার করে তার রসিক হতে হলে অনেক সময়ে বিশেষ শিক্ষা, অনুশীলন, রসবোধ লাগে। রামায়ণ মহাভারত নিয়ে না হয় সমস্যা নেই, কিন্তু

কালিদাসের কাব্য, গোয়েটের ফাউস্ট, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌-এর উপন্যাস? জনসাধারণের সে অনুশীলন নেই, অল্প লোকেরই আছে। তবে কি সৎ সাহিত্যিক নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর কথা স্মরণে রেখে অপেক্ষা করবেন? তাঁর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে ৫/১১/৫২ তারিখের একটি চিঠিতে অন্নদাশঙ্কর আমাকে লেখেন, "আমি বরাবর ভেবেছি—বলেছিও—যে আমি people-এর অভিমুখে half way যাব। People আমার অভিমুখে half way আসবে। আমিই ষোলো আনা পথ তাদের দিকে যাব আর তারা যেখানে আছে সেখানে বসে থাকবে কিংবা তারাই ষোলো আনা পথ আমার দিকে আসবে আর আমি যেখানে আছি সেখানেই বসে থাকব—এ ধরনের কথা কোনোদিন আমি স্বীকার করি নি, করব না। টলস্টয়ের সঙ্গে এইখানে আমার মতভেদ, বিপরীত অর্থে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে এই নিয়ে আমার পথভেদ"। অর্থাৎ তিনি না পপুলিস্ট না এলিটিস্ট। মধ্যপথে মিলন তাঁর কাম্য, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা অনায়ত্ত। আজ তিনি বাংলা ভাষায় সব চাইতে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক—তাঁর বিবেকী চারিত্র এবং অসামান্য সাহিত্যকৃতিকে এদেশের শিক্ষিতসমাজ অকুণ্ঠিত চিত্তে সংবর্ধন করেছে—কিন্তু আজও তাঁর পাঠকপাঠিকা খুব সীমাবদ্ধ। যদিও তাঁর প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা শতাধিক, তবু শুধু রয়্যালটির উপার্জনে তাঁর সংসারনির্বাহ হত বলে মনে হয় না। এদেশে অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষ এখনো নিরক্ষর, এটা যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। বাঙালি শিক্ষিত পাঠকপাঠিকা শংকর-সুনীল-নীহারগুপ্ত পড়ে আরাম পায়, অন্নদাশঙ্কর, অমিয়ভূষণ বা ধূর্জটিপ্রসাদের বই-এর সংস্করণ হতে বিস্তর সময় লাগে। সত্যনিষ্ঠ লেখক আর অনুশীলনবিহীন সংখ্যাগুরু পাঠক-পাঠিকার ব্যবধানের সমস্যা রয়েই যায়। আর সেই সূত্রে আসে জীবিকার সমস্যা।

অন্নদাশঙ্করের জীবনের বড়ো অংশ কেটেছে খুবই দায়িত্বশীল নানা সরকারি উচ্চপদে (১৯২৯-১৯৫১)। বিশেষ যোগ্যতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চপদের দায়িত্ব পালন করে সেই সময়েই তিনি লিখেছেন 'তারুণ্য' থেকে 'প্রত্যয়' আটটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ, 'আগুন নিয়ে খেলা' থেকে 'না' পর্যন্ত দশটি উপন্যাস ('সত্যাসত্যে'র ছখণ্ডকে ছটি বই হিসেবে ধরে), 'প্রকৃতির পরিহাস' থেকে 'যৌবন জ্বালা' পাঁচটি গল্প-গ্রন্থ, 'রাখী' থেকে 'নূতনা রাধা' পাঁচটি কবিতার বই, তা ছাড়া ভ্রমণকাহিনী, দুটি ছড়ার বই, কিছু কিশোর সাহিত্য। জীবিকার জন্য প্রচুর শ্রম, মেধা এবং সময় ব্যয় করবার পরও তাঁর এই অশিথিল, অনবচ্ছিন্ন সৃজনপ্রবাহ প্রায় অতুলনীয় মনে হয়। তিনি উল্লেখ না করলেও এক্ষেত্রে সম্ভবত তাঁর মডেল বঙ্কিম। কিন্তু বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী কেউই জীবিকা হিসেবে সাহিত্যকর্মকে গ্রহণ করেন নি। জীবিকার দাবি আর

সাহিত্যসাধনার দাবি দুই মেটাতে গিয়ে বঙ্কিমের অকালে মৃত্যু হয়। অন্নদাশঙ্কর এই ঝুঁকি সম্পর্কে ক্রমেই সজাগ হয়ে ওঠেন। ১৯৫১ সালে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তিনি অকালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন, তারপর গত ৪৩ বছর তিনি শুধু লেখার কাজেই ব্যাপৃত। বহু বিষয়ে লিখেছেন তিনি, যেমন বৈচিত্র্যে তেমনি পরিমাণে তাঁর রচনার প্রাচুর্য বিস্ময়কর, আরো বিস্ময় লাগে যখন দেখি তাঁর লেখার স্টাইল এখনো নূতন, নির্মেদ, তীক্ষ্ণ এবং দ্রুত, বিশিষ্টভাবেই অন্নদাশঙ্করী। কিন্তু শুধু লেখার উপার্জনে কি আজও তাঁর জীবিকা নির্বাহ হয়? শরৎচন্দ্রই সম্ভবত বাংলা ভাষায় এ শতকের প্রথম লেখক যিনি শুধু লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং সাংসারিক সচ্ছলতা অর্জন করেছেন। তার পরে কিছু কিছু বাঙালি কথাকার শরৎচন্দ্রের অনুসরণ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের কাহিনীতে যদিবা কথকতা আছে তাঁদের গদ্যে কোনো স্টাইল নেই, তাঁদের ভাবনা কল্পনায় মৌলিকতা নেই। তাঁরা সাময়িকভাবে জনপ্রিয়, এবং সাংসারিক হিসাবে সফলকাম, কিন্তু তার বেশি কিছু বলে ঠেকে না। বঙ্কিমের লেখা সোয়াশো বছর পরেও আমাদের জাগ্রতচিত্ত করে কারণ বঙ্কিম চিন্তায় এবং ভাষায় স্বয়ংসিদ্ধ স্টাইল অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেই 'আমরা'-ও তো এলিট। হয়তো লেখাকে জীবিকা করেও তার মান উঁচু রাখা সম্ভব যদি সমাজে বিদগ্ধ পাঠকপাঠিকার সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমাদের দেশে এটা এখনো বড় সমস্যা,—বাঙালি পাঠকপাঠিকারা যথেষ্ট সংখ্যায় অন্নদাশঙ্করের দিকে আধাপথ এগিয়েছেন বলে মালুম হয় না।

তিনি চেয়েছেন বুদ্ধির সঙ্গে বোধিকে মেলাতে, বিচার-বিশ্লেষণ এবং মরমিয়া মানসকে শিল্পে সন্নিহিত করতে, মনের বৈদগ্ধ্য আর হৃদয়ের বৈদগ্ধ্যের মধ্যে বিরোধ দূর করতে। তিনি দেশকে ভালোবাসেন, একই সঙ্গে যুগ-সচেতন এবং বিশ্বনাগরিক। লিখেছেন, "যুগ আমার জনক। দেশ আমার জননী" ('কণ্ঠস্বর', ১৯৫৬)। "দেশ যেমন প্রধান, কালও তেমনি প্রধান" ('সাহিত্যে সংকট', ১৯৫৫)। তাঁর বিচারে শুদ্ধতা শিল্পের অবম শর্ত, কিন্তু লেখক হিসেবে সমাজের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালনও তাঁর কাছে জরুরি। প্রথম দিকে ঐতিহ্যকে আক্রমণ করেছেন বটে, কিন্তু ক্রমশই তাঁর কাছে ঐতিহ্য এবং নবায়ন পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত বলেই প্রতিভাত হয়েছে। লিখেছেন, "ঐতিহ্য যদি আদৌ না থাকে তবে তার শূন্যতাও অপূরণীয়। ভারত যদি প্রাচীন না হয়ে অর্বাচীন হতো সেটাও কি আনন্দের বিষয় হতো? ··যে উত্তরাধিকার আমরা বিবর্তনসূত্রে লাভ করেছি তার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও তা অমূল্য" ('বাংলার রেনেসাঁস', ১৯৭৪)। তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী দুজনেরই অনুরাগী, যেখানে তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ, তাকে তিনি

অনেকটাই এড়িয়ে চলেন। বিচার-বিশ্লেষণ, সংশয়-সমালোচনাকে তিনি খুবই মূল্য দেন, কিন্তু কিনুর জবানবন্দিতে তিনি জানান, "আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, যে-বিশ্বাস আমাদের ছিল। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে বিধাতা এক-একটা দেশ সৃষ্টি করেছেন এক-একটা পরীক্ষার জন্যে। ভারতবর্ষেও তার পরীক্ষা চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। তাঁর এই পরীক্ষার নাম অহিংসা। আগে ছিল ব্যষ্টিগত, এখন সমষ্টিগত"। ('প্রত্যয়', ১৯৬২)। কেন বিধাতা এই পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষকেই বিশেষ করে বাছলেন? ইহুদিদের বিধাতা যেমন বিশেষ পরীক্ষার জন্য ইহুদিদের বেছেছিলেন? উত্তর মেলে না। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী আবার মানুষের আত্মরচনায় এবং ইতিহাস নির্মাণেও তাঁর আস্থা আছে। প্রেম তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পচর্চার কেন্দ্রে—কিন্তু একই সংগে তিনি চান পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা। তিনি অবশ্যই জানেন জীবনে দ্বন্দ্বের অভাব নেই, কিন্তু ভাবুক এবং জীবনশিল্পী রূপে তিনি চান ছন্দের প্রতিষ্ঠা। এ সব দিক থেকে তিনি একজন হিউম্যানিস্ট এবং রবীন্দ্রমার্গের বিশিষ্ট সাধক।

দেশের এবং কালের খুব কম দিকই আছে যা নিয়ে অন্নদাশংকর ভাবেন নি অথবা লেখেন নি—যে সব ঘটনা বা সমস্যা সমকালিক বা আপাতদৃষ্টিতে গরকায়েম তাদেরও তিনি তাত্ত্বিকতার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন—বিতর্কিত নানা বিষয় নিয়ে তাঁর ছোটোবড়ো প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, সেক্স, ডিক্টেটরশিপ, ভারতের স্বরাজ, ভারতের ঐক্য, হিংসা ও অহিংসা, দেশপ্রেম বনাম জাতিপ্রেম, হিন্দুত্ব, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষার লড়াই, রাষ্ট্র বনাম নেশন, বাংলাদেশ, পশ্চিমবংগ এবং ভারতের সম্পর্ক, সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, সাহিত্যে সংকট, শিক্ষার সংকট, সংহতির সংকট, প্রেম ও বন্ধুতা, জাতিবৈর. রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন—এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে আর কোন্ বাঙালি কথাকার এতাবৎ লিখেছেন? অর্থাৎ একদিকে তিনি জীবনের অনেকগুলি মূল সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন এবং ভাবছেন, আবার তার সংগে চারপাশে প্রত্যহ যা ঘটছে সেদিকে নজর রাখছেন এবং সে সব নিয়ে আলোচনা করছেন। নব্বই বছরেও তিনি জাগ্রতচিত্ত, তাঁর মনের ঔদার্য হ্রাস পায় নি, তাঁর কৌতূহল বহুমুখী, তাঁর যুক্তি সুসম্বন্ধ, তাঁর নিজস্ব স্টাইল অব্যাহত। তবে যে কৌতুকরস তাঁর প্রথম এবং মধ্য যুগের প্রবন্ধে এবং কাহিনীতে নিয়ত প্রবাহিত হত, শেষের দিকে তা শীর্ণ হয়েছে। 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাস চিন্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু 'সত্যাসত্য' বা 'রত্ন ও শ্রীমতী'র মতো চমৎকৃত করে না।

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে একটি চিঠিতে অন্নদাশঙ্কর আমাকে লিখেছিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার একটা অদৃশ্য affinity আছে বোধ হয়। অনেকগুলি fundamental বিষয়ে আমরা একই পথের পথিক" ('বিবেকী শিল্পী অন্নদা-শঙ্কর', পৃ. ২১৪, ১৯৮৫)। সম্প্রতি একটি লেখায় জানিয়েছেন, "যে-স্রোতের বিরুদ্ধে তিনি (শিববাবু) দাঁড়িয়েছেন তা আমাদের দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের পশ্চাৎমুখী স্রোত।......শিববাবু ও আমি দুজনেই স্রোতের বিরুদ্ধে" (কবিতীর্থ, ১৯৯২)। যে মানুষটির চিন্তা এবং শিল্প-কর্মকে আজ ষাট বছর ধরে শ্রদ্ধা করে আসছি তাঁর সঙ্গে আমার চিন্তার অনেকখানি মিল হওয়াই স্বাভাবিক। আমি নিজেও সত্তর পেরিয়েছি কিন্তু এখনো বার্ধক্যের হিসেবিবুদ্ধির চাইতে তারুণ্যের প্রাণপ্রাবল্য ও স্বাধীনতার উৎকাঙ্ক্ষা আমাকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করে। মানবতন্ত্র, বিশ্বনাগরিকতা, শিল্পের স্বতঃসিদ্ধ মূল্য, প্রাতিস্বিকতা, স্বাধীনতা ও সহযোগ, নারীনরের সাম্য, জ্ঞানান্বেষণের জন্য অভিজ্ঞতা ও যুক্তির পরে নির্ভরতা, শাস্ত্র বা লোকাচার নয় নীতি নির্ণয়ে ব্যক্তির বিবেক এবং বিচার বুদ্ধির পরে আস্থা, সব রকম জুলুমতন্ত্র, জড়তা এবং গোঁজামিলের বিরুদ্ধতা, মানুষের আত্ম-নির্মাণ ও ইতিহাস রচনার সামর্থ্যে বিশ্বাস,—এ সব ক্ষেত্রেই আমি তাঁর অনুজ এবং স্বজন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের জীবনদর্শনে এবং প্রতিন্যাসে পার্থক্য আছে। খুব সংক্ষেপে অন্তত তার কিছুটা আভাস দেওয়া সংগত মনে করি।

গোড়াতেই লিখেছি আমার তরুণ বয়সে যাঁরা আমার মনে প্রভাব ফেলেন তাঁদের ভিতরে পড়েন মার্ক্স, ফ্রয়েড এবং রাসেল। আমি খুব অল্প বয়স থেকেই নাস্তিক—মানুষী কল্পনার বাইরে ঈশ্বর, দেবদেবী, আত্মা ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব নেই এ সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও আমার মনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেন নি। ফলে অন্নদাশঙ্কর যখন বিধাতার অভিপ্রায়ের কথা বলেন, লেখেন "ভগবানের ইচ্ছা সর্বত্র সক্রিয়, কী তাঁর ইচ্ছা জানতে হবে। সেই অনুসারে কাজ করতে হবে", তখন আমি তাঁর এসব কথা একেবারেই মানতে পারি না। মানুষের স্বাধীনতা এবং আত্মসৃজন সামর্থ্যের সঙ্গে বিধাতার নির্দেশ এবং অভিপ্রায়ের তত্ত্ব কীভাবে মেলে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। আবার অন্নদাশঙ্কর গান্ধীর ব্যক্তিত্ব এবং ক্রিয়াকলাপকে যেভাবে দেখেন আমি সেভাবে দেখি না। গান্ধীর ভিতর বীর্য এবং করুণার সমন্বয়কে আমিও শ্রদ্ধা জানিয়েছি, শক্তির বিকেন্দ্রায়ণ আমারও কাম্য; কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে গান্ধীর অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সত্যাগ্রহে ক্ষমতাস্পৃহার খাদ মিশেছিল, তাঁর অহিংস

অসহযোগ বারে বারেই সহিংস গণবিক্ষোভে পর্যবসিত হয়েছে, বিজ্ঞানবিমুখতা এবং শিল্প ও সৌন্দর্যবিষয়ে তাঁর সংকীর্ণ অতিনৈতিকতা তাঁর জীবনবীক্ষাকে শীর্ণ করেছে—গান্ধীর মূল্যায়নে এসব দিকও বিচার্য বলে আমি মনে করি।

মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে আমি বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকি, কিন্তু "ভারতীয়" ঐতিহ্য বলে যদি কিছু থাকে তার বেশিটাই আমার কাছে বর্জনীয় ঠেকে। বুদ্ধের বাণী, চার্বাকের দর্শন, কালিদাসের কাব্য, অজন্তা খাজুরাহো থেকে তাজমহল সেকেন্দ্রা, দরবারি সংগীত এবং লোকগীতি, মোগল-রাজপুত চিত্রকলা—এ সব থেকেই আমরা আনন্দ এবং প্রেরণা পেতে পারি, কিন্তু যে ঐতিহ্য সারা দেশজুড়ে এখনো দৃঢ়মূল তাতে আছে প্রবল জাতিভেদ এবং জগৎ-বিমুখতা, জিজ্ঞাসারিক্ত অন্ধভক্তি এবং স্বনির্ভরতারিক্ত উদ্যোগহীন পরজীবিতা। ভারতবর্ষ পরাধীন কেন, এই ব্যথিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বঙ্কিম খুব স্পষ্টভাবে এই অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করেছিলেন যে ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতাস্পৃহার প্রমাণ আদৌ মেলে না। স্বাধীনতা আমাদের কাছে কোনোদিন বিশেষ মূল্য পায় নি বলেই ভিন দেশ থেকে আসা মুষ্টিমেয় আগ্রাসীর দল বারে বারেই এই দেশ জয় করেছে। তারা এদেশে এসে এখানকার মানুষদের মতোই জাতপাতের পরম্পরায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে, ভারতীয় ঐক্যসাধনার এই বিঘোষিত কীর্তি আমাকে আদৌ উৎসাহিত করে না।

অপর পক্ষে মানুষের সৃজনশক্তি এবং ইতিহাস রচনার প্রাজাতিক সামর্থ্য আমার মানবতন্ত্রী দর্শনের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বটে। কিন্তু মানুষের ভিতরে যে মর্ত্যুকাম বৃত্তির কথা ফ্রয়েড তাঁর জীবনের শেষ ভাগের রচনাবলিতে বিস্তারিত-ভাবে লিখেছিলেন তার চেতনাও আমাকে বিমথিত করে। যে পাতালিক অন্ধকার, অবচেতনে অবরুদ্ধ প্রক্ষোভের যে দুঃস্থিতি, অন্তর্লোকের যে নিরুপাখ্য গূঢ়েষা এবং উত্তরণহীন আর্তি আধুনিক সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে, আমি তাকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারি না। বোদল্যের থেকে এলিয়ট, ডস্টয়েভ্স্কি থেকে কাফ্কা ও কামু, ও'নীল থেকে স্যামুয়েল বেকেট এই পাতালিক জগতের অধিবাসী, নাবিক ও মানচিত্রকার। এরই আতঙ্কিত, অপরোক্ষ অনুভব থেকে উৎসারিত তাঁদের অগ্নিগর্ভ অতি-কথাবলি, এরই মর্ত্যুকাম প্রচণ্ড প্রেষকে ব্যঞ্জিত রূপে ধারণ করবার জন্য নিরাশ্বাস তাঁদের নির্বন্ধ। আমার মানবতন্ত্রী দর্শন মানুষের এই ভয়ংকর দিকটিকেও বুঝতে চায়। এই স্ববিরোধের সমাধান জানি বলে আমি আপনাকে স্তোভ দিতে পারি না।

পাউন্ড সম্বন্ধে এলিয়ট একদা লিখেছিলেন যে পাউন্ডের নরক অন্য মানুষদের নরক, সেটি তাঁর নিজের নরক নয়, তাই সেই নরকের বৃত্তান্ত

আমাদের উদ্বেল করে না। পাতালিক অন্ধকারের কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন, অন্নদাশঙ্করও জানেন। কিন্তু তাঁদের বাস আলোকের জগতে। প্রকৃতিপ্রেমী, জীবনপ্রেমী, মানবপ্রেমী, চৈতন্যের, মঙ্গলের, সুন্দরের, মিলনের সাধক এই শিল্পীভাবুকেরা মানবপ্রকৃতির অন্ধকারকে প্রায় সব সময়েই দেখেছেন বাইরে থেকে, মানুষ এবং জীবজগতের প্রতি মহাবিশ্বের অনতিক্রম্য উদাসীনতা তাঁদের ঈশ্বরবিশ্বাসে ফাটল ধরায় না। তাঁরা তমিস্রাকে অস্বীকার করেননি, তবে প্রেমে, প্রজ্ঞায়, ঈশ্বরের দাক্ষিণ্যে এবং মানুষের ধর্মে প্রত্যয়ের জোরে সেই তমিস্রার অবসান সম্পর্কে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সুনিশ্চিত। আমি মানবতন্ত্রী ; অন্নদাশঙ্করের মতো মানবিকতায় প্রত্যয়ী প্রচেতার প্রতি আমার অনুরাগ স্বাভাবিক। তবু হয়তো এক মহাযুদ্ধের পরে জন্মেছি এবং আরেক মহাযুদ্ধের সূচনায় আমার বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে বলে ফ্রয়েড বিশ্লেষিত 'মৃত্যু-বাসনা' আমার কাছে একেবারে পরোক্ষতত্ত্ব ঠেকে না। এ ব্যাপারে শুধু অন্নদাশঙ্কর নয়, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গেও আমার কিছুটা অমিল আছে।

এসব পার্থক্য সত্ত্বেও অন্নদাশঙ্কর তাঁর সঙ্গে আমার যে অ্যাফিনিটি বা স্বজন সম্পর্কের কথা লিখেছিলেন বারে বারেই তার প্রমাণ দেখে উৎফুল্ল বোধ করি। এদেশের 'প্রগতিপন্থী'দের মধ্যে অনেকেই তসলিমা নাসরিনকে সমর্থন করেননি, এখনো করেন না। আমি এই বিদ্রোহিনীর অসংকোচ সমর্থক। এবং স্মরণ করে আনন্দ পাই যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘরে যখন তসলিমার সমর্থনে সভা হয় তখন তার সভাপতি ছিলেন অন্নদাশঙ্কর। আর অতি সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর একটি সাক্ষাৎকার পড়ে আবার মালুম হল নব্বই বছরে পৌঁছেও তিনি আমাদের চারপাশের ঘনায়মান অন্ধকারে অপ্রতিম আলোকস্তম্ভ। সুরজিৎ দাশগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর বলেছেন, 'বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ সরকার বিচারাধীন।··· আশি বছর আগে বাংলাভাষার এক কবি নোবেল পেলেন, বিশ্ব স্বীকার করল বাংলাভাষার মূল্য।·· তসলিমা বিতর্ক আবার বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক বিস্তার দিয়েছে।···তসলিমার প্রতি এত বিদ্বেষের কারণ, যেসব একচেটে অধিকার, যেসব সুযোগ-সুবিধা, যেসব স্বাধীনতা একা পুরুষরাই ভোগ করে সেগুলোতে সে নারীর সমান ভাগ দাবি করেছে।···তসলিমার লেখায় মাইনরিটির এবং উইকার সেকশনের বাস্তব অবস্থাটা দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশে যেমন হিন্দু, ভারতে তেমনই মুসলিম'। যে দেশের ঐতিহ্যে পঞ্চাশের পরে বাণপ্রস্থের বিধান ছিল সে দেশে নব্বই-এ পৌঁছে এসব কথা যিনি বলতে পারেন তিনি আমার নমস্য।

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

শ্রান্তপথিক অন্নদাশঙ্কর

বীতশোক ভট্টাচার্য

স্থির হয়ে বসে 'তাও' ধরে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। —তাও-তে-চিং

সময়ের মধ্যে যিনি ক্রমে ব্যক্ত হয়ে ওঠেন তিনি ব্যক্তি। সময়ের মধ্যে ব্যক্তিমান্ এ অস্তিত্বের নিরীক্ষা মানব-বিজ্ঞানের এক মূল সমস্যা। অন্নদাশঙ্করের মতো এক ব্যক্তবাক্ মনীষার প্রকাশ এ সমস্যাকে বিশদ করে; কালের ধারায় তাঁর সাহিত্যগত সৃষ্টিক্রিয়ার কর্তা-রূপে অন্নদাশঙ্কর এ সমীক্ষার বিষয় হন। দীর্ঘ নয় দশকেরও অধিককাল ধরে প্রসারিত তাঁর প্রাতিস্বিক জীবন: বৈচিত্র্যে বহু ব্যাপ্ত, পরতন্ত্রতার মধ্যে অনন্য। এবং তা একই সঙ্গে সমীক্ষার বিষয় আর সমীক্ষার পক্ষে বাধা হয়ে ওঠে। আশঙ্কা হয় ব্যক্তিগতভাবে কৃতী, সামাজিকভাবে সম্ভ্রান্ত, মানসিকভাবে দ্বিধাদীর্ণ, নান্দনিকভাবে রূপ-দক্ষ আর একান্তভাবে মানবিক—এবং এমনই নানা ধরনে আয়তনবান্ বিশেষ ব্যক্তিত্বটিকে মানুষের অস্তিত্বে সময়ের সচলতা দিয়ে সাধারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে তা তরল সরলীকরণ হবে। কিংবা তীব্র সংবেগে আসন্ন সময়ই সেই তীর যার শরব্যতা সাহিত্যবস্তুর সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের শিল্পী-ব্যক্তিত্বকে যুক্ত করে। স্রষ্টা অন্নদাশঙ্করের রচনা প্রক্রিয়ার পদ্ধতি সময়ের পটে তাঁকে সুনির্দিষ্টরূপে পরিস্ফুট করে দেখায়।

অন্নদাশঙ্করের তরুণ রচনার উদ্‌গম ঘটেছে সবুজপত্র-র সে-যুগে যখন আত্মগত ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অঁরি বেয়র্গসোঁ-র জীবনের দর্শন অন্তর্মুখ বাঙালি শিল্পী-ব্যক্তিত্বের উৎস খুলে দিয়েছে। বেয়র্গসোঁ-র কাছে মানুষের, বিশেষত শিল্পীমানুষের, জীবন যুগ থেকে যুগে এবং রূপ থেকে রূপে স্খলিত হয়ে-আসা আত্মবীক্ষণের একটি প্রণালী। এ জীবন হল চেতনার জীবন, এবং এ জীবনের অর্থ হল স্থিতিকাল, কারণ কালের মধ্যে জীবনের ক্রম-উন্মোচন, দেশের মধ্যে নয়। মানসযাত্রী হাঁসবলাকার পাখশাটের অভিঘাত এভাবে রবীন্দ্র-কবিতায় এসে পড়েছিল, আর অন্নদাশঙ্করের ভ্রামণিক গদ্যও পথেপ্রবাসে-র মানসলোকে যাত্রা করেছে। না উপনিষদের প্রাণপ্রেতি, না বেয়র্গসোঁ-র এলাঁ ভিতাল—কিছু দিয়ে এ পদ্ধতির পরম ব্যাখ্যা করা চলে

না। শুধু এটুকু বলা যায় যে এ পদ্ধতি স্বভাবে সৃষ্টিশীল, এ দৃষ্টি ধ্যানের দৃষ্টি। এ অন্তর্দৃষ্টি প্রাণের প্রেরণাসঞ্জাত, পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে বাধা পেয়ে ক্লান্তিভরে থমকে দাঁড়ানোর দৃষ্টি নয়।

বেয়র্গসোঁ-র সময়সম্ভূত মন্ময় অভিজ্ঞতায় যে সংকীর্ণতা ছিল অন্নদাশঙ্কর তা পেরিয়ে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অন্য কোথাও আর ভিন্ন কোনো-খানের বাণী শুনিয়েছিলেন; তাছাড়াও সময়ের তাৎক্ষণিক স্থিতিকালের সীমা অতিক্রমের আরেক প্রণোদনা ছিল তাঁর আকৈশোর ইতিহাস-পাঠে। বেয়র্গসোঁ যে ঐতিহাসিক স্মৃতিকে অস্বীকার করেছেন অন্নদাশঙ্কর সেই স্মৃতিব্যক্ত অতীতকে অংগীকার করে নিয়েছেন। ক্রান্তদর্শী এই সাহিত্যিকের কখনো মনে হয়নি স্মৃতি অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়েও তিনি ভবিষ্যতের অভিমুখী।

প্রায় শতাব্দকাল ধরে পরিব্যাপ্ত এই রাসেলপ্রতিম ব্যক্তিত্বের জীবন ও রচনায় ইতিহাসের অতীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত। তাঁর শিল্পী-চেতনা বর্তমানকে এবং ভবিষ্যৎকেও বোঝাবার জন্যে ঐতিহাসিক অতীতের মুখা-পেক্ষী। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের পর বিশ শতকের বাংলাদেশের নবজাগরণকে স্বাগত জানাতে তিনি উন্মুখ। তাঁর মানববাদ তলস্তয়ের বিগ্রহ ও শান্তি-র মতো উপন্যাসে অনাবর্ত অতীতকে খোঁজে, সত্যাসত্য উপন্যাসের নানা পর্বে ইতিহাসের ভাষ্য প্রস্তুত করে। কথাসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর জানেন বর্তমানের অভিজ্ঞতা দামি, কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতার মূল্যনির্দেশ তাঁর কাছে আরো দরকারি মনে হয়। সরা যেমন করে জল শুষে নেয়, সবুজ পাতা যেমন করে রং টেনে নেয়, তেমনি এক আত্তীকরণের পদ্ধতিতে তাঁর বিশ্বাস। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দায়ভাগ, তাঁর আত্মিক রিক্থ এবং চেতনার প্রত্নরূপের খুঁড়ে-তোলা নানা স্তর এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সঞ্চয়। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের তরুণ নায়করা তাঁরই মতো মননশীল, আবেগ-উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও ভাবুকতার ফলে তারা যেন তুলনামূলক ভাবে একটু বেশি পরিণত, তাদের কেউ কেউ জরারহিত প্রবীণতার সাধক। তরুণ অন্নদাশঙ্কর নিজেও প্রাপ্ত-বয়স্ক পূর্ণমনস্ক ব্যক্তির জীবন ও জগৎ-সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে পথেপ্রবাসে-র মতো সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বই লিখে উঠতে পেরে-ছিলেন। সমুদ্রের এবং সমুদ্রপারের দেশগত অভিজ্ঞতার ঢেউ তাঁকে কিছুটা ভাসিয়ে নিয়েছিল ঠিকই, তবে আসল অভিঘাত এসেছিল জীবনের সময়ের স্রোত থেকে, সে স্রোত সান্দ্র সত্বর নির্বাধ এবং উন্মুক্ত।

অন্নদাশঙ্কর অনুভব করেছেন বর্তমান বাস্তবের প্রতিসৃত যে রশ্মি তাঁর কথাসাহিত্যকে উজ্জ্বলতা দিয়েছে, তা ঘিরে আছে তাঁর অতীতের স্মৃতির পুঞ্জিত ছায়াপাত। তাঁর অস্তিত্বের জৈব স্তরে যেন কবেই অঙ্কিত হয়ে গেছে

ভাষার বোধ আর নারীর চেতনা, কীভাবে কখন যেন ঘটে গিয়েছে মানসিক আর আত্মিক বিকাশ। প্রাচ্যের প্রথাগত শিল্পভাবনে ওই বিকাশের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতার একটি আশ্চর্য সূত্র আছে: অন্নদাশঙ্কর দেখেছেন অমেয় সমুদ্রের চিরন্তন ঢেউ সৈকতে বয়ে বয়ে আনে তাৎক্ষণিক বর্তমানের কাঠ, তা দিয়ে দারুব্রহ্মের শরীর তৈরি। এবং সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ নিজে বিশ্বস্রষ্টা হয়েও অসম্পূর্ণ, ঠুঁটো। উৎকলের উৎকৃষ্ট কলাবিদ্যার এ উত্তরাধিকার নিয়ে অন্নদাশঙ্কর বাংলার এসেছেন। অসম্পূর্ণতার অনুভব এপিক শিল্পী অন্নদাশঙ্করের রচনার একটি স্মৃতিধার্য বৈশিষ্ট্য।

শিল্পীর মানসলোক এবং বাস্তবের পৃথিবীলোকের মধ্যে এক আয়ত সেতুবন্ধ আছে, রবীন্দ্রনাথের মতো অন্নদাশঙ্করও তাকে লীলার যোগরূপে দেখতে চেয়েছেন। সৃষ্ট শিল্প এবং বাস্তব বস্তুনিচয় থেকে উদ্ভূত নান্দনিক বোধের সৌন্দর্য ও সমুন্নতভাব এবং ট্রাজিক মহিমার কথা তিনি বারে বারে বলতে চেয়েছেন। রচিত শিল্পবস্তুর মধ্যে নান্দনিক অনুভব বস্তুগত মূর্তি পাবে, আনন্দ ও প্রেরণার বিষয় হয়ে উঠবে--- এ উপলব্ধি তাঁকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্রতী করেছে। মায়ার এ সংসারে জাতককে সুন্দর এক জন্মেই জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা এনে দেয়, জন্মান্তরীণ সৌহার্দ্যের রমণীয় মধুর স্মৃতি মনে করায়। জলের মধ্যে যেমন মিলিয়ে যায় নুনের দ্রবণ তেমনি করে স্রষ্টাকে আত্মতার অসীম ও অন্য-অস্তিত্বে মিশে যেতে হয়। ভারত-সংস্কৃতি কর্মব্যস্ত রাজপুরুষ অন্নদাশঙ্করকে দিয়ে অতীতের অভিজ্ঞতার ধ্যান এবং অনুভব সম্ভবপর করে তুলেছে। তাঁর অন্তর্মুখী শিল্পী-ব্যক্তিত্বের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যরূপে একই সঙ্গে আত্মিক ভুবন ও বস্তুগত পৃথিবীকে দেখানোর প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। যা কিছু স্থায়ী, চিরন্তন, প্রিয় এবং শ্রদ্ধার্হ অতীত তা তাঁর কাছে নবীনের প্রেমের বস্তু, প্রবীণের প্রীতির বিষয়। লালন ফকির ও রবীন্দ্রনাথ, দান্তে, গ্যেটে এবং তলস্তয় তাঁর কাছে ওই পরম পূর্ণবয়স্কতার প্রিয় আদিরূপ।

দেশের ও দশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গীকার ব্যক্তিগত এবং লোকগত স্তরেও গতিশীল বিকাশের এক অবশ্যমান্য শর্ত। মানবতার শীতল ভাণ্ডারে রক্ষিত ঐশ্বর্যে পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ মানুষই প্রকৃত মানববাদী এবং অন্নদাশঙ্করের জীবন ও রচনাকর্মে দেশের ও বিদেশের ছবি গান কবিতা গল্প ভাস্কর্য স্থাপত্যের প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক আবৃত্ত উল্লেখ এ মানববাদী কবি-কথককে বিশেষভাবে সম্পন্ন করে তুলেছে। তবে এটুকুও সব নয়। মানবিক সক্রিয়তার বিকাশকে যথাযথভাবে বোঝবার জন্য এসব লোকচর্যার পদ্ধতিগত তাৎপর্য থেকে গেছে। অন্নদাশঙ্কর যাত্রা কথকতা কীর্তন বাউলগান এবং বিশেষ করে ছড়ার ঐতিহাসিক স্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে এ সমস্তর সত্যকার সাংস্কৃতিক

মূল্য নির্দেশ করেছেন। আজকের বাংলা ছড়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী তিনি—এ কথা নতুন করে প্রমাণ করেছে যে স্রষ্টার ব্যক্তিগত স্মৃতি, কৌম স্মৃতি এবং ঐতিহাসিক স্মৃতির বিহনে শিল্প সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ অসম্ভব।

উপন্যাসের উপক্রম থেকে উপসংহার পর্যন্ত প্রসারিত বিপর্যস্ত কাল-পর্যায়ের বোধ অন্নদাশঙ্করের মন্ময় রচনাবলিতে সময়ের ক্রিয়ার ভিন্নতর সূচক হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্ষণকালের দ্বিধাকম্পিত চূড়ান্তে শাশ্বত সময়ের বাসা বেঁধে দেওয়ার এই ঝোঁক থেকে নির্মিত তাঁর পর্বগ্রন্থিত উপন্যাসকটিতে একটি মূর্ছনার আদ্যন্ত সংগঠনকে এক মুহূর্তে ধরে দেওয়ার একটি দিব্য-সংকল্প আছে বোঝা যায়:

> এ গ্রন্থ লিখতে পারাটাও তার জীবনে এক পরম লাভ। সে অভিজ্ঞতা তাকে সিদ্ধি না দিক শুদ্ধি দেয়। ততদিনে তার বয়স হয়েছে বিরাশি। এত দিন তো বাঁচবার কথা নয়। চারখণ্ডের এক খণ্ড লেখে আর ভাবে এই বোধ হয় শেষ। না, চার খণ্ডের বেশি লিখতে পারা যেত না। প্রথম যৌবনে দুই বছরের ঘটনা নিয়ে বারো বছরে ছয় খণ্ডের উপন্যাস লিখেছিল। দ্বিতীয় যৌবনে তিন বছরের ঘটনা নিয়ে তিন খণ্ড লিখতেই তার পনেরো বছর লেগে যায়। পঁচাত্তরের ঊর্ধ্বে সে কোনো অর্থেই যুবক নয়। ঐ চার খণ্ডই তার পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু সাড়ে আট বছরের ঘটনাকে চারখণ্ডের ফ্রেমে আঁটা হচ্ছে সংক্ষেপে সারা। বিনুকে সময়ের বিরুদ্ধে দৌড় দিতে হচ্ছিল। যাকে বলে রেসিং এগেনস্ট টাইম। (বিনুর বই ১৯৯৩)

শিল্পী অন্নদাশঙ্করের এ উপলব্ধি ঘটেছে যে, ব্যক্তিমানুষের শরীরী সময়-সীমার মধ্যে অসীম তাৎপর্যপূর্ণ আত্মিক কালের অনুভূতিপ্রবণ নানান স্তরন্যাস থেকে গেছে। ব্যক্তি মানুষের মনোগত সমীক্ষা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কদাচিৎ কখনো প্রেরণার চকিত বিদ্যুৎ-লেখায় সহসা সময় ধারার তলদেশ অবধি ধরা পড়ে। প্রেরণার দৃষ্টিপাতের এ প্রসাদ অন্তরে নেমেছে, অন্নদাশঙ্কর তা অনুভব করেছেন। তবু নিজেকে রোম্যানটিক মিস্টিক বলায় তাঁর আপত্তি।

অন্তর্মুখ শিল্পী অন্নদাশঙ্করের নিবিড় অর্থবহ জীবনে সময়ের সংশ্লেষ তাঁর আবেগগত এবং মননগত অন্বেষার দুবাহু প্রসারিত করেছে। সংহত শরীরী সময় অসীম আত্মিক ভার বহনের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। অনন্তকাল পলকে তুলে ধরার মতো সক্ষম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর নিজে হয়তো একে মরমীর রহস্যময় উপলব্ধি বলবেন। কিন্তু ওই অন্বেষার

বাস্তব এবং মানসিক কারণ থেকে গেছে। লেখা ছাড়া ভিন্ন কারণে শ্রান্ত বা ব্যস্ত থাকার ফলে ওই প্রতীক্ষিত উপলব্ধির বিরল ক্ষণটিকে সমারোহে বরণ করে নেওয়া সম্ভব হয় নি—অন্নদাশঙ্করের এমন ক্ষতিকর স্বীকারোক্তিও আছে। তবু বলা ভালো, অন্নদাশঙ্করের মতো সপ্রেম সত্যসন্ধ ভাবুক সৌন্দর্যস্নিগ্ধ শিল্পীর অবধারণে এ চিরন্তনত্ব ধরা দেয়।

এমন নয় যে অন্নদাশঙ্কর একেবারে নির্দ্বন্দ্বভাবে সময়ের ছন্দকে তাঁর রচনাবলিতে ধরতে পেরেছেন। উপনিবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসন কর্ম, পাশ্চাত্যের ভিন্নধর্মী জীবনধারা এবং সারস্বত মণ্ডলীতে দায়িত্বশীল অংশ-গ্রহণ তাঁর মধ্যে বহির্মুখী টান এনে দিয়েছে। ফলে মননজীবী অন্নদাশঙ্কর তাঁর পরিচ্ছন্ন এবং অনতিগভীর গদ্যে বর্তমান ও অতীতের সময়কে বস্তুগত ভাবে ধরতে চেয়েছেন। বিনুও দেখেছে তার সামনে স্মৃতির দিগন্ত, যত দিন গেছে ততই সে ঘটনা ও তথ্যের ক্রমপুঞ্জিত সমাহারের মধ্যে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতা লক্ষ করেছে।

মন্ময় শিল্পী অন্নদাশঙ্কর তাঁর আবেগগত অভিজ্ঞতার বর্ণালিতে জীবন-যাত্রার রূপ দেখে মুগ্ধ, আর তন্ময় সাংবাদিক অন্নদাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিব্যক্ত মূর্ত বাস্তবের নিরঞ্জন আলোয় বস্তুপৃথিবীকে দেখাতে তৎপর—তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে এ দুয়ের সমন্বয়ের প্রয়াসও চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্কর হয়তো উপনিষদের সেই এক পাখির কথা বলবেন, তার দুটি মুখ।

স্বভাবে বহির্মুখী টান আছে তাই বিনু-অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের তারুণ্যের স্মৃতি রচনাবলিতে এতো গভীর এমন রূপময়ভাবে অঙ্কিত। বস্তুরূপ এবং রূপকল্পের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠা গহন ওই স্মৃতির সংগঠনের গভীরতা এবং প্রসার মানুষকে অস্তিত্বের মর্মমূলে নিয়ে যেতে পারে। অন্নদাশঙ্কর জানেন রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয়ের শৈশবস্মৃতিতে তার পরিচয় আছে, তবে অন্নদাশঙ্করের স্মৃতির প্রকাশ তত নিগূঢ় কিছু নয়, অবশ্য তা আবেগের রঙে রঞ্জিত, তাই তাঁর প্রৌঢ় স্মৃতিচারণায় তারুণ্য কেবলই একটি লাবণ্যময় মুদ্রা রচনা করে এবং তা শিল্পসৃষ্টিরও যন্ত্ররূপে গৃহীত হয়।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির একান্ত তাৎপর্যের অবধারণে সমর্থ তাঁর শিল্পী-মানস অতীতকে এপিকসুলভ গভীরতায়, বিস্তারে এবং সত্যাগ্রহীর ঋজুতায় গ্রহণ করে বর্তমানের ভাষ্যরচনায় ব্রতী হয়। অন্নদাশঙ্করের ভাবে ভাবনায় যে বাস্তবের যথাযথ প্রকাশ তার প্রয়োগ-যোগ্যতা সম্পর্কেও তিনি অবহিত এবং এবিষয়েও তিনি সচেতন যে সত্যতার এ ধারণা ভাষায় প্রকাশযোগ্য কিছু নয়। মানুষের কাজ আপেক্ষিক সত্য নিয়ে, গান্ধীজি আচরিত পরম সত্যকে অন্নদাশঙ্কর 'ভগবান' বলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে বিজ্ঞান ও স্বজ্ঞার বিকাশের ক্ষেত্রে অনিবার্য কিছু প্রত্যয়কে সত্য বলে মানেন।

ধর্মের মতান্ধতায় যে সত্য ধরা পড়ে না তা সাহিত্যধর্মে বিধৃত হতে পারে। দান্তে গ্যেটে তলস্তয় এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শরূপে বিবেচিত হন। তাঁর প্রিয় গ্রন্থ রম্যাঁ রলাঁর জঁ ক্রিস্তফ গ্রন্থটিতে যে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের উন্মোচনের সংবাদ আছে সে এক বিশেষ কালের হয়েও সবসময়ের— অন্নদাশঙ্করের এই পাঠও ওই ভাষ্যরচনাকে সমর্থন করে।

রলাঁর সঙ্গে জীবনযাত্রার কিছু মিলযুক্ত শিল্পী নন্দলাল বসু। তিনি অন্নদাশঙ্করের মতোই গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার অনুগামী। অন্নদাশঙ্করের সমকালীন এই শিল্পগুরু অঙ্কিত হরিপুরা কংগ্রেস চিত্রমালায় আধুনিক ভারতের এক চিরন্তন রূপায়ণ লক্ষ করা গিয়েছিল। শিল্পযুগ, নাগরিকতা, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বেড়াজাল ইত্যাদির বিড়ম্বনায় না গিয়ে নন্দলাল সেখানে গ্রামনির্ভর ভারতের অক্ষুণ্ণ মর্মকথা লিখে গিয়েছিলেন; চাষি তাঁতি ধুনুরি গোয়ালিনি বউ একতারা ঢোল সারেঙ্গির সমাহারে এ চিত্রপর্যায়ে লোকজীবনের এক মিলিত মূর্ছনা স্তব্ধ বেজে উঠেছে— তা আধুনিক জীবনের নয়, চিরকালের। লোকগত শিল্পের বাহনে করে পল্লী-প্রধান ভারতের ওই কেন্দ্রে অন্নদাশঙ্কর উপনীত হতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন। তাঁর ছড়া রচনা, কথাসাহিত্যে তাঁর সহজের সাধনা উপনয়নের এ সূত্রটিকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছে। যামিনী রায়ের ছবি এবং বিষ্ণু দে-র কবিতায় যে পরিশীলিত লোকযান তার থেকে নন্দলাল বসুর ছবি এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাহিত্যকর্ম সরল প্রাকৃতিক পার্থক্যে আলাদা।

তারুণ্য এবং পাশ্চাত্যবাসের অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ পত্রাবলিতে এক সূত্রে ধরে রেখেছিলেন। বিশেষকে যিনি অনুপুঙ্খে ধরতে পারেন তাঁর হাতে সামান্য অসামান্য রূপ পায়। অন্নদাশঙ্কর বারেবারেই চলমান জীবনের ওই বিশেষ সুন্দর মুহূর্তটিকে থামিয়ে দিয়ে তাকে লেখার ডোরে বাঁধতে চেয়েছেন। ভুবনডাঙার খোয়াই-এর মতো বাস্তব জীবনের এক নৈসর্গিক বিস্তার তাঁর সামনে মহাকাব্যোপম উপন্যাসের ক্রমিক ঘটনা পর্যায়ে দৃশ্যমান, দূরে দিগন্ত রেখায় বিসর্পিত। শীলচর্যায় বিশ্বাসী অন্নদাশঙ্করের সৃষ্টিপ্রতিভার পিছনে ক্রমশ আর কোনো বাইরের প্ররোচনা নেই, ব্যক্তিত্বের সহজ স্বাভাবিক বিকাশে তাঁর শিল্পী-চারিত্র মূর্ত। অন্নদাশঙ্করের বাসভূমি যে সময়ে তা তাঁর জীবন এবং রচনায় ছন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। এখানে গ্যেটে তাঁর আদর্শ, তলস্তয় তাঁর আদর্শ। লুকাচ যেভাবে গ্যেটেকে দেখেছেন এবং লেনিন যেভাবে তলস্তয়কে দেখেছেন, অন্নদাশঙ্করের দেখা সে জাতের নয়। গ্যেটে ও তলস্তয়ের মতো নৈসর্গিক সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাদ কী তা তিনি জেনেছেন। নিসর্গপ্রকৃতিতে সুদীর্ঘ

জীবনের দৃষ্টান্ত আছেই, জাপানে গিয়ে অন্নদাশঙ্কর দেখেছেন প্রাচ্যের মানুষ প্রবীণ প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, এবং তিনি নিজেই আজ সুদীর্ঘ ফলপ্রসূ জীবনের প্রতিমান। আরাগঁ, ইসকাইলাস, উগো, গ্যেটে, তলস্তয়, তিশান, পিকাসো, মাইকেল এঞ্জেলো ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দীর্ঘজীবী শিল্পী-ব্যক্তিত্বের শরীরী অস্তিত্বের এই বিস্তার এখন অন্নদাশঙ্করের মধ্যেও ছড়ানো, জীবনের এক রহস্যময় উৎস থেকে এই প্রাণশক্তির প্রসার সম্ভব। অন্নদাশঙ্করের মতে পঁচাত্তরের ঊর্ধ্বে বিনা আর কোনো অর্থেই যুবক নয়। জরাতত্ত্ববিদ বা Gerontologist-এর মতেও পঁয়তাল্লিশ থেকে উনষাট বছর বয়স প্রৌঢ়তার প্রহর, ষাট থেকে চুয়াত্তর প্রবীণতার বছর এবং পঁচাত্তর থেকে বৃদ্ধাবস্থার শুরু এবং নব্বুই পেরুনো বৃদ্ধেরা সুদীর্ঘ জীবনের উদাহরণ। মনের জরা-রহিত এই দীর্ঘজীবিতার পর্বের মধ্য দিয়ে ঋতপথিক অন্নদাশঙ্কর এগিয়ে চলেছেন, তাঁর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সক্রিয়তার মাত্রা হয়তো আপেক্ষিক-ভাবে উঁচু, বয়স-সংশ্লিষ্ট বিপাকীয় পরিবর্তনের পরিপূরণ হিশেবেই যেন কর্টিক্যাল ক্ষেত্রের গতিময় পুনর্গঠন বার্ধক্যদশাতেও তাঁকে সৃষ্টিশীল করে রেখেছে।

অন্নদাশঙ্কর একসময় বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কর্মধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন, অসময়ে অবসর গ্রহণের পরও সৃষ্টিশীল রচনার ভার এবং অনিবার্য অনবধারিত আরও নানান কর্মভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে, এ সমস্তই তাঁর ভাবে এবং ভাবনায় ত্বরণ নিয়ে এসেছে, গতিমান এই শক্তির সঞ্চার তাঁর সুদীর্ঘ পুষ্পিত ফলিত জীবনের মূলে সক্রিয়। অন্নদাশঙ্কর জানেন, জার্মানি আর ভাইমারের যুগে ফিরবে না, তবে তাঁর প্রিয় গ্যেটে যখন ভাইমারে উৎসাহভরে মন্ত্রিত্বের নতুন গুরুভার গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন প্রশাসক অন্নদাশঙ্করের মতোই অতি তরুণ। সেকালের পদস্থ জর্মান রাজকর্মচারীদের তুলনায় গোটের ভূমিকা অনেক বেশি দায়িত্ব ও ব্যস্ততায় ভরা ছিল, বিভিন্ন নতুন প্রকল্পের বাস্তব অনুবাদের জন্য উন্মুখ এবং সে কারণে নিত্য নূতন বিচিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত ওই তরুণের মানসিকতার সঙ্গে নবীন অন্নদাশঙ্করের মনোভঙ্গি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। জীবিকার ক্ষেত্রে ওই বৈচিত্র্য ও বিপুলতা গ্যেটেকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে নি, অবকাশের মুহূর্তগুলি তিনি কাব্যসাহিত্যের হিরণ্য শস্যে ফলিয়ে তুলেছেন, জ্ঞানে প্রেমে সত্যে সৌন্দর্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। এই মহিমান্বিত নিস্তরঙ্গ জীবন-ধারা, এই আমৃত্যু অক্লিষ্টকর্ম গ্যেটেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সৃষ্টিশীল সঞ্জীবিত ও আলোকিত করে রেখেছে। তাঁর সৃষ্ট ফাউস্টের মতো গ্যেটেরও হয়তো আকাঙ্ক্ষা ছিল শত শরৎ বাঁচবার এবং অন্নদাশঙ্কর গ্যেটের কাছ থেকে শুধু সাহিত্যের আদর্শ নয়, দীর্ঘজীবনের সহজ পাঠও বোধকরি গ্রহণ

করেছেন। নিট্‌শে এবং স্পেংলার গোটের দর্শন থেকে যে নৈতিবাচক শিক্ষা পেয়েছিলেন অন্নদাশঙ্করের পাঠ তার চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ, মানসিক দিক থেকে স্বাস্থ্যকর।

ফরাসি-বিপ্লব গ্যেটের জীবনে আশ্চর্যভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল, নেপোলিয়ানের যুদ্ধ তলস্তয়ের এপিক রচনায় পটভূমির চাইতে বেশি কিছু, বিশ্বযুদ্ধের সংঘাত অন্নদাশঙ্করকে সেভাবে আলোড়িত করে নি। সমাজ-জীবন এবং আত্মিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রক্ষা করে অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিগত সৃষ্টিপ্রতিভা জীবনের বিভঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছে, প্রাণশক্তির প্রকাশ এবং বিকাশের পদ্ধতিতে সক্রিয় হয়ে থেকেছে। ভারতীয় মায়াবাদীর মতো বস্তুপৃথিবীকে মায়া না ভেবে অনন্ত সম্ভাবনার আকর ভাবায় নানান সৃষ্টিগত ও সারস্বত পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য দীর্ঘায়িত জীবনের আত্মগত অনুভব অন্নদাশঙ্করের পক্ষে স্বাভাবিক। শিল্পী অন্নদাশঙ্করের মানসিক নবীনতা তাঁর ধারাবাহিক বয়সের শরীরী সময়ের উপর অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। মনের দিক থেকে মানুষ প্রবৃদ্ধ হয় না, সুন্দর ভবিষ্যতের ভাবনা তার মনের আয়ু বাড়িয়ে দেয়, অথর্ব অতীতের চিন্তা তার মন থেকে তখন ক্রমাগত মুছে যেতে থাকে। সবুজপত্রের সেই দীক্ষামন্ত্র এখনও তাঁর মননে, যৌবনের জয়টীকা তাই আজও তাঁর ললাটে অমলিনভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে সত্য, সৌন্দর্য, শিল্প ও আনন্দ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে অন্বিত এবং তা বাস্তব অনুভবেরই চারটি দিক। এদের প্রকৃত একাত্মতা একমাত্র কোনো অধিবাস্তব জগতে সত্য হয়ে উঠতে পারে। রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষায় বিশ্বাসী অন্নদাশঙ্করের নন্দনতত্ত্বে প্রেম, সৌন্দর্য ও সত্য বিনিময়যোগ্য। প্রেমের, সত্যের ও সৌন্দর্যের যৌগিক সাধনায় তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দের স্বাদ পান। অন্নদাশঙ্করের জীবন ও রচনায় অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের ও সংশ্লেষের সাফল্য ও বিফলতা কোনো বিচ্ছিন্ন বিচারের বিষয় নয়। তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াস এবং সৃষ্টিশীলতার লক্ষ্যে নিজেকে সুস্থিত রাখার শিল্পায়াস ভারতের স্বাধীনতার পূর্বকার ও পরেকার শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশের অসমান পটভূমিতে শেষ পর্যন্ত বিবেচনার যোগ্য। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূর্ত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সময়ের মধ্যে ক্রম-উন্মোচিত অনন্য এক সক্রিয়তারূপে তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসমালার অবস্থান। বাস্তব ও আত্মিক সংকট পেরিয়ে হতাশায় বদ্ধমূলে এক অন্তর্মুখী শিল্পী-ব্যক্তিত্ব জ্ঞানে কর্মে সৃষ্টিতে সৌন্দর্যে সত্যাগ্রহে কীভাবে আশাবাদে উত্তীর্ণ হয় গ্যেটের তলস্তয়ের

জীবন থেকে অন্নদাশঙ্করের গৃহীত সে পাঠ আজ সময়ের পাঠোদ্ধারের ফলে আরও অর্থবহ হয়ে উঠছে। বীরবল যে ইচ্ছাশক্তির কথায় মুখর সে ইচ্ছাশক্তি সচেতনভাবে সময়সীমিত জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে তা অন্নদাশঙ্কর দেখিয়েছেন। আজ বাঙালি সমাজ যে সংসক্ত সুষম ও বিশ্বজনীন চারিত্র দাবি করে তার গভীর অর্থবহ প্রকাশ অন্নদাশঙ্করের এক জীবনে এবং খণ্ডশ মুদ্রিত রচনাবলিতে রূপময়।

ক্রান্তদর্শী

ভবতোষ দত্ত

এই উপন্যাস অন্নদাশঙ্কর ছাড়া আর কেউ লিখতে পারতেন বলে মনে হয় না। ক্রান্তদর্শীর মতো উপন্যাস লিখতে দরকার অসামান্য মনীষার সঙ্গে অসামান্য শিল্পরচনাশক্তি। উপন্যাসের মতো কুশলী সৃষ্টিতে সাধারণতই কাজ করে লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা ছাড়া উপন্যাস লেখা কঠিন। উপন্যাসে যে সব চরিত্র থাকে, তারা জীবনের ক্ষেত্রে মানবিক প্রবৃত্তির টানে বিচরণ করে কিংবা যে-পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের জীবনধারাকে বিশেষ পথে টেনে নিয়ে যায়, তার সঙ্গে লেখকের পরিচয় না থাকলে উপন্যাসের জগৎ তিনি সার্থকভাবে সৃষ্টি করে তুলতে পারবেন না। কারণ উপন্যাস আমাদের জীবন ও জগতের বাস্তব সত্য দিয়েই তৈরি হয়। এ কথা বলা নেহাতই অনাবশ্যক মনে হতে পারে। তবু বলছি, তার কারণ উপন্যাসের আর একটা রীতি আছে যা প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে লেখা নয়। যাকে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলি, অতীত কাল আশ্রয় করে যে জীবনের চিত্র আঁকা হয়, তা বই থেকেই আহরণ করা হয়। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাতে থাকে না। এই রীতির উপন্যাস লিখতে পড়াশোনার পরিধি যথাসম্ভব বিস্তৃত না হলে চলে না, আবার অতীতের স্বাদটাকেও ঠিকমতো ধরে দিতে হয়।

প্রত্যক্ষ সমকালীন যুগ জীবনই হোক, আর বই পড়া অতীত জীবনই হোক—দুয়ের ক্ষেত্রেই লেখকের অন্তর্দৃষ্টি এবং মনীষা না হলে উপন্যাস জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। মানুষের চরিত্র, তার হৃদয়লীলা পর্যবেক্ষণ করে লেখক উপন্যাস লেখেন। যে-চরিত্রের অবতারণা লেখক করেন—সে অতীত কালেরই হোক আর সমকালেরই হোক—তার মনোজগতের সূক্ষ্ম এবং আপাত দুর্বোধ্য গতিপ্রকৃতি উপন্যাস-লেখকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই রূপ পায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার চল আজকাল কমে এসেছে। সমকালীন জীবন-ধারা নিয়েই আজকাল উপন্যাস লেখা হয়, তাতে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক নানা সমস্যা এবং বক্তব্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে উপন্যাসের চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলি ফুটে ওঠে। মানুষের মনের সহজ সূক্ষ্ম

জটিল চেহারা সামাজিক প্রেক্ষায় লেখক আঁকেন। উপন্যাস বলতেই আমরা সাধারণত বুঝি বাস্তব অভিজ্ঞতা আর মানবচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের শিল্পসম্মত প্রকাশ। লেখককে হতে হয় হৃদয়বান কেননা হৃদয় নিয়েই তার শিল্পের জগৎ। প্রেম ভালোবাসা ঈর্ষা ঘৃণার আকর্ষণ বিকর্ষণ নিয়ে গড়ে ওঠে উপন্যাসের জীবন।

শুধু হৃদয়ধর্ম ছাড়াও মানুষের যে একটা বুদ্ধিগত চিন্তার জগৎ রয়েছে হৃদয়জগতের পাশাপাশি অন্নদাশঙ্কর তারও শিল্পী। উপন্যাসের কোনো সংজ্ঞাই অন্নদাশঙ্করের সৃষ্টির বাইরে নয় অর্থাৎ উপন্যাসের সব ধর্ম রক্ষা করেও তিনি একটা নতুন বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছেন তাঁর লেখায়, যা আর কারও ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না। অন্নদাশঙ্করের ক্রান্তদর্শীতে চরিত্র আছে, তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের রূপ আছে, গূঢ়সঞ্চারী হৃদয়লীলা আছে, আর আছে অভিজ্ঞতার বিস্তৃত ক্ষেত্র। তবু ক্রান্তদর্শী আমাদের সাহিত্যের অন্য উপন্যাসের মতো নয়। কারণ ক্রান্তদর্শীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সম্পূর্ণই ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বকালে স্মরণীয় একটা যুগের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছে লেখকের প্রখর চিন্তাশক্তি, ইতিহাস-ভূগোলের ব্যাপক পর্যটনক্ষেত্র। এক অসামান্য মনীষাদৃষ্টি যা সময়কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বুঝে নিতে পারে। ক্রান্তদর্শী চার খণ্ডে লেখা বৃহদায়তন উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং গান্ধীর হত্যা পর্যন্ত এই কয়েক বছরের রাজনৈতিক পরিবর্তন এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই কাহিনীর কালসীমা ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি। হিটলারের পোলান্ড আক্রমণে যার শুরু মহাত্মা গান্ধীর চিতারোহণে তার শেষ। অন্নদাশঙ্কর বলছেন :

'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার আনুষঙ্গিক সংঘর্ষ নিয়ে একটা এপিক উপন্যাস লেখা যায়। 'ঘরে বাইরে'তেও এর অবতারণা লক্ষণীয়। কিন্তু নতুন যুগের মহাভারত লেখা আমার সাধ্য নয় বলেই সেটি আমি অন্যান্যদের উপর ছেড়ে দিই। অথচ একজনকেও সে কাজে হাত দিতে দেখা যায় না। ব্রিটিশ শাসনকালে সেনসরের বা পুলিশের ভয়ে সে উপন্যাস লেখা যেত না। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও দেখা গেল যাঁরা লিখতে পারতেন তাঁদের আগ্রহ বা উদ্যম নেই। অবশেষে আমাকেই ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্ব তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অঙ্ক তথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের শেষ পরিণাম নিয়ে এপিক না হোক বৃহৎ উপন্যাসে হাত দিতে হলো।'

বলতে গেলে ভারতবর্ষের দু'হাজার বছরের ইতিহাসে যে-সব যুগান্তরণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই সাত বছরের পটপরিবর্তন তাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের আসার পর প্রারম্ভিক দিকটা দেখেছেন, এ-সম্বন্ধে তাঁর

শৈশবে কী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল সে কথাও বলেছেন, আবার আশি বছরে ইংরেজ রাজের যাওয়ার আসন্ন সম্ভাবনা জেনে না গেলেও শেষ পর্বের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও তীক্ষ্ণ ভাষায় বলে গিয়েছেন কালান্তর প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অসাধারণ সব ঘটনা ঘটতে লাগল জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় জীবনে। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। এদিকে আমাদের দেশে গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে রূপ নিল। য়ুরোপে যুদ্ধে লিপ্ত ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষকেও দায় টানতে বাধ্য করতে উদ্যত। আবার জিন্নার নেতৃত্বে মুশলিম সমাজও আস্তে আস্তে কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে এসে সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। ভারতেও গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন একেবারে থেমে যায় নি। সুভাষচন্দ্রের দ্বিধাহীন ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবে সতর্ক হয়ে ইংরেজ শাসক তাঁকে বন্দী করল, কিন্তু কলকাতার প্রহরীবেষ্টিত বাড়ি থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান, তাঁর জাপানিদের সংগে যোগ এবং তাঁর মৃত্যু এই সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে আবর্ত সৃষ্টি করে চলেছে। বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের দুঃসাহসিক উদ্যম থেকে ইংরেজ সিদ্ধান্ত করল আর এই দেশে থাকা নয়। কিন্তু কার হাতে শাসনভার দিয়ে যাবে। কংগ্রেস এবং মুশলিম লিগে দরকষাকষি, শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কংগ্রেসকে ভারত ভাগ স্বীকার করে নিতেই হল। গান্ধীজি কংগ্রেস থেকে সরে এলেন। তারপর প্রার্থনাসভায় তাঁর প্রাণদান।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে এ-সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাধারা। এই ঘটনাধারার অভিনবত্ব এই যে ভারতবর্ষ আর বিশ্বের এক কোণে পড়ে রইল না। শিক্ষা এবং য়ুরোপীয় সংস্কৃতির চর্চায় ভারতীয় বা বঙ্গমানস ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যের কাছাকাছি এসে গিয়েছে। উনিশ শতকের রেনেসাঁস-আন্দোলন থেকেই। কিন্তু পরাধীন ভারতের উপায় ছিল না রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক কর্ম-কাণ্ডের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের সংগে সূত্র রচনা করার। সেটা এবারেই হল। ভারতবর্ষের সংগে জার্মানি জাপানের নাম ঘটনাপ্রবাহে যুক্ত হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্রের জার্মানি যাত্রা করায় এবং ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ আর্মি তৈরি করায় ভারতের আন্তর্জাতিক যোগ সৃষ্টি হল। কিন্তু তার আগেই ইংরেজ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে বলে তার অধীন ভারতকে তাদের সংগে যুদ্ধে বাধ্য করায় ভারতের রাজনৈতিক চেতনা আর শুধু নিজের দেশে বদ্ধ রইল না। এমন প্রেক্ষাপট ভারতে এর আগে কখনও রচিত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটেই ক্রান্তদর্শী উপন্যাস রচিত। টলস্টয়, নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানের প্রেক্ষাপটে লিখেছিলেন 'ওয়র অ্যান্ড পীস'। টলস্টয়ের উপন্যাস আট বছরের কাহিনী, লিখতে লেগেছিল সাত বছর। অন্নদাশংকর সাত বছরের

কাহিনী লিখতে সময় নিয়েছেন চোদ্দ বছর। এই হিসাবটা প্রতিভার তুলনা করবার জন্য নয়—পরিকল্পনার ব্যাপ্তি বোঝাবার জন্য। টলস্টয়ের উপন্যাসকে সমালোচকেরা এপিক বলতে চেয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর নিজের লেখাকে বলছেন 'এপিক না হোক বৃহৎ উপন্যাস'। এপিক বললে লেখকের যে অন্তর্দৃষ্টি, জীবনের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা, পটভূমির ব্যাপকতা সেই সঙ্গে লোকচরিত্র-জ্ঞানের সমাহার বোঝায় টলস্টয়ের উপন্যাসের মতো তার এমন দৃষ্টান্ত আর নেই—Tolstoy's subject is humanity—people moving in the strange delirium of war and war's chaos. The historic scenes are used as a foil and background for the personal dramas of those who took part in them।

টলস্টয়ের উদ্দেশ্য তাহলে প্রত্যক্ষত ইতিহাসের ঘটনাধারাকে দেখানো নয়। নেপোলিয়নের আক্রমণের ফলে রাশিয়ার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উচ্চ রাজপরিবারে যে পরিবর্তনের প্রবাহ এসেছিল টলস্টয় তার আশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যে-দুটি প্রধান পরিবার রোসটভ এবং পিয়েরে বেজ্জাহোভের—এই দুটি পরিবারকে মূলত কেন্দ্র করে তিনি ওয়র অ্যান্ড পীস লিখেছেন। তাদের সঙ্গে অসংখ্য চরিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে একটা বিপুল মানব ইতিহাসের ছবি ভেসে আসে। বলা হয়েছে 'a complete picture of human life ; a complete picture of the Russia of that day ; a complete picture of everything in which people place their happiness and greatness, their grief and humiliation. That is War and Peace. When the Russian Empire ceases to exist, new generations will turn to War and Peace to find out what sort of people were the Russians'।

ক্রান্তদর্শীর প্রসঙ্গে ওয়র অ্যান্ড পীসকে নিয়ে আসা হল। তার কারণ প্রথম দৃষ্টিপাতে দুয়ের মধ্যে একটা মিল পাওয়া যেতে পারে। দুই উপন্যাসই একটা দেশের কয়েক বৎসর ব্যাপী বহু ঘটনা সমন্বিত রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পটপরিবর্তন নিয়ে লেখা—সেজন্যই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন ক্রান্তদর্শীর মধ্যেও মহাকাব্যোচিত বিশালতা পাওয়া যাবে। অন্নদাশঙ্কর ভারতের একটা সময়ের অস্থিরতাকে এমন করে অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মনে এর সুদূরবিস্তৃত তাৎপর্য, পরিণামের দুর্ভাবনা গেঁথে বসেছিল। সেই সময়টা তাঁর কাছে ইতিহাস নয়, প্রত্যক্ষ। সে সময়ে তিনি কর্মরত এবং ইতিপূর্বেই অন্যান্য উপন্যাস গল্পের সঙ্গে 'সত্যাসত্য'র মতো বৃহৎ উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে। সত্যাসত্য সাধারণ মানব-মানবীর প্রেম-সম্পর্কের কাহিনী নয়—একটা সত্যসন্ধানের কাহিনী—রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ

বা যোগাযোগে যার পূর্বসূরিত্ব। সত্যাসত্যে একটা দার্শনিক সূত্র আছে। কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অন্নদাশঙ্কর যে সত্যকে খুঁজেছেন, বাদলের মধ্যে তার একটা সংহত জিজ্ঞাসা তৈরি করে দিয়েছেন। ক্রান্তদর্শীতে সেরকম কোনো সূত্র নেই। ইতিহাস ঘটে চলেছে, সে-ইতিহাস লেখকের বানানো বা কল্পিত নয়। ঘটনাকে বানিয়ে নিয়ে মনোগত কোনো সত্যানুভব আদর্শ বা চিন্তাকে রূপ দেওয়া যায়। কিন্তু যে ঘটনা লেখক-নিরপেক্ষভাবে ঘটছে তাকে নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী বদলানো যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের মতো উপন্যাস লিখেছিলেন—ইতিহাসই তার কাঠামো। কিন্তু তিনি কিছু কিছু ইতিহাসের ব্যতিক্রমও করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল উপন্যাস রচনা। তিনি রাজসিংহ থেকে শুধু ইতিহাসই কেউ জানুক—এমন প্রত্যাশা বোধহয় করেন নি যদিও তাঁর কঠোর সংজ্ঞানুযায়ী রাজসিংহই একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস কারণ উপন্যাসের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখে যথাসম্ভব ইতিহাসের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর কিন্তু ক্রান্তদর্শীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে রাজি নন। আমার ধারণা এতে লেখকের দুটি সত্তার অস্থিরতাই প্রকাশ পায়। একটি সত্তা অন্নদাশঙ্করের অতি তীক্ষ্ম মননশীলতা, আর একটি সত্তা স্রষ্টার বা শিল্পীর। তিনি বারবারই মনে করিয়ে দেন উপন্যাসের ভূমিকায়—

'উপন্যাস একবার আরম্ভ করলে তার পরে সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। চরিত্ররা মঞ্চে নেমে শেখানো কথা বলে না, এক বলতে গিয়ে আর বলে। এক করতে গিয়ে আর করে। আমার লেখনীও কি আমার বাধ্য? শিকলটা আমার হাতে তবু বন্দি কুকুর আমাকেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেত, আমিই তার খেয়ালমতো চলতুম বা চালিত হতুম। এটাও সেই রকম একটা ব্যাপার।'

এ রকম কথা স্রষ্টাশিল্পীরা বলে থাকেন। আমরা সবাই সেটা মেনে নিই। কিন্তু ক্রান্তদর্শীর প্রসঙ্গে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। টলস্টয় তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের পরিবর্তন করেন নি। তিনি খুব ভালো করে ইতিহাস পড়ে নিয়েই লেখা আরম্ভ করেছিলেন—Tolstoy had read 'with relish' the history of Napoleon and Alexander I of Russia, and immediately found himself enveloped in a cloud of joy. Eager and exhaustive research into his subject, and the writing of War and Peace occupied him to the exclusion of all else for the next five years। কিন্তু ইতিহাস টলস্টয়ের ক্ষেত্রে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। তাঁর কাহিনী মানুষের 'রাজা' জমিদার কৃষক শ্রমিকের। তারা একটা সমগ্র জীবনের শোভাযাত্রা রচনা করে চলেছে।

অন্নদাশংকর নিজে ভারতের যুগান্তরণের সময় পরিণত মনীষা নিয়ে দেখেছেন ; তাঁর দেখা নিছক আর্টিস্টের দেখা নয়। এর মধ্যে ছিল ন্যায়-অন্যায় দুঃখ-বেদনাবোধ, ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গান্ধীজির অহিংসা ও সত্যসাধনার তিনি অকম্প অনুরাগী। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রতিদিন লক্ষ্য করে যাচ্ছেন—এ সব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বেদনা ও অনুভূতি আছে। ইংরেজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও আছে, আবার বিরাগও আছে। য়ুরোপে যা ঘটছে তার খবর তিনি রাখছেন, নিজের দেশে তার প্রতিক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। অন্নদাশংকর জজ ছিলেন তাই সব কিছু নিরপেক্ষভাবে দেখবার অভ্যাস ও সংস্কার তাঁর ছিল, এমন কি মুশলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্ব তিনি না মানলেও জিন্নার যুক্তি তিনি নিরপেক্ষ চিত্তে অনুধাবন করতেন ও তার সপক্ষে যা বলা যায় তাও তিনি বলিয়েছেন চরিত্রের মুখ দিয়ে। কমিউনিস্ট দল গড়ে উঠছে, তার আদর্শও তিনি জানেন, হিন্দু-মুসলমান নিয়ে কংগ্রেসের অস্তিত্বের সংকট কী ভাবে তৈরি হয়ে কোথায় এসে পেঁছিল অন্নদাশংকর তাঁর নিজের জীবনেই দেখেছেন। এই উপন্যাসের মানস চরিত্রটিতে অন্নদাশংকর নিজেকেই প্রতিফলিত করেছেন লেখক হিসাবে তা স্বীকার না করলেও।

সুতরাং অন্নদাশংকরের কাছে পুঁথিপড়া উপাদান সংগ্রহ এটা নয়—নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করা বিষয়। তবে স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পরে লিখতে বসে শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করে অভীষ্ট বই লেখা যায় না। তিনিও টলস্টয়ের মতো প্রামাণ্য বই পড়ে নিয়েছেন—তাঁর একটির উল্লেখ তো নিজেই করেছেন। 'ট্রানসফার অভ্ পাওয়ার' নামক হাজার পৃষ্ঠার এক এক খণ্ডের বই বারো খণ্ড তিনি পড়ে নিয়েছেন। সুতরাং ইতিহাসের সততা রক্ষার প্রতি অন্নদাশংকর সতত নিষ্ঠাবান। তবুও তিনি বলেন কেউ যেন মনে না করে তিনি 'উপন্যাসের ছলে ইতিহাস লিখতে বসেছেন। ইতিহাস আরও বেশি জায়গার দাবি রাখে'। এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু তিনি যে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি, রাজনৈতিক দলগুলির খুঁটিনাটি যুক্তি, তাদের ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া, ইংরেজশাসক চরিত্র, গান্ধী-অনুরাগীদের বক্তব্য এবং আচরণ ইত্যাদি তৎকালীন ঘটনার যথাযথ প্রতিফলন ক্রান্তদর্শীর চরিত্র এবং তাদের সংলাপে ঘটিয়েছেন—এতেই ইতিহাসের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। সমকালীন ইতিহাসকে এমন নিবিড় দৃষ্টিতে দেখাতে তাঁর মনীষা ;—এই মনীষা যে কত বিশ্লেষণধর্মী তার প্রত্যক্ষ পরিচয় তো পাঠক পান তাঁর অজস্র প্রবন্ধের মধ্যেই। অন্নদাশংকরের প্রবন্ধে যে সজীব মৌলিক চিন্তাশক্তির প্রকাশ—বাঙালি পাঠক জানেন তাতে একালের একজন অগ্রণী চিন্তানায়ককেই আমরা পাই। সেই মনীষী অন্নদাশংকরই ক্রান্তদর্শীর

চার খণ্ডের অজস্র সংলাপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। অথচ প্রথমাবধি তিনি নিজেকে শিল্পী বা আর্টিস্ট বলেই চিহ্নিত করেছেন। এখানে অন্নদাশঙ্করের শিল্পসৃষ্টির রহস্য আছে বলে মনে করি। লেখক নিজেই বলে নিয়েছেন যে ভারতবর্ষের একটা স্মরণীয় যুগকে তিনি উপন্যাসে ধরে রাখতে চান। বস্তুত এই যুগ বলতে উপন্যাস থেকে যেটা বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক এবং দলীয় ক্রিয়াকলাপ। যুগের ছবি বলতে যদি বুঝি সাধারণ জনজীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কাহিনীগতভাবে বর্ণনা, তা কিন্তু এতে নেই। এই উপন্যাসে চরিত্র আছে অনেক। কিন্তু সব চরিত্রই অভিজাত ধনী সমাজের। সকলেই ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত— কেউ ব্যারিস্টার কেউ ইংরেজ সরকারে উচ্চপদস্থ অফিসার, কেউ মাঝে মাঝেই বিলেতে চলে যান। কেউ কেউ ভাইসরয় বা তাঁর সেক্রেটারির বন্ধু। মহিলারাও সে রকমই আলোকপ্রাপ্ত এবং এই সমাজের উপযুক্ত আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। এরা সকলেই পরিশীলিত মার্জিত রুচির মানুষ— উচ্ছল, কেউ শান্ত, কেউ নম্র, কেউ স্বল্পভাষী। তবে প্রত্যেকেই দেশের এবং বিদেশের পরিবর্তন নিয়ে চিন্তিত, আলোচনারত। এই পরিবর্তন (বা বিপ্লব যদি বলা যায়) সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সূত্রে এক একটি চরিত্র অভিব্যক্ত হচ্ছে।

চলতি সমালোচনায় যাকে টাইপ চরিত্র বলে, এ-চরিত্রগুলিকে তাও বলা যায় না। টাইপ চরিত্র হল কোনো বক্তব্য বা আদর্শের বিগ্রহ। সে-সব চরিত্র লেখকের প্রয়োজনে ইচ্ছানুসারে আচরণ করে। কোনো চিন্তা-উদ্ভূত তত্ত্ব সপ্রমাণ করবার জন্য সে-সব চরিত্রের সৃষ্টি। তত্ত্ব-বিরহিত মানবিক প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ততায় যে-চরিত্র গতিশীল, সে-চরিত্র টাইপ নয়। এ রকম চরিত্রের বড়ো আকর্ষণই হল তাদের হৃদয়লীলা। মানুষের মনের গভীরে অনেক সংবেদনা, অনেক অভীপ্সার প্রেরণায় চরিত্রের যে আচরণ ও অভিব্যক্তি, সে-সব যেন জীবন্ত মানব চরিত্রেরই প্রকাশ। লেখকের সুচিন্তিত তত্ত্ব সেখানে অবান্তর হয়ে পড়ে। এ রকম প্রায়শই ঘটে যে, লেখক কোনো তত্ত্ব বা আদর্শ বা ঔচিত্যবোধ দেখাতে গিয়েও মানবিক আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততার দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে তোলেন। সেখানে লেখকের সৃষ্টিতে যেন কোনো সচেতন অনুভাবনা কাজ করে না। শিল্পীর এই অবস্থাটাই রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তির মধ্যে প্রকাশিত—'আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে বলিতে দিতেছ কই'।

ক্রান্তদর্শীর দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার গোড়াতেই অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই লাইন উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলছেন—

'প্রবন্ধে আমার কথা আমি অবাধে বলতে পারি, কিন্তু উপন্যাসে আমি যা খুশি লিখতে পারি নে। বাইরের আদেশে নয়, অন্তরের নির্দেশে আমি

এমন সব কথা লিখি যা আমার কথা নয়, যা চরিত্রের কথা। তারা আমার সৃষ্ট হলেও আমার হাতের পুতুল নয়। যে যার স্বভাবের অনুসরণ করে। যার যা নিয়তি। আমি নিজেই ওদের ব্যাপার স্যাপার দেখে বিস্মিত। ওরা আমার ইচ্ছামতো বাঁচবে না, যে যার ইচ্ছামতো বা বিধাতার ইচ্ছামতো বাঁচবে'।

এই কথাগুলি একেবারে বিশুদ্ধ স্রষ্টা শিল্পীর কথা। কিন্তু লেখকের সচেতন চিন্তার বাঁধন ছেড়ে যে 'সব চরিত্র বেরিয়ে আসে, তারা দুজ্ঞেয় হৃদয়' বৃত্তির টানেই বেরিয়ে আসে। এ রকম একটা দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার কেটি। রবীন্দ্রনাথ কেটিকে সচেতনভাবেই ইংগবঙ্গ সমাজের প্রতিভূ করবার জন্য রুজপাউডারের এনামেল মাখিয়ে মুখে সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এত কৃত্রিমতার মধ্যেও হৃদয়ের ব্যর্থতাবোধ চোখের জলরূপে বেরিয়ে এসে তার স্বভাবটাকেই বদলে দিল। চরিত্রের এই সব বর্ণিলতার প্রকাশ হয় ব্যঞ্জনাপূর্ণ সংলাপে ও বর্ণনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমারকে পথিপার্শ্বের এক সরাইয়ে ম্লান দীপালোকে দেখে বিলাসিনী মতিবিবি যখন অতি সংক্ষেপে তার সহচরীর প্রশ্নের উত্তরে বলে 'মেরা শৌহর', তখনও সংলাপের ব্যঞ্জনা জটিল মানবস্বভাবকেই প্রকাশ করে। এরকম বহু দৃষ্টান্ত সাহিত্যে আছে। এই দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয়, সাহিত্যের মূল বিষয় মানবমন, মানবস্বভাব এবং মানবচরিত্র। তার যদি কোনো বক্তব্য থাকে, তবে তা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিরই বক্তব্য। সুতরাং ক্রান্তদর্শী লেখক যখন বলেন চরিত্রগুলি চলে তাদের আপন নিয়মে, সেখানে লেখকের সচেতন প্রয়াস অর্থহীন— তখন এটাই বুঝতে হবে এই উপন্যাসের কাহিনী মানবচরিত্রের কাহিনী, তাদের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, স্নেহপ্রেম আবেগেরই কাহিনী।

এই পর্যন্ত ভাবলেই একটা ভাবনাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। কেননা আমরা তো দেখলাম— লেখকও বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনাধারাই এর মূল বিষয়। চার খণ্ড উপন্যাস পড়ে গেলে এ কথাটা যে পুরোপুরি সত্য, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। তবে এতে যে চরিত্রগুলি আছে, তারা নিজের নিজের আবেগের বশে কতটুকু চলতে পারে? তারা কি লেখকের নিয়ন্ত্রণে নেই? উপন্যাস পড়লে ইতিহাস যে মুখ্যস্থান অধিকার করে রয়েছে, তাতে সন্দেহ থাকে না। এখানেই শিল্পী অন্নদাশংকরের অভিনবত্ব এবং অসাধারণত্ব। আমরা তো রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পড়েছি। তাতে সমস্ত উপন্যাসটিকে একটি বক্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছি। এই পরম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনেক দ্বন্দ্বসংকুল প্রতিবাদী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চরিত্রকে চালিত করে নিয়ে যেতে হয়েছে। এ-রকম এক

একটা পরিস্থিতিতে নানা তর্কবিতর্ক তত্ত্বকথা উত্তাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে-তত্ত্ব ইতিহাসের তথ্য নয়, লেখকের আইডিয়া। এবং সে আইডিয়া রূপ পাচ্ছে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে, জাতীয়তাবাদ বিদেশীয়ানার সংঘর্ষে। সব মিলিয়ে গোরা গোরা-সুচরিতা বিনয়-ললিতার মানবিক কাহিনী। ক্রান্তদর্শীতেও আছে মানবিক অর্থাৎ ব্যক্তি-মানুষের কাহিনী। মিলি আর জুলি দুই বন্ধু। দুজনেরই মনোবাসনা ছিল গান্ধীর আদর্শে উৎসর্গীত সৌম্যকে স্বামিরূপে পাওয়া। কিন্তু মিলি অপেক্ষা করতে পারল না, সে বিবাহ করল সুকুমার দত্ত বিশ্বাসকে ; আবার সুকুমার দত্ত বিশ্বাসের মনের গভীরে ছিল জুলিকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। জুলি ছিল বিধবা, কিন্তু গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সৌম্যর জন্যই তার প্রতীক্ষা। অবশেষে গান্ধীর অনুমতি নিয়ে সৌম্যকে বিবাহ করল, সন্তানের জননীও হল, কিন্তু বরণ করে নিল গান্ধীজির নির্দেশে পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষের সেবাব্রত। শেষ পর্যন্ত দুই সখির মধ্যে থেকে গেল একটা ক্ষীণ সন্দিগ্ধতা। এই কাঠামোতে উপন্যাসের মানবিক কাহিনী পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে গিয়েও পূর্ণাঙ্গ হল না। তার একমাত্র কারণ, যুগান্তরণের ইতিহাসের বিপুলতা এই মানবিক কাহিনীকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আবার এই ইতিহাস এবং তার জটিলতাকে আমরা জানি নানা চরিত্রের মুখে তাদের আলাপে আলোচনায়। একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলার একটা বাধা এই যে ইতিহাসের ঘটনাকে আমরা আমাদের চোখের সামনে ঘটতে দেখি না, ঘটতে শুনি মাত্র। মানবিক কাহিনী-ভাগে যারা মুখ্য তাদের হৃদয়বৃত্তি অনেকটা যেন নিয়ন্ত্রিত এবং রূপায়িত হয়েছে এ-সময়ের ঘটনা এবং পরিস্থিতির দ্বারা আবার এই কাহিনীর আশেপাশেও যে অসংখ্য চরিত্র তাদের কোনো ব্যক্তিরূপ নেই, তাদের রেখাচিত্র ফুটিয়ে তুলেছে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের শেষ পর্যায়ে চাকরি ব্যবসায় ওকালতি ডাক্তারি ইনজিনিয়ারিং প্রভৃতি ক্ষেত্রের নানা মানুষের রাজনৈতিক ভাবনা। তাদের ব্যক্তিজীবন যেন রাজনৈতিক সমস্যারই এক এক রূপ। উপন্যাসে মানুষের চরিত্র কি কেবল হৃদয়লীলাতেই প্রকাশ পায়? রাজনৈতিক চিন্তা দিয়েও এক এক চরিত্ররূপ গড়ে উঠতে পারে। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা হয়ে গেছে টাইপ। এদের কোনো প্রেম ভালোবাসার ব্যক্তিসমস্যা নেই, রাজনৈতিক চিন্তা দিয়েই এদের চরিত্রসৃষ্টি। অন্নদাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে রাজনৈতিক চিন্তা দিয়েই তিনি উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি করেছেন। সেই যুগান্তরণ-সময়ে জাতীয় জীবনে যে-অজস্র দিক দিয়ে ব্যক্তিকে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সমস্যা ভিড় করে এসেছিল— মনীষী অন্নদাশঙ্কর উজ্জ্বল প্রবন্ধে তার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আর শিল্পীরূপে তিনি সৃষ্টি করেছেন ক্রান্তদর্শীর চরিত্র-

শক্তিকে। তিনি যে বলেন চরিত্রসৃষ্টি কালে তিনি অসহায়— তার অর্থ এই যে সময়ের হাতেই এ-সব চরিত্র তৈরি হয়ে উঠছে, সেখানে ভাবুক অন্নদাশঙ্করও যেন ইচ্ছে করলেই তার ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন না। এই চলিষ্ণুতার মধ্যে অন্নদাশঙ্কর যেমন নিরপেক্ষ থেকেছেন, তেমনি তাঁর নিরপেক্ষতার ভিতর দিয়েই আদর্শবাদের ধ্রুব শিখাটি সমগ্র উপন্যাসকে আলোকিত করে রেখেছে। সৌম্যই তার সংহত রূপ; সৌম্যের জীবনবাণীই লেখক অন্নদাশঙ্করের বাণী। সবাই যেমন যার যার মতো পথ খুঁজে নিল, সৌম্য চলল গান্ধীর মতোই নিঃসঙ্গ একক অভিযাত্রার দুর্গম পথে।

তাঁর ইচ্ছে ছিল উপন্যাসের নাম দেবেন পুনর্নবীকরণ, ইংরেজি প্রতিশব্দ রিনিউয়াল। তা হয়নি। আশির কাছাকাছি পেঁৗছে তিনি এই বৃহৎ উপন্যাস শুরু করেছিলেন তরুণের উৎসাহ নিয়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নয়, মানুষের কথা। মানুষের তো জরা নেই, তাকে যে বারবার নতুন হয়ে উঠতেই হয় সেটাই তার বেঁচে থাকার ধর্ম। ভারতবর্ষও ভেঙে গিয়েও আবার নতুন করে জাগবে নতুন জীবন নিয়ে চিরন্তন আদর্শকে নিয়ে— তার পথ দেখিয়ে গেলেন মোহনদাস গান্ধী যাঁর বিশ্বাস কোনোদিনই টলবে না। মানুষ তাই নিয়েই বারবার নতুন হয়ে উঠবে। তাই অন্নদাশঙ্কর তাঁর কাহিনীর নাম রাখলেন ক্রান্তদর্শী— উদ্দিষ্ট অর্থ কিন্তু পালটাল না।

রত্ন ও শ্রীমতী : যোগ আর ভোগ

বিজিতকুমার দত্ত

অন্নদাশংকর রায় বলেছেন — তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথ, দান্তে, চণ্ডীদাস এবং গ্যেটে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছেন। এক সময়ে গান্ধীও তাকে প্রভাবিত করেছিল। টলস্টয়ের কথা একটু বেশি করে বলেছেন রত্ন ও শ্রীমতী উপন্যাসের ভূমিকায়। টলস্টয়ের জীবনের দুটি সুস্পষ্ট ভাগকে তিনি বলেছেন চণ্ড টলস্টয় ও ধর্ম টলস্টয়। চণ্ড টলস্টয়েরই লেখা আনা কারেনিনা। অন্নদাশংকর বলেছেন তিনিও বাংলায় একটি 'আনা কারেনিনা' সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তত্ত্বচিন্তা ভালো, তত্ত্ব জীবনে আসে। কিন্তু নিছক তত্ত্ব লেখকের কাছে নীরস তরুবর। যেমন আনা কারেনিনা। রায়ের ভাষায় সম্ভবত বলা চলে যেমন 'রত্ন ও শ্রীমতী'।

রত্ন ও শ্রীমতী মূলত প্রেমের উপন্যাস। যাঁদের প্রভাবের কথা তিনি বলেছেন তাঁদের মতো করে কিন্তু অন্নদাশংকর উপন্যাসটির গঠনকর্মে মনোযোগী হলেন না। চণ্ডীদাস যখন রাধাকৃষ্ণের কথা বলেছেন তখন তিনি সমাজের পরিবেশকে ভুলে যাননি। দান্তে বিয়াত্রিচের দ্বারা বার বার ভর্ৎসিত হয়েছেন। গ্যেটের কাব্যকথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র তাঁর নিজের প্রেমের কাহিনীগুলি যদি খুঁটিয়ে দেখি তাহলে পাব একটি অতৃপ্ত মানুষ যৌবনের তাড়নায় কেবলই ভালোবাসাকে খুঁজে চলেছেন। অন্নদাশংকর রত্ন ও শ্রীমতীর প্রেমকে একেবারে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন যেন প্রথম খণ্ডে। রত্নর জীবনে প্রেমের স্পর্শে যখন জানালাগুলি একের পর এক খুলে যাচ্ছিল তখন বন্ধু প্রভাত ছাড়া আর কেউ সাক্ষী ছিল না। বাংলার বাইরে কলেজে পড়তে পড়তে প্রেমে পড়া এমন কিছু অভিনব ঘটনা নয়। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে সদ্যযৌবনের স্পর্শে দেহের রোমাঞ্চ ধীরে ধীরে মোহ আর মায়ার জগৎ গড়ে তোলে। যেন বৃক্ষ অংকুরিত হচ্ছে, কুঁড়ি আসছে, পুষ্ট হচ্ছে, পাপড়ি মেলছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে আর চন্দ্রের আলোয় খুশিকে মেলে ধরছে।

আমরা তো জানি বৃক্ষ জন্ম আর তার পরিণামরমণীয় রূপ একদিনেই গড়ে ওঠে না। মানসমুকুলকে (নিঠুর গরজি তুই মানসমুকুল ভাজবি আগুনে / তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহুনে?) ফোটাতে গেলে

অপেক্ষা করতে হয়। রত্ন ও শ্রীমতীর উত্তাপভরা চিঠির পর চিঠি পেয়ে ফুলন্ত হয়ে উঠছিল। রত্নর টানাপোড়েন এই পর্বে এমন নয় যে দুঃখে-বেদনায় জর্জরিত হচ্ছে। কেবল চিন্তা, জাগরণ আর উদ্বেগ মাঝে মাঝে তাকে বিব্রত করে। কিন্তু এমনি করেই তার প্রেমের পথ খুলতে থাকে। তাই নিয়ম। বৈষ্ণব পদকর্তারা তাই বলেছেন। পূর্বরাগ থেকে অনুরাগ। অনুরাগে রূপতৃষ্ণা আছে, আক্ষেপ আছে। তপ্ত ইক্ষু না যায় তাকে ফেলা, না যায় তাকে গ্রহণ। রত্ন একেবারে প্রেমবৈচিত্ত্যে পৌঁছতে চায়। বস্তুত অন্নদাশঙ্কর রায় রত্নের অভিজ্ঞতাকে বৈষ্ণব পদাবলিতে, বৈষ্ণব দর্শনে বিস্তৃত জগৎকে তুলে আনতে চেয়েছেন এই বইতে। একটি ভাষাও তৈরি করেছেন অন্নদাশঙ্কর রত্নর সেই জগৎকে উদ্ভাসিত করবার জন্যে। বাল্মীকি যেমন বলেছিলেন এ আমি কি রচনা করলুম, বড় বিস্ময় লাগে সেইরকম বোধ করি অন্নদাশঙ্কর তাঁর ভাষা আর বিষয়কে অভাবিতপূর্ব করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাল্মীকির জগতের ভাষা এ নয়, অনেকটা চণ্ডীদাসের যুগের ভাষাকেই তিনি আয়ত্তে আনতে চেয়েছেন। 'জপিতে জপিতে নাম অবশ হইল' এরকমই একটা পুনরাবৃত্তি ভাষায়ও এসে গেছে। রত্নর পত্রগুলি বড়ই স্পর্শকাতর। রাধা আর কৃষ্ণের তুলনা বারবার দিয়েছে রত্ন তার চিঠিতে। প্রথমে রাখিবন্ধনের ভাইবোন পাতানো দিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রেম। বোধ করি তারও আগে সলতে পাকিয়েছে রত্ন শ্রীমতীর অসহায় অবস্থার কথা জেনে। মধ্যযুগের নাইটের মতোই কি তার চিত্তে প্রণয়িনীকে উদ্ধারের বাসনা যোদ্ধাবীর তৈরি না করে প্রেমের বীর তৈরি করে তুলেছিল।

শ্রীমতী চিঠিতে তার স্বাধীন মতামতকে কীভাবে সমাজশাসনের নিষ্ঠুর অভিশাপ পর্যুদস্ত করেছিল তার বিবরণ দিয়েছিল। সমাজ তাকে নিরাপত্তা দেয়নি। পুরুষ কেবল তার দেহকেই চেয়েছে। যার সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়েছিল সে জমিদার তনয় কেবল তাকে ভোগ করতেই চেয়েছে আর চেয়েছিল সন্তান— উত্তরাধিকার। রত্নর যন্ত্রণার শুরু বোধ করি এখান থেকে। মধ্যবিত্ত মানুষ রত্ন। ভাবনার জগতে বাস করে সে। কোনো বাধাকেই সে বাধা বলে মনে করে না। নিজের স্বাধীন মতামত সে ব্যক্ত করে। দ্বিধা যেমন আসে, কেটেও যায় তেমনি। অন্নদাশঙ্কর প্রথম পর্বে রত্নকে কোনো বাস্তব দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে দেন না। বন্ধু প্রভাত মাঝে মাঝে তাকে সাবধান করে বটে কিন্তু রত্নকে তা স্পর্শ করে বলে মনে হয় না। খুঁটিয়ে দেখলে দেখতে পাব শ্রীমতী খুব সন্তর্পণে এগিয়েছে। তার প্রত্যেকটি চিঠিতে প্রতিরোধের ইঙ্গিত আছে। শ্রীমতী আকর্ষণ অনুভব করে কিন্তু অবাঞ্ছিত বিবাহিত জীবনের বন্ধনকে ছিঁড়তে সে পারে না অথবা চায় না। অথচ রত্নের আবেগ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

রত্ন কেবলই তার আইডিয়ালের সঙ্গে শ্রীমতীকে মেলাতে চায়। আগে যে নাইটের (Knight) কথা বলেছি তার দৃষ্টান্ত নিই: 'তুমি আমার কে, আমি তোমার কে, এ-গণনা তখন নয়। তখন আমি নাইট। নারী বিপন্ন। আমি তার পাশে। যেমন রোগী মূর্ছিত। ডাক্তার তার পাশে।' বলা বাহুল্য বিশ শতকের কোনো নায়কের নাইট হবার সুযোগ নেই, যেমন মহাকাব্যের নায়ক প্রত্যাশিত নয় একালে। কিন্তু আইডিয়ালকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আছে মৃত্যু, আছে দুঃখ তবুও অনন্ত জাগে। এই অনন্তের কোনো এলডোরেডো আছে কি? রত্নর কাছে আছে। সে কেবলই এলডোরেডোর রাস্তায় সোনার বল খুঁজে বেড়ায়। এক ধরনের নসটালজিয়ায় রত্ন বিভোর হয়ে থাকে। সেজন্যে তার নামজপ। একদিন শ্রীমতী গোরী হয়ে যায়। রত্ন আর গোরী। রত্নগোরী। রত্ন তার অভিমান (যা ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জড়িত) ত্যাগ করতে পারছিল না। অবান্তর হলেও বোধ করি এটাই সত্য যে আমরা নিঃশর্ত ভালোবাসতে পারি না। সার্ত্র বলেছেন আমিত্বকে বর্জন করা যায় না। কিন্তু রত্ন পৌঁছে যেতে চায় অন্য ছকে। তার আত্মাভিমান গেল। তখন সে গোরীর প্রেমের মর্ম উপলব্ধি করল। রস আস্বাদন করল। গোরীর প্রেম রাধার প্রেমের মতো শুদ্ধ প্রেম। নিকষিত হেম। এ কি সেই 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম / কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম'? আমরা আরও লক্ষ করি আস্বাদন শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের ব্যাকুলতা লক্ষণীয়। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় সেকথা চমৎকারভাবে উন্মাটিত হয়েছে। রত্ন গোরীর চিঠি পায়। গোরীও রত্নকে নাইটের আসনে বসায়। কীসের জোরে? অবশ্যই প্রেমের। গোরী লেখে 'তোমাতে আমাতে দেহপ্রাণ সম্পর্ক। এ-ও একপ্রকার বিবাহ'। গোরীর পত্রের ভাষায়ও বৈষ্ণব-ভাবনা উঠে আসে। জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি। গোরী বলেছে রত্ন হচ্ছে প্রাণ, গোরী দেহ। এই দেহপ্রাণের একাত্মতা চণ্ডীদাসে যেমন আছে তেমনি দুয়ে মিলে যে এক এ-তত্ত্বও বৈষ্ণবসাধনায় মান্য। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি, হ্লাদিনী শক্তি, কৃষ্ণরাধা 'একাত্মনৌ'। রত্ন আর গোরী মিলে এক দেহ। কলিকালে দুয়ের সৃষ্টি। এর কারণ প্রেমেরই মহিমা আস্বাদন। উজ্জ্বল রসের এই ব্যাখ্যা। রাধা পরকীয়া, গোরীও পরকীয়া। পরকীয়া প্রেমে রসের উল্লাস। এ প্রেম যেন শাশ্বত কোনো নারীর ছবিকে কেন্দ্র করে। এক সময়ে নারীও যেন এক স্বপ্নলোকের বস্তু হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'তুমি যে তুমিই ওগো সেই তব ঋণ / আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন'। রত্ন লেখে গোরীকে 'প্রেম, তোমার মতো প্রিয় আমার কেউ নেই। তুমি আমার স্বকীয়া। আমি তোমার স্বকীয়'। এখানে পদাবলির প্রেমভাবনার

সঙ্গে গরমিল। এ গরমিল ঘটছে রত্নর আত্মভাবের প্রক্ষেপে। আপাতত চিত্রদর্শন (গোরীর পাঠানো ফটো) আর নাম শ্রবণের মধ্য দিয়ে তার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি। পারিভাষিক অর্থে স্বকীয়া কথাটি এখানে সম্ভবত ব্যবহৃত হয়নি। বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমভাবনার আধুনিকীকরণ ঘটল এখানে। অন্নদাশঙ্করও প্রেমের যেন একটি নূতন তত্ত্বের সন্ধানে চলে এলেন একেবারে তাঁর সমকালে।

॥ দুই ॥

অন্নদাশঙ্কর দান্তের প্রসঙ্গ এনেছেন। 'সাক্ষাৎকার'-এ তিনি 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র ভূমিকায় যা বলেছেন আমরা দান্তের উপস্থিতি দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ দান্তের জীবনকে 'স্বপ্নময় কবির জীবন' বলেছেন। মধ্যযুগীয় ইতালির এই কবি বিয়াত্রিচের স্পর্শে জেগে উঠেছিলেন। প্রায় একই বয়সের এই প্রেমিক প্রেমিকার কাহিনীতে প্রেমের উন্মেষ থেকে বিকাশ, সংশয় এবং প্রেমে স্থিতির যে প্রকাশ দেখতে পাই তা কেবল দান্তের নয় ইতালির নবজাগরণের সঙ্গেও অন্বিত। দান্তের 'ভিটা নুওভা'-কে 'a new form of consciousness' বলেছেন সমালোচক। একে ব্যাখ্যা করে সমালোচক বলেছেন 'mighty step towards the consciousness of its own secret life'। অন্নদাশঙ্কর রায় জীবনের এই নিভৃত চৈতন্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসে। রত্নের পত্রাবলিতে আমরা পাই এই চৈতন্যের ক্রমবিকাশ। শ্রীমতীর প্রেমকে আমরা বোধ হয় ব্যাখ্যা করতে পারি যা শেলী দান্তে সম্বন্ধে বলেছিলেন। শেলী বলেছেন: 'The freedom of women produced the poetry of sexual love. Love became a religion, the idols of whose worship were ever present'। এই স্বাধীনতাই চেয়েছিল শ্রীমতী। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল সে। ভিটা নুওভা-তে দান্তের প্রেম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল। বিরহের দীর্ঘশ্বাস প্রেমের বিচিত্র আলপনা এঁকেছিল। কিন্তু সংশয়ে একবার আচ্ছন্ন হলেও তাঁর বিয়াত্রিচের প্রতি প্রেম ছিল স্থির। কমেডিয়াতে দান্তে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। কারও কারও মতে এরিস্টটল কথিত পারগেশনের সঙ্গে দান্তের পুরগেতোরিও-র সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। যাই হোক, দান্তে মানুষের পাপকে শোধন করতে চেয়েছেন এবং সম্ভব হলে তার ঊর্ধ্বায়ণ। কমেডিয়াতে বিয়াত্রিচের সঙ্গে দান্তের যখন সাক্ষাৎ হল তখন দান্তের উচ্চারণ এইরকম 'একি রহস্য একি আনন্দ নূতন ভুবন জুড়ে / মহান্ বৃত্ত— দিব্য প্রতিমা তারি পরে সমাসীন / ডানা মেলে নয়, উত্তরণের

সৌরিশিখরচূড়ে / এসেছি সহসা রৌদ্রাভিসারে, দেখেছি অন্তহীন / আবর্তরত আলোকচক্র। নিহিত বহুতাপিয়া / অন্তরে সুধাসিঞ্চিত করে দিগন্তে বিস্তৃত/ প্রেমের মন্ত্রে চলে চরাচর সূর্য চন্দ্র তারা'। অন্নদাশঙ্কর রায় দান্তেকে কীভাবে স্মরণ করেছিলেন জানি না। আমাদের মনে হয়, রত্ন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে অদেখা শ্রীমতীকে যে বার্তা পাঠিয়েছিল তাতে এই ব্যাপ্তি এই গভীরতা নেই। রত্ন স্বাধীন প্রেমে বিশ্বাসী। ব্যক্তির স্বকীয় ভাবনার বাইরে যেন আর কিছুই নেই। প্রজ্ঞা আর অনুভূতি দান্তের কাব্যে। রত্নর আবেগে হৃদয় মুখ্য হয়েছে, প্রজ্ঞার প্রভা তেমন করে আলোকিত হয় না। যদিও বা তার সেইজন্য আত্মার (দান্তে হৃদয় এবং আত্মা— দুয়েরই কথা বলেছেন) স্ফুরণ সেখানে দেখি না।

আমরা বুঝতে পারি রত্ন (অন্নদাশঙ্করও) কেন রাধা আর কৃষ্ণের প্রতীকে সান্ত্বনা আর স্বস্তি পায়। বস্তুত ভেবে দেখলে বৈষ্ণব অলংকার-শাস্ত্র কেবল অভিনবই নয় প্রেমতত্ত্বের দলিলও বটে। এর আগে আমরা ভারতীয় সাহিত্যে (বুদ্ধদেব বসুর 'মেঘদূত' প্রসঙ্গ মনে রেখেই বলছি) প্রেমের এই মহিমা, প্রেমের তরঙ্গে তরঙ্গে জীবনের উদ্‌ভাবন আমরা ঠিক পাই না। কিছুটা সাজানো ব্যাপার বলে মনে হয়। বৈষ্ণবীয় ভাবনায় প্রেমই যখন একমাত্র বাঞ্ছাকল্পতরু বলে সিদ্ধ তখন প্রেমশাস্ত্র নূতন মাত্রা পায়। শেলীর কথাই সত্য— প্রেমই হচ্ছে ধর্ম। রত্ন প্রেমের পূজারী। প্রথম পর্বের শেষে সে প্রার্থনা করেছে তুমি নাও, যত পার নাও। হৃদয়ের এই ব্যাপ্তি প্রেমের দান। আমরা বলতে পারি বৈষ্ণবপদাবলি রোমান্টিক। এই রোমান্টিসিজম সীমিত অর্থে ক্লাসিসিজমের থেকে দূরে সরে আসে, সময়ে সময়ে বিদ্রোহও করতে চায়। রত্নও কি বিদ্রোহ করতে চায়নি। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাকেও তো মালাদির আনুগত্য পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। স্বাধীনতা-কে সে অর্জন করেছিল। দান্তে অন্নদাশঙ্করকে অভিভূত করেছিল কিন্তু দান্তের ভাবনা বৈষ্ণব পদাবলির খাতে এসে এক ধরনের নম্রতায় বড়োই বিনীত হয়ে পড়ে। রায় রামানন্দের সাধ্যসাধন তত্ত্বে রাধার স্বরূপ সর্বসাধ্য শিরোমণি। জ্ঞানের দ্বারা এখানে পৌঁছোনো যায় না। জ্ঞানের সামান্য স্পর্শও পরিত্যাজ্য। তাহলে থাকে ভক্তি। রত্ন এই ভক্তি গদ-গদচিত্ত শ্রীমতীকে প্রেম নিবেদন করেছিল। দান্তের প্রেমেও বিয়াত্রিচে সর্বসাধ্য শিরোমণি যে পুরগেতোরিংকে স্পর্শ না করেই স্বর্গলোকে পৌঁছে গিয়েছিল। রাধাকে আমরা বৈষ্ণবীয় ভাবনায় সেইভাবেই দেখি। পাপ-পরিত্রাণের আইডিয়া পদাবলিতে নেই। দান্তে একরকমভাবে মুক্তি চেয়েছিলেন। জীব রাধাকৃষ্ণ প্রণয়মহিমা আস্বাদনের মধ্যেই সেই মুক্তিতত্ত্ব লাভ করেছিল। বৈষ্ণবীয় এই ভাবনায় এখানে আমরা কিছুটা থমকে যাই।

কেননা বৈষ্ণবরা বলেছেন জীব কৃষ্ণের শক্তিরই একটি অংশ বটে কিন্তু সে তটস্থ। সমুদ্রের মাঝখানে যে সৌন্দর্যলোক সেখানে যাবার অধিকার নেই। তটে থেকে সেই সুধামাধুরী আস্বাদন করে জীব। চৈতন্য অবশ্য কৃষ্ণনামেই সকলকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেখানে পুরগেতেরিও-র যন্ত্রণা বা মর্মান্তিক কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ফ্রাঞ্চেস্কা পাওলার কাহিনী নেই। শ্রীমতীর যৌবনের নিষ্ফলতার কথা শুনে অথবা তার স্বাধীন সত্তার যশোবাবুর, ডাক্তারের পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যেতে দেখে রত্ন বেদনা অনুভব করেছে কিন্তু সে যন্ত্রণার তাপ তার গায়ে লাগলেও তার স্মৃতিসত্তা থেকে উদ্ভূত নয়। রত্নর বোধ বৈষ্ণব পদাবলির পূর্বরাগের-অনুরাগের, তার অভিজ্ঞতা রাধাকৃষ্ণ যুগল সাধনার এবং পরবর্তী কালে দেখতে পাব শ্রীমতীর সন্তান সম্ভাবনা এবং সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সে শ্রীমতীকে স্বকীয়া রূপে এবং নিজেকে স্বকীয় রূপে ভেবেছে। যদিও তৃতীয় খণ্ড রচনার দিক থেকে বেশ দুর্বল।

॥ তিন ॥

অন্নদাশঙ্কর টলস্টয়ের কথা যে বারবার বলেছেন সেকথা আগে বলেছি। টলস্টয়ের সূত্রে গান্ধীজিও উঠে আসেন। যে সময়ের ঘটনা উপন্যাসে উপস্থাপিত তাতে শ্রীমতীর স্বদেশচর্চার একটা প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। আত্মবোধের কেন্দ্র থেকে ছিটকে পড়ে শ্রীমতী কিছু একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায়। পড়ে যায়নি সে নিজেই বেছে নিতে চেয়েছিল রাজনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তাকে। সে যখন তার মণ্ডলটিকে ঘিরে উত্তেজনায় থরোথরো তখন গান্ধীজির সিদ্ধান্ত তার আশা পূরণে ব্যর্থ হল। সুতরাং শ্রীমতীর স্বদেশচর্চা সেকালটিকে চকিত করে বটে কিন্তু শ্রীমতী বা ললিতের জীবনে তার কোনো প্রভাবই দেখতে পাই না। অবশ্য গান্ধীজির আন্দোলনের প্রয়োগের একটা দিক জ্যোতি-রেবার গঠনমূলক, পল্লী উন্নয়ন ব্রতের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এমন কী রত্নর ভাইয়ের চাষবাস সম্বন্ধে, জমিচর্চার পরিকল্পনার মধ্যে অন্নদাশঙ্কর গান্ধীবাদের প্রয়োগের পরীক্ষা করেছেন। প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির মানুষ জ্যোতি রত্ন ও শ্রীমতীর জন্যে ভেবেছে, সমাধান সূত্রও বার করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তা কাজে লাগল না। শ্রীমতীর বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না তার সন্তানসম্ভাবনা বলে আর রত্ন তখন বাস্তব পরিবেশে থেকেও কেমন যেন পরিধির বাইরে থেকে যাচ্ছে। শ্রীমতীর মা সুমতি তো একদিন গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল রত্নকে। সংসারী সুমতি শ্রীমতী রত্নাকে বুঝতেই চায়নি।

অন্নদাশঙ্কর প্রভাতের মুখ দিয়ে একটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন যা বৈষ্ণব

তত্ত্বের ধার ঘেঁষে যায় আবার একালকেও সম্পূর্ণ মেনে নেয়। প্রভাত বলে 'বহু বিবাহের নয়। বহু বিহারেরও নয়। আমার পরিকল্পনায় রামের গৃহিণী হবে শ্যামের প্রেমিকা আর হরির নায়িকা। শ্যামের গৃহিণী হবে হরির প্রেমিকা আর রামের নায়িকা। হরির গৃহিণী হবে রামের প্রেমিকা আর শ্যামের নায়িকা। তেমনি রাম হবে মালতীর স্বামী আর মাধবীর কামী আর মল্লিকার প্রেমী। শ্যাম হবে মাধবীর স্বামী আর মল্লিকার কামী আর মালতীর প্রেমী। হরি হবে মল্লিকার স্বামী আর মালতীর কামী আর মাধবীর প্রেমী। তাহলে সকলেই সুখী। সকলেই সমৃদ্ধ।' প্রভাতের কথায় আতঙ্কিত রত্নকে প্রভাত আশ্বাস দিয়েছিল এই তিন সেট ব্যবস্থা এখনই প্রবর্তিত হবে না কালক্রমে হবে।

স্বামী, কামী, প্রেমী এই তিন সেট ব্যবস্থা রত্ন মেনে নিতে পারে না। তার সাধনা রসের সাধনা। সেই রসকে আশ্রয় করে রূপের জগতে পেঁছিবে। আবার বৈষ্ণবপ্রাণতা। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে আকর্ষণ করেন তাঁর বেণুমাধুর্য আর রূপ-মাধুর্যের দ্বারা। রত্ন হতে চেয়েছে কান্তার রূপে কান্তিমান। সেই রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ। প্রভাতের ভাবনায় ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিচয় পরিস্ফুট। রত্নর ভাবনায়ও ব্যক্তিস্বাধীনতা স্পষ্ট। কিন্তু সমাজ প্রভাতকে ঠাঁই দেবে না, এমন মনে হয়। নারী স্বাধীনতার এই কালেও এ ভাবা যায় না। লিভ টুগেদারও একে স্বীকার করবে না। প্রভাতের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই তা একান্তই অবাস্তব বলে। কৃষ্ণের রাসলীলা এবং রাধাপ্রণয়ের কথা অথবা রুক্মিণী সত্যভামার প্রসঙ্গও এ ক্ষেত্রে মনে পড়তে পারে। স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্বও ব্যাখ্যা করা যায় না এইভাবে। রত্নর প্রেম তো সেই পর্যায়েরই নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতায় সে বিশ্বাসী। এই তৃষ্ণা নিয়েই সে এগিয়ে যায় পেছিয়ে আসে।

এখানেই বোধ করি আনা কারেনিনার প্রসঙ্গ চলে আসে। The Oblonsky home was in turmoil. The wife had discovered that her husband was having a love affair with former French governess and she told him she could no longer live under the same roof with him। রত্ন ও শ্রীমতী উপন্যাসে শ্রীমতীর স্বামী যশোমাধবও অন্য নারীতে আসক্ত। সুধার সঙ্গে তার দেহের সম্পর্ক। কিন্তু অবলনস্কির স্ত্রীর মতো শ্রীমতী তাতে যে খুব বিচলিত তা মনে করতে দেননি ঔপন্যাসিক। বরং সুধাকে সে চাইছে স্বামীর ভোগতৃষ্ণা মেটাবার জন্য। যশোবাবুর প্রতি তার বিরূপতা এতই প্রবল যে সে এই অস্বাভাবিক জীবনকে কাম্য বলে মনে করে। নাকি সমাজ শাসনের নিষ্ঠুর অভিশাপ? টলস্টয়ের আর একটি উদ্ধৃতি এখানে জরুরি। চণ্ড টলস্টয়ের। Prince

Chechensky had a wife and family—grown boys in the Corps of Pages—and he had another, illegilimate family where he also had children. Excellent as was the first family, prince Chechensky felt happier in the second one। স্বামী এবং কামীর পরিচয় পেয়ে যাই আমরা। অভিজাত সমাজের এই চেহারা টলস্টয়কে নিশ্চয়ই তৃপ্ত দেয়নি। তাছাড়া কামীর সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনা আছে। রাষ্ট্র তার জন্য নিরাপত্তা দিলেও পিতার সঙ্গে তাদের সম্পর্কটিই বা কী হবে। একথা ঠিক টলস্টয়ের সময়ের ভাবনার সমাধান ইউরোপ এক রকম ভাবে করেছে।

টলস্টয় আসলে সমাজ সমস্যারূপেই একে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী কামী প্রেমী স্ত্রীলোকের পক্ষেও সমান সত্য হবে প্রভাত এইটিই বলতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই। যে স্বামী তার মধ্যে হয়ত ভোগাকাঙ্ক্ষা কিংবা প্রেমের ব্যাকুলতা নেই, সেইরকম যে প্রেমী বা ভোগী তার মধ্যে হয়ত স্বামিত্ব কিংবা ভোগবাসনা নেই। এটা কি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখব ? ভারতবর্ষ কি এইভাবে দেখেছে ? টলস্টয় কিভাবে দেখেছেন। আনা কারেনিনা উপন্যাসে লেভিন আইভান এবং তার স্ত্রী-র দাম্পত্য জীবন লক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছিল, তার দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। লেভিন idle, artificial, highly individual sort of life-কে এক শ্বাসরোধকারী জীবন রূপে গণ্য করেছিল। সে বিশুদ্ধ প্রেমের কাঙাল হয়ে পড়েছিল। লেভিন বাউল নয়, অভিজাত সমাজের মানুষ। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে সে রত্নর মতোই বাউলপন্থী হয়ে যায়। সাধারণ একজন চাষি তাকে মুক্তির আনন্দ দেয়। রত্ন প্রভাতকে লালন ফকিরের গানের ছত্র তুলে প্রেমের স্বরূপ বোঝাতে চেয়েছিল 'চাতকের এমনি ধারা / তৃষ্ণায় জীবন যাবে রে মারা / তবুও অন্য বারি খায় না তারা / মেঘের জল বিনে'। শ্রীমতী ছাড়া অন্য কোনো 'বারি খায় না' রত্ন এবং শ্রীমতী। টলস্টয় এমন কথা বলবেন না হয়ত। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের বাউল ভাবনার প্রতি স্পর্শকাতরতার কথা আমরা জানি। বাউল সহজিয়া, রত্নর প্রেমও সহজিয়া। বলাবাহুল্য সহজিয়া সাধনায় উত্তরণ কঠিন। আধুনিক যুবক রত্ন কঠিন মূল্য (চিন্তার জগতে) দিয়ে এর নিরসন করেছিল। উপবাসী মন শেষ পর্যন্ত তৃষ্ণার জল খুঁজে পেয়েছে। উপন্যাসটিতে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ হালকাভাবে বর্ণনা করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। এখানে টলস্টয় এবং গান্ধীজির চিন্তাভাবনার প্রক্ষেপ আছে। জ্যোতি শ্রীমতীকে যে ভালোবাসত (শ্রীমতীও, কিন্তু গ্রহণে বিমুখ) গান্ধীজির মতো আশ্রমের ব্যবস্থা করে। রত্নর ভাইয়ের সঙ্গে জ্যোতির কথাবার্তায় বাংলার কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তনের সন্ধান দেয় ওই গান্ধীজির প্রদর্শিত পথে। জ্যোতিই শ্রীমতীকে

ভারতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে পরে তা পরিত্যক্ত হয়। রত্নও জ্যোতির কিছু কিছু সমাজ সংস্কার ব্যবস্থা মেনে নেয় কিন্তু তার উৎসাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শ্রীমতীর সঙ্গে ব্রহ্মদেশে মিলিত হবার বাসনাও তার ছিল, কিছুটা উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমরা বারবারই দেখি রত্ন তার আইডিয়ালের খোলশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। আসলে বাস্তবের মুখোমুখি রত্ন যখনই হয়েছে তখনই সে তা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে।

রাজনৈতিক পরিবেশ থাকলেও তাকে লেখক খুব গুরুত্ব দেননি। এমন কী আশ্রমের কোনো বাস্তব রূপ আমরা পাই না। কেবল বুঝতে পারি জ্যোতি বিবাহ করে খুশি। পরিশ্রমী, স্বদেশসেবী স্ত্রী-কে পেয়ে জ্যোতি বাইরের জীবন এবং ঘরের জীবনের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছে। টলস্টয় যে অভিজাত সমাজের চিত্রচরিত্র এঁকেছেন তার নিখুঁত বর্ণনা আমাদের সেই জগৎটিকে স্পষ্টভাবে চিনিয়ে দেয়। প্রেম, ভোগ, বিলাস যেমন একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে তেমনি তার অন্তঃসারশূন্যতাও টলস্টয় দেখাতে ভোলেননি। চরিত্রগুলির দ্বন্দ্ব, মর্মান্তিক যন্ত্রণা, মুক্তির কামনা টলস্টয় ভাঁজে ভাঁজে খুলেছেন। লেভিনের যে উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে সেই উদাহরণটিই এই ব্যাপার বুঝতে যথেষ্ট মনে করি। গ্রামীণ জীবন, সেই জীবনের মধুর রূপটি টলস্টয়ে প্রাপ্য। চরিত্রের সঙ্গে তা মিলে মিশে যায়। অন্নদাশঙ্করে সেরকম কোনো প্রয়াস নেই। রত্ন যখন শ্রীমতীর মা বাবার কাছে কয়েকদিন কাটাতে গেল তখন শ্রীমতীর মায়ের শাসনকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। শ্রীমতী-রত্ন দুজনে মিলে প্রেমিক-প্রেমিকার যে সাধনায় নিমগ্ন হতে চেয়েছিল তাও সম্ভব হল না। রত্নর সরে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সে কি সবই মেনে নেবে? বাধা তো আসবেই সেই সঙ্গে তাকে তো ক্ষতবিক্ষত হতে হবে। তেমন কোনো প্রস্তাব নেই। উপন্যাসটি এতে দুর্বল হয়ে পড়ছে এমন কথাও হয়ত বলা যাবে না। কারণ লেখক তার তত্ত্বকে বড়ো বেশি প্রাধান্য দেন। তত্ত্বের প্রয়োগে 'চন্ড' টলস্টয়ের বিষামৃত নেই। জীবনমন্থন করা বিশুদ্ধ মানুষের প্রতিরূপ নেই রত্নের উপলব্ধিতে। যদি ধরে নেওয়া যায় রত্নর চরিত্রেই রয়েছে নিজেকে গুরুত্ব না দেওয়া; চাপিয়ে না দেওয়া তাহলেও ব্যক্তির টানাপোড়েন সেখানে অপেক্ষিত। ঔপন্যাসিককে লক্ষ রাখতে হবে চরিত্র যেন পুতুলের ধর্মে না চলে। অর্থাৎ লেখক যেন সূত্রধার না হয়ে যান। উপন্যাসটির মূল চরিত্র রত্নকে কখনও কখনও মনে হয় সে নিজের মধ্যেই গুটিয়ে আছে।

॥ চার ॥

আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এখনও তুলিনি। বাইরের দিক থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা আর যোগাযোগ উপন্যাসের সাদৃশ্য সহজেই সকলের চোখে ধরা পড়বে। শেষের কবিতায় অমিত রে আধুনিক; দুর্দান্ত আধুনিক। তার দলবল কতটা আছে তা আমরা স্পষ্টত না জানলেও আমরা বুঝতে পারি নিবারণ চক্রবর্তীকে নিয়ে সে রবীন্দ্রবিরোধিতা করতে চেয়েছিল। তার মেটাফিজিক্যাল কবিতায় আসক্তি কিংবা সুনীতি চাটুজ্যের ব্যাকরণপ্রীতি তার স্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুট করছে। অমিত রায় চেয়েছিল এমন ভাষায় কবিতা লেখা হবে যার মধ্যে থাকবে গথিক গির্জার ছাঁদ আর নিউরেলজিয়ার ব্যথার মতো। শিলঙে তার প্রেমের যে টুকরো ছবিগুলি পাই এবং আচরণে যে উদ্ভটত্ব লক্ষ করি তাতে আমরা বুঝি এ বাস্তবের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক না হলেও এ প্রেম ঠিক মেলতে পারে না। অবশ্য ডানা মেলে আকাশে ওড়বার স্বপ্ন সে সর্বদাই দেখছে। মিতা-বন্যা নাম দুটি যদিও অমিত লাবণ্যর কাটছাট সংস্করণ কিন্তু দুটি আ-কার যুক্ত হয়ে নাম দুটোতে ডানা মেলার আভাস এনেছে প্রেমিক-প্রেমিকা। অমিতের প্রথম রোমাঞ্চের সঞ্চার কবিতা হয়ে সুদূরকে স্পর্শ করে। 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে / ঝলমল করে চিত্ত' —এই চিত্তের উল্লাস 'চলতি হাওয়ার পন্থী'র দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই ভাবনায় অমিত অর্জন করল 'ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তি'। শিলং আবির গুলালে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। যেদিন বিচ্ছেদ এল সেদিনের অমিত শান্ত। এক ধরনের প্রৌঢ়তায় সে আত্মস্থ 'তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন'। অন্নদাশঙ্করের রত্ন তো আধুনিক যুবক এবং প্রেমিক। অমিত গতানুগতিক পাঠ শেষ করে জ্ঞানের নূতন জগতে প্রবেশ করেছে। রত্ন তার প্রেমের স্বরূপ বুঝতে চেয়েছে। অমিত এবং রত্ন দুজনেই রোমান্টিক। রত্ন রোমান্টিক এবং মিস্টিক। সমালোচকেরা রোমান্টিক শিল্পের একটা বিপদ লক্ষ করেছিলেন এক দিক থেকে যেহেতু রোমান্টিক ভাবনা একান্তই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সেই হেতু এমন হতে পারে কবির কল্পনা শেষ পর্যন্ত সংযম হারিয়ে এলোমেলো ভাবনায় ছড়িয়ে যেতে পারে যার কোনো অর্থই পাওয়া যাবে না। রত্ন আবার মিস্টিক, সে শাশ্বত সৌন্দর্যকে পেতে চেয়েছিল। পায়নি। শেষ দুই পর্বে রত্ন যখন সংসার, রাজনীতি, বাপের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সমাজের শতবাধার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল তখন এককথায় বলা যেতে পারে সে অসহায়, বড়ো অসহায়। অমিত কিন্তু এলোমেলো নয়, সে মেনে নিয়েছে, শান্ত হয়েছে, চিরন্তন প্রেমের একটা আলোও সে দেখেছে— লাবণ্যও। যদিও অমিত প্রায় প্রভাতের কাছাকাছি এসে পরমহংসের মতো বলেছে একজন ঘড়ায় তোলা জল আর একজন দিঘির জল। রত্নর কাছে এ আশাও ছিল না। অন্নদাশঙ্কর

রন্ত্র-গৌরীর বিদায় মুহূর্তগুলিকে ঘন করে তুলেছেন দুজনের আবেগ আর অশ্রুধারার মধ্যে। রন্তর প্রেম বড়ো না শ্রীমতী (গৌরী)-র প্রেম বড়ো এ বিতর্কের অবসান হল না। রন্ত্র বিলেত চলে যাচ্ছে। গৌরী পুত্রকে ছেড়ে রন্ত্রর সঙ্গী হতে পারে না। সম্ভবও নয়। গৌরী একদিন বিপ্লবী নায়িকা হয়ে উঠেছিল। আজ সেই বিপ্লবী নায়িকা সংসারজালে আবন্ধ। অথচ সে স্বামী যশোবাবুকেও ভালোবাসে না। স্বামীকে সেকথা সে জানিয়েছে। যশোবাবু যে সেটা বোঝেন না তা নয়। কিন্তু তিনিও জানেন শ্রীমতী এই মুহূর্তে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। রন্ত্র শ্রীমতীকে বলেছে তাদের প্রেম অদ্বিতীয়। প্রেমই যে সত্য— প্রেমিক-প্রেমিকা সেখানে উপলক্ষ মাত্র রন্ত্রর ভাবনাকে তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সীতা নয়, সাবিত্রী নয়, রাধার প্রেমই যে প্রেমের সার একথা পুনরায় গৌরী রন্ত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। গৌরী তীব্রকণ্ঠে জানিয়েছে 'পুরাণে কি লিখেছে ওরাই (সীতা-সাবিত্রী) প্রেমিকার শিরোমণি? না রে, ওঁদের উপরেই ঠাঁই রাধা নামে একটি গোপীর। রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি।' আমরা যেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চরিতামৃত' পড়ছি। অমিতের প্রেমের উপলব্ধিতে এ বস্তু থাকতে পারে কিন্তু এই তত্ত্বে পেঁছে দেয় না সে প্রেম। রোমান্টিক প্রেম আস্বাদনের মুহূর্তগুলিকে সে অবাধে আসতে দেয়। এর বেশি কিছু তার কাম্য নয়। রডোডেনড্রনগুচ্ছের মহিমা ও সৌন্দর্য তার জীবনকে শেষ পর্যন্ত ফুলভারাবনত করে দেয়। রন্ত্র কিন্তু এরকম বিষাদতৃপ্ত নয়। অন্নদাশঙ্করই যেন অতর্কিতে বলেন 'একাধারে রাধা আর বিপ্লবী নায়িকা' এ নারীর ছন্দ রেখে জীবনের পথ চলবে কে? এ পুরুষ তো নয়। সে পুরুষোত্তম আজ এখনি দৃশ্যমান না হলেও পরে একদিন হবেন'। অন্নদাশঙ্কর শেষের কবিতার কথা মনে রেখেছিলেন কিনা এ বই লেখবার সময়ে তা আমার জানা নেই। কিন্তু তিনি যে উপসংহারে আমাদের পেঁছে দেন তা শেষের কবিতার সদৃশ নয়— এ কথা মানি। কিন্তু যে সিদ্ধান্তে তিনি আমাদের স্থিত করতে চান তা তত্ত্ব মাত্র। নিরবধি কালের উপর বরাত দিতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আপাতত উপন্যাসটি তত্ত্বের ভারে মন্থর এবং কিছুটা ক্লিষ্ট। অমিত আধুনিক কবিতার ভাষার যে টানটান শরীরী রূপ প্রত্যাশা করেছিল রন্ত্রর চিন্তাতেও সেরকম ভাষাচিন্তা দেখতে পাই। অমিতর ভাবনা আধুনিক কবিতার ভাষা সম্পর্কে আর রন্ত্রর অন্বিষ্ট প্রেমের ভাষা। প্রেম যদি সুন্দর তাহলে তার অভিব্যক্তিও হবে সুন্দর। সে গৌরীকে জানায় 'ভাষা সৃষ্টি করতে হবে। প্রেমের ভাষা'। আবার 'মধুর রসের জন্যে চাই মধুরতর ভাষা। মধুরতম ভাষা'। বুঝিয়ে বলেছে রন্ত্র 'মানুষের প্রেম যে পাখীর প্রেমের চেয়ে এত দূরে এত ঊর্ধ্বে গেছে তার মূলে রয়েছে মানুষের মুখের ভাষা। এ যদি পিছিয়ে পড়ে

তবে প্রেম এগিয়ে যেতে বাধা পায়'। এ ভাবার জন্ম হতে পারে সেদিন যেদিন 'প্রেম যাতে ফুরিয়ে না যায়, হারিয়ে না যায়, পালিয়ে না যায়, থিতিয়ে না যায়, বিষিয়ে না যায়, পাতলা হয়ে না যায়'।— এই উপলব্ধির সত্য হবে।

যশোবাবু জমিদার। সেকালের জমিদারি চাল তার চলনে বলনে। এক স্ত্রীতে তার কুলোয় না। গানবাজনা নিয়ে সে থাকে। শ্রীমতী তারই ঘেরাটোপে থেকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু সে স্বাধীনতা সীমিত। যোগাযোগের মধুসূদনের সঙ্গে তার তুলনাই চলতে পারে না। মধুসূদন উদ্যমী, সংগঠন গড়নে সফলকাম, অধিকারবোধ সচেতন। স্ত্রীর উপর সে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব চেয়েছিল কিন্তু পায়নি। মন ঘুরে যায় শ্যামার দিকে। কিন্তু ঠিক যশোবাবুর মতো নয়। কিংবা শ্রীমতীর কৌশলও নয়। শ্রীমতী মেনে নিয়েছিল সুধাকে। কুমু কি করে মানবে? এ তুলনা আকস্মিক মনে হতে পারে কারও কারও। কিন্তু সন্তানসম্ভবা কুমু আর সন্তানসম্ভবা শ্রীমতীর সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি এড়াবে কি করে? দুজনের কাছে মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সন্তান। অবশ্য শ্রীমতীর মিলন রত্নর সঙ্গে। কুমু দাদা বিপ্রদাসের নিষেধ অমান্য করেই শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করবে। অবিনাশ ঘোষাল কুমুকে মধুসূদনের গৃহেই বেঁধে ফেলল। তেমনি শ্রীমতীর সন্তানও। শ্রীমতী অবশ্য তার স্বাধীন সত্তাকে বিসর্জন দিতে চায়নি। রাধার প্রেমকেই সে সর্বসাধ্য শিরোমণি বলেছে। কুমুও বলেছিল নারীর এমন জিনিসও আছে যা সন্তানের জন্যও বিসর্জন দেওয়া যায় না। সাদৃশ্য সত্ত্বেও কুমুর যে অহরহ সংগ্রাম এবং যন্ত্রণা তার পরিচয় শ্রীমতীর চরিত্রে ক্ষীণ। অন্যদিকে সে নারীর স্বাতন্ত্র্য অর্জনে যশোকে সুধার হাতে সঁপে দিতেও কুণ্ঠিত নয়। এখানে চরিত্রটিকে সরিয়ে আনলেন অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রভাবনার জগৎ থেকে। কুমুর পরবর্তী জীবনের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দেননি। অন্নদাশঙ্করও বিষয়টিকে বিস্তৃত করেননি। তবে উপন্যাসের শেষ পর্বে এসে বুঝতে পারি এর বেশি আর এগোনো সম্ভব নয়। অন্নদাশঙ্কর অগ্রসর হননি। কেননা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী পায়নি। পক্ষান্তরে রত্ন আদর্শজগতেই থেকে গেছে।

॥ পাঁচ ॥

আমরা বুঝে নিই অন্নদাশঙ্কর এপিক উপন্যাসের পক্ষপাতী। এ জন্যে টলস্টয় তাঁকে টানে। টলস্টয়ের এপিক উপন্যাসে স্পেস ও টাইমকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন আবার টাইমের শাসন মেনে সংযমী হয়েছেন 'যুদ্ধ ও শান্তি'তে তার দৃষ্টান্ত মেলে। যুদ্ধ ও শান্তির নির্যাস বোধ করি মৃত্যুর বিরুদ্ধে

জীবনের বিদ্রোহ, জরার বিরুদ্ধে যৌবনের প্রতিষ্ঠা। অন্নদাশংকরও রত্নর জীবনে প্রেমমহিমা এবং প্রেমশক্তির চলাচল দেখেছেন। সে কিছুতেই পরাজয় মানতে চায়নি। এক সময়ে সে প্রভাত, শ্রীমতীর পত্রাবলি এবং হস্টেলের বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্যে থেকে নিজেই তার উদ্ভিন্ন প্রেমের বিশ্লেষণ করেছে। মাকড়সার মতো নিজের জালের মধ্যে গুটিয়ে ছিল। পা দিয়ে টেনে টেনে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করেছে। এ অমৃত একান্ত নিজেরই। আত্মহারা রত্ন দ্বিতীয় পর্বের মাঝামাঝি এসে সে যখন তার লালিত সঞ্চয়টিকে নিয়ে চলাফেরা করছিল তখন বাধাবিঘ্ন পেয়েছে। কোথাও কোথাও আহত হয়েছে। যেমন সে বুঝতেই চায়নি শ্রীমতী সন্তানসম্ভবা। অথবা জ্যোতি যখন দৈনন্দিনের ভাষায় তার নবপরিণীতা স্ত্রীর রন্ধনপটীয়সীর পরিচয় দেয় তখন রত্ন কি আহত হয়নি? তার সঞ্চয়ের থলিটিকে রক্ষা করাই দুর্বহ হয়ে উঠল রত্নর কাছে। কিন্তু সে এখানে এসেও দমেনি। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতীকে ত্যাগ করে এক ধরনের আশা নিয়ে দেশ ত্যাগ করেছে। কিন্তু সে প্রেমকে অপবিত্র হতে দেয়নি। প্রেম শুধু প্রেম তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এরকম প্রেমমন্দিরও সে রচনা করতে চেয়েছিল। প্রেমের বাস্তব রূপের কাছে তার আদর্শ ধাক্কা খেয়েছে। নিজের অপূর্ণতার কথা মনে হয়েছে। তবুও সে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

দান্তের মতো এপিক লেখার উৎসাহ ছিল কি অন্নদাশংকরের? প্রেম কি রিলিজিয়ন। এর মধ্যে কি ঈশ্বরের সত্তা আছে। দান্তে যে পুরগেতেরিওর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন রত্ন কি সে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে? সেই অভিজ্ঞতা দান্তেকে স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছিল। এবং স্বর্গীয় অনুভূতিতে স্নাত দান্তে বিয়াত্রিচের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় যাজক সেন্ট অগাস্টিনের ঈশ্বর-চিন্তার সঙ্গে দান্তে বিয়াত্রিচের প্রেমের তুলনা করা যায়। সেন্ট অগাস্টিন বলেছিলেন Our hearts are set on an upward journey, as we sing the song of ascents। অন্নদাশংকরও রত্নর যাত্রাকে এইভাবে দেখেছিলেন কিনা জানি না। বৈষ্ণবীয় প্রেমে এই যাত্রার কথা কি বলা হয়নি? রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের যে আলোচনা হয়েছিল সেখানে কি আমরা দেখতে পাই না 'এহো বাহ্য' থেকে 'এহো হয়' এবং সর্বশেষে এই শেষ। আমরা সকল অভিমান বিসর্জন দিয়ে সেই সর্বসাধ্যশিরোমণি রাধার প্রেমে পেঁছিতে পারি। রত্ন বলেছে যে সহজিয়ারা এক মধ্যপন্থা আবিষ্কার করেছিল যেখানে যোগ ও ভোগ মিলতে পারে। এখানেই ঠিক সুরটি বেজে ওঠে না। দান্তেরও না বৈষ্ণবীয় প্রেমেরও না। তবে স্বাধীন সত্তার জাগরণে বিশ্বাসী রত্নর যাত্রাপথ দীর্ঘতর। উপন্যাসটির পরিচয় দেবার সময় ধীমান দাশগুপ্ত বলেছেন 'রত্ন ও শ্রীমতী'তে গোরী যতটা না প্যাথেটিক তার চাইতে বেশি সিম্পেথেটিক,

অভিমানিনী, যতটা না প্যাশনে তার চেয়ে বেশি কম্প্যাশনে গড়া; অন্নদাশঙ্কর বলেছেন তিনি 'ইটারনালে' বিশ্বাস করেন। সিমপ্যাথি বা কম্প্যাশন কোনোদিক থেকেই কিন্তু গোরী ইটারনালের কাছাকাছি নয়। সেও হয়ে উঠতে চেয়েছিল। রত্ন মনীষা দিয়ে এ জগতের আদলে এবং বাইরে গিয়ে নূতন পৃথিবী রচনার স্বপ্ন দেখেছিল। গোরী সেই তুলনায় নিয়তির কাছে সমর্পণে বাধ্য হয়েছে। তার উধর্বায়ন যদি সম্ভব হত তবে একালের নূতন নায়িকাকে আমরা পেতাম। কুমু প্রসঙ্গে যে কথা বলা হয়েছে শ্রীমতী সম্বন্ধেও সেই কথা বলি। কুমুর সংস্কার যেমন মধুসূদনের সঙ্গে মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনি ফ্রি ওম্যান শ্রীমতীর জীবন অতিবাহিত নয়। শ্রীমতী যেন নিয়তির দ্বারা পিষ্ট। রত্ন যেহেতু শ্রীমতীর সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা সেইহেতু শ্রীমতীর নিয়তিই যেন রত্নের নিয়তি হয়ে উঠল। যন্ত্রণাকাতর একটা প্রশ্নের সামনে এই দুই নরনারী মুখোমুখি হয়ে রইল। 'রত্ন ও শ্রীমতী'র সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'কন্যা' উপন্যাসটির পার্থক্য সম্বন্ধে বলেছেন কন্যাতে আছে শাশ্বত নারীর কথা। অথবা নারীর চতুরঙ্গ উপাদান। 'রত্ন ও শ্রীমতী' মুক্ত নর ও মুক্ত নারীর প্রেম কাহিনী। কিন্তু আমার মনে হয় কন্যার চতুরঙ্গ ভাবনা (যে নারীর শরীরী সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ আছে কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখা যায় না; যে নারীর মুখে আধ্যাত্মিকতা মননের দীপ্তি বিচ্ছুরিত এবং যে অনায়ত্ত; যে নারী বীরাঙ্গনা যার কর্মে তার স্ফূর্তি — অথচ সংসারে তাকে মানায় না; যে নারী সর্বত্র বিরাজমান আবার কোথাও নেই) 'রত্ন ও শ্রীমতী'-তে ভালোভাবেই আছে। বস্তুত এই উপন্যাসে চতুরঙ্গ ভাবনার উল্লেখও আছে। সেই কারণেই আমি আলোচনায় ইটারনাল নারীর প্রসঙ্গ এনেছি।

অন্নদাশঙ্কর নিজেই বলেছেন এ বই দুরূহ, বারবার পড়তে হবে। 'রত্ন ও শ্রীমতী' এই কারণে জনপ্রিয় বই নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বইটির আলোচনাও করেননি। আমরা কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করি এই জন্যে। অথচ তত্ত্বচিন্তা যে উপন্যাসটিকে গ্রাস করেছে এমন নয়। কেবল মনে হয় চরিত্রগুলি সরল এবং একমাত্রিক। সে জন্য তাপউত্তাপ সঞ্চার করে না উপন্যাসটি। শান্তচিত্তে গ্রহণ করতে পারলে আধুনিক কালের 'চরিতামৃত'-রূপে একে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

সত্যাসত্য

অলোক রায়

'সত্যাসত্য' এক হিসাবে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী উপন্যাস। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হয়তো নয়, কিন্তু নানাকারণে 'সত্যাসত্য' যে-পরিচিতি পেয়েছে, অন্নদাশঙ্করের আর কোনো উপন্যাস তা পায়নি। ছাব্বিশ বছর বয়সে উপন্যাসটি লেখা তিনি শুরু করেন, ছয়খণ্ডে-সম্পূর্ণ উপন্যাস শেষ করতে সময় লাগে বারো বছর (১৯৩০-৪২)। ('দুঃখমোচন'-এর পর কিছুদিন লেখা থেমে যায়। 'মর্তের স্বর্গ' লেখার সময়ও মাঝে মাঝে বিরতি গ্রহণ করতে হয়)। বারো বছরে একজন লেখকের চিন্তা ভাবনার কিছু পরিবর্তন ঘটা অস্বাভাবিক নয়। অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছেন, উপন্যাস লেখার আগে তাঁর মনে যে-পরিকল্পনা ছিল উপন্যাসের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তা রক্ষিত হয়নি। প্লটের মুখরক্ষার জন্য তিনি কোনোদিন উপন্যাস লেখেননি, ফলে পূর্বপরিকল্পিত পরিণতির বদল হয়। অন্যদিকে অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস— অন্তত সত্যাসত্য, রত্ন ও শ্রীমতী, ক্রান্তদর্শী— সাধারণ ভাবে নভেল অফ আইডিয়াজ। কিন্তু তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, 'পরিকল্পনা অনুযায়ী থিসিস লেখা যায়, কিন্তু উপন্যাস নয়। উপন্যাসে বহু চরিত্রের সমারোহ। ... উপন্যাস একবার আরম্ভ করলে তার পরে সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। চরিত্ররা মঞ্চে নেমে শেখানো কথা বলে না, এক বলতে গিয়ে আর বলে। এক করতে গিয়ে আর করে।' (ভূমিকা, ক্রান্তদর্শী, চতুর্থ পর্ব)। আইডিয়াকে ঘিরেই কাহিনী ও চরিত্রের উপস্থাপনা— 'সত্যাসত্য' থেকে 'ক্রান্তদর্শী' এই একই ধারায় লেখা। অথচ উপন্যাসের বিষয়বস্তু অনেকগুলি মানুষের বহমান জীবনধারা। সেখানে বহির্জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনও আছে। হয়তো অন্তর্জীবনই প্রধান। চরিত্রের মুখে তত্ত্বালোচনা থাকতে পারে, কিন্তু তত্ত্বালোচনার জন্য তত্ত্বালোচনা নয়। কর্মে ও চিন্তায় তত্ত্ব নিজস্ব রূপ নেয়, সেখানেই উপন্যাসের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য। লক্ষ্য রাখতে হয় যে, মানুষের প্রাণের রূপ যেন চিন্তার স্তূপে চাপা না পড়ে, অর্থাৎ চরিত্র সৃষ্টিকে গৌণ করা চলে না উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা প্রাধান্য

পেয়েছে, তবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে, সেগুলি জায়গা পেয়েছে, না জায়গা জুড়েছে। আহার্য জিনিস অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে। কিন্তু ঝুড়িতে করে যদি মাথায় বহন করা যায় তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন সাধন হতে পারে, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় না। গোরা গল্পে তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম যতই হোক-না, সে নিন্দনীয়। আলোচনার সামগ্রীগুলি গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে তবে প্রব্লেমে ও প্রাণে, প্রবন্ধে ও গল্পে, জোড়াতাড়া জিনিস সাহিত্যে বেশিদিন টিঁকবে না।' (সাহিত্যের মাত্রা, ১৩৪০)। 'সত্যাসত্য' সম্বন্ধে কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি, কারণ সুধী ও বাদলের মুখে অনেক তত্ত্বকথার সমাবেশ হয়েছে— চরিত্র দুটিকে তত্ত্ব প্রতিপাদনের 'কল্' মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তত্ত্বের নিজস্ব একটা মূল্য আছে, রবীন্দ্রনাথ যাকে আলোচনার সামগ্রী বলেন, স্বতন্ত্রভাবে তার বিচার সম্ভব। কিন্তু 'সত্যাসত্য' থিসিস নয়— এমন কি এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথও নয়— সত্যাসত্য 'বৃহৎ উপন্যাস'।

উপন্যাস মানেই 'বৃহৎ উপন্যাস', এ নিয়ে অন্নদাশঙ্করের মনে কখনো সংশয় ছিল না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, 'উপন্যাস হবে অন্তত এক হাজার পৃষ্ঠা। ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত নিয়মে। তার কমে জীবনকে ধরা যায় না। ব্যক্তিগত জীবনের কথা হচ্ছে না, বৃহত্তর জীবনের কথা হচ্ছে।' (উপন্যাসের সাধনা)। তবে এমন উপন্যাস লেখার জন্য যে বিপুল সাধনা প্রয়োজন, তা ক'জনেরই বা থাকে। যাঁর থাকে তিনিও টলস্টয় বা রম্যাঁ রলাঁর মতো একটি বা দুটি যথার্থ উপন্যাস লিখতে সক্ষম হন। এদিক থেকে অন্নদাশঙ্কর ভাগ্যবান— তিনি অন্তত তিনটি 'মহাগ্রন্থ' লিখতে পেরেছেন। এই ধরনের উপন্যাস লিখতে যে শুধু দীর্ঘ সময় লাগে তাই নয় ('সত্যাসত্য' লিখতে বারো বছর, 'রত্ন ও শ্রীমতী' লিখতে চোদ্দ বছর, 'ক্রান্তদর্শী' লিখতে সাত বছর সময় লেগেছে), এমন উপন্যাস ধারণ করার জন্য প্রয়োজন এমন বক্তব্য যা লেখকের জীবনদর্শনের সারাৎসার, অন্নদাশঙ্কর যাকে বলবেন 'সনাতন জীবনরহস্য'। টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি'র মধ্যে এই জীবন রহস্যেরই প্রকাশ— 'কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, বাঁচার মতো বাঁচা কাকে বলে? এর এক-একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এক একজনের চরিত্রে দিয়েছেন।' (সমর ও শান্তি)। রম্যাঁ রলাঁর দুটি উপন্যাসেও একই জিজ্ঞাসা— 'কেমন করে বাঁচব? একই উত্তর, মিথ্যার সঙ্গে আপোস করব না, সত্য করে বাঁচব। এর দরুন যদি দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পাব, এড়াব না। জীবনে বহু দুঃখ আছে,

তা জেনেও জীবনকে ভালোবাসব। সেই তো বীরত্ব।' (রম্যা রলাঁ)। এই চিরন্তন জীবনসত্যের সন্ধান যে-উপন্যাস দিতে পারে তাকেই বলি ক্লাসিক।

'সত্যাসত্য' এই সত্য-করে বাঁচার কাহিনী। 'সত্যাসত্য' এপিক উপন্যাস হোক বা না-হোক, ক্লাসিক নভেল— এখানে 'উপন্যাসের সীমান্ত গিয়ে ঠেকেছে দর্শনের সীমানায়।' (উপন্যাসের সাধনা)। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে জীবনজিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটে, কিন্তু সম্ভবত 'সত্যাসত্যে' যেমনটা ঘটেছে, তেমন অন্যত্র দেখা যায়নি। তাই 'সত্যাসত্য'কে তাঁর সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী উপন্যাস বললে ভুল হবে না। প্রথম খণ্ডের 'প্রত্যাহৃত ভূমিকা'র লেখক বলেছিলেন, "বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্বদা সক্রিয় রয়েছে, প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan ; তাদের নিয়ে প্যারাডাইস লস্ট রচিত হয়েছে। আধুনিক মন ও-সব নাম পছন্দ করে না, তাই তাদের বলে সত্যাসত্য।' সুধী আর বাদল ছিল উপন্যাসে প্রথমে সত্য এবং অসত্যের রূপক। অবশ্য উপন্যাসের চরিত্রে রূপকের আভাস থাকে, কিন্তু চরিত্রের স্বকীয়তা থাকলে তাকে রূপকের গণ্ডি অতিক্রম করতে হয়। আসলে জীবনের দাবি আরও অনেক বড়ো। চরিত্র তাই উদ্দেশ্য প্রচারের বাহন নয়, হয়তো কখনো উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের উপায়। সেখানেও আর্টের নির্দেশ অনতিক্রম্য, তবে সার্থক সৃষ্টিতে জীবন ও আর্টের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। উপন্যাসের শেষ খণ্ডে 'উত্তরভাষণ' লেখার সময়, 'সত্যাসত্য' শিরোনাম নিয়েই লেখকের মনে সংশয় জেগেছে— কারণ সুধী আর বাদল দুজনেই সত্যসন্ধানী, যদিও তাদের মধ্যে আছে পথভেদ ও মতভেদ। তাহলে সত্য এবং অসত্যের দ্বন্দ্ব কি মিথ্যা? তাও নয়। সত্য এবং অসত্যের চিরন্তন দ্বন্দ্বের রূপ বহির্জগতের বিবিধ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নিত্য ধরা পড়ে। হয়তো প্রজ্ঞাকে সত্য বলে গ্রহণ করলে ভুল হবে না। কারণ অন্নদাশঙ্কর অন্তত 'অপসরণ' (শেষ খণ্ড) লেখার সময় মনে করেছেন 'বাদলের মতো ইনটেলেক্ট-সর্বস্ব মানুষের পক্ষে নৈতিবাদই মরণের হেতু।' তাহলে বাদল নয়, সুধীকেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকা দিতে হয়। কিন্তু সুধী কি কেবল ইনটুইশন-সর্বস্ব মানুষ? সুধীও কি সমগ্র সত্যের সন্ধান পেয়েছে?

হরিহরক্ষেত্রে মেলা দেখতে সোনপুর যাওয়ার পথে সুধী একদিন বাদলকে বলেছিল, 'তোমার লক্ষ্য স্বপ্রকৃতির সীমার মধ্যে থেকে সত্যকে পাওয়া ও সত্য হওয়া। আমারও লক্ষ্য তাই।' (অজ্ঞাতবাস)। বাদল সত্যকে পায়নি, যদিও সত্যকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল তার মধ্যে প্রবল। সুধী সত্যকে না পেলেও সত্য হয়ে ওঠার সাধনায় অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। 'বোদ্ধ' বাদলের

পক্ষে সত্যকে পাওয়ার পথে অনেক বাধা ছিল। 'ব্রাহ্মণ' সুধী চিত্তকে মুকুরের মতো মার্জিত করে রেখেছে যাতে 'সত্য তার চিত্তে বিনা আহ্বানে প্রতিফলিত হয়।' বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণের বিতর্ক উপন্যাসে প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু তর্কে সুধী বীতরাগ— 'তর্ক থাক, বাদলা। অন্তত দু হাজার বছর ধরে 'ভালো' ও 'মন্দ' নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়ে এসেছে। আরো দুলাখ বছর হবে। সেই জন্য তর্কের উপর আস্থা নেই।' (যার যেথা দেশ)। সুধী প্রশ্ন করতেও চায় না, কারণ 'প্রশ্ন করে কি সত্যের পাত্তা পাওয়া যায়? যে জানে সে আপনি জানে।' (অজ্ঞাতবাস)। সত্যকে উপলব্ধি করতে হয়। বিলেতে আমরা যখন সুধীকে প্রথম দেখি তখন 'সুধী একটি কথাও বলছিল না। তার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। পূর্ণ কলসের শব্দ নেই।' (যার যেথা দেশ)। সুধী ধ্যানের মধ্যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু এই জন্যই সুধী-র সত্যানুসন্ধান বা সত্যোপলব্ধি পাঠকের কাছে অনেক সময় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। অন্তত 'সত্যাসত্য' উপন্যাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তারা প্রায় সকলেই সুধী-চরিত্র নিয়ে বিব্রত। আমরা লক্ষ্য করি, সুধী যতটা প্রশংসা বা নিন্দা অর্জন করেছে তার অনেকটাই সুধী র প্রাপ্য ছিল না।

লেখক সুধীকে সত্যের রূপক-হিসাবে পরিকল্পনা করিয়াছেন। মনে হয় যে, তাহার মানবতার প্রীতিস্নেহভালবাসার অন্তরালে তাহার এই রূপক-প্রতিভাস নৈর্ব্যক্তিক শিখায় জ্বলিতেছে। সত্যের মতই তাহার মুখে অপার্থিব জ্যোতিঃ; সত্যের মতই তাহার অনমনীয় দৃঢ়তা। ইহাতে হয়ত মানুষ হিসাবে তাহার আকর্ষণ কিছু কমিয়াছে।

(শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

সুধী-র ভারতীয় আদর্শটা যে কী বস্তু আমরা এত বড় বইতেও তার কোন বিস্তারিত পরিচয় পাই না। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় বহু মত ও পথের অস্তিত্ব ছিল; তার মধ্যে কোনটাকে সুধী গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কেও লেখক নির্বাক। সুধী গ্রাম সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে, কিন্তু সেই গ্রাম সেবার পরিকল্পনাটা কী আমরা তা জানতে পারি না। সে গ্রামে গ্রামে রেলগাড়ি বিজলি বাতি বর্জন করে চরকা ও খাদি প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করবে কি না লেখক তাও আমাদের স্পষ্ট করে জানাননি। …বইখানাকে ট্রাজেডির মধ্যে শেষ করতে চাননি বলেই লেখক আমাদের সামনে সুধী-র ভারতীয় আদর্শবাদের এক বিকল্প আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমি আগেই বলেছি, সুধী-র এই আদর্শবাদ কায়াহীন, অস্পষ্ট এবং অবাস্তব। (অচ্যুত গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা)

বাদলের বন্ধু সুধী, যাকে উপন্যাসের দ্বিতীয় নায়ক বলা চলে, যার মধ্যে লেখকের গান্ধীবাদী ও টলস্টয়পন্থী বিশ্বাস মূর্ত হয়েছে, সেই স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ, ভারত-আত্মার প্রতিভূ সুধী-র কোনো অগ্রগতি নেই। …সে যেন সত্যের নৈর্ব্যক্তিক রূপকই থেকে গেছে। বাদলের বাষ্পময় ঘূর্ণাবর্ত বিশ্বাসের ভিত্তি পায় না, আর সুধী-র কোনো সন্ধানময় পরিক্রমা নেই। (অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস)

॥ দুই ॥

রূপক-নাটকের মতো রূপক-উপন্যাসের সম্ভাবনাও স্বীকার্য। অবশ্য 'সত্যাসত্য' রূপক-উপন্যাস নয়। সুধীকে যখন সত্যের রূপক বলা হয়, তখন সত্য এবং রূপক দুটি শব্দই কিছুটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুধী জীবনজিজ্ঞাসু, সুধী জীবনশিল্পী— এটাই তার বড়ো পরিচয়। এর সঙ্গে তার সত্যানুসন্ধান ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এইখানে একটা বিপদের আশঙ্কা আছে— জীবনশিল্পী অনেক সময় জীবনটাকে একটা ছাঁচে ঢালাই করে, সুধী অবশ্য একে বলে একটা 'ডিজাইন — 'আমি চাই বাগানের মতো সাজানো জীবন' যাকে বলে ড্রিফ্‌ট— স্রোতে গা ভাসানো— তা আমার নয়।' (অপসরণ)। কিন্তু ডিজাইনের মধ্যে জীবনকে ধরে রাখা যায় না, সত্যকেও নয়। সত্যের কোনো অবিকল্প অনড় অটল রূপ ব্যক্তিজীবনে সন্ধান করে লাভ নেই। আন্ট এলেনর যখন সুধীকে বলেন, 'তুমি যুগোত্তর জীবন-শিল্পীদের দলে। আধুনিক ভারতবর্ষের দুর্দশার অনলে আত্মাহুতি দিও না, সুধী। কথা রাখবে?" তখন সুধী উত্তর দেয় না, কারণ তার মনে তখন অনেক প্রশ্ন। প্রশ্ন করে সত্যের পাত্তা পাওয়া যায় না ঠিক কথা, কিন্তু জীবনশিল্পীকেও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সুধীকে বুঝতে হলে তার আত্মসংকটকেও বুঝতে হবে— 'নিরাময় ও নিয়মানুবর্তী যার দেহ, দর্শন-শ্রবণ-মননাদি, ইন্দ্রিয় যার সুতীক্ষ্ম ও সতর্ক, সত্য তার দ্বারে প্রবেশার্থী হলে সংশয়ের 'হুকুমদার' শুনে থতমত খাবে না, 'ফ্রেন্ড' না বলতে পারলে গুলির চোটে পঞ্চত্ব পাবে না। কাল রাত্রের চিত্তবিক্ষেপ, দৈহিক অস্বস্তি, সুষুপ্তির অভাব সুধী-র প্রত্যক্ষ সত্যানুভবকে প্রশ্নসাপেক্ষ পরোক্ষ করেছিল। তার ইনটুইশন, তার সহজাতবোধ, পথিকহীন পথের মতো আকাশের দিকে চিৎ হয়ে চুপ করে পড়ে রয়েছিল।' (অজ্ঞাতবাস)। তাহলে সুধীকে আদর্শ চরিত্র মনে করে অবাস্তব বলা ভুল হবে। অন্নদাশঙ্কর সুধীকে উপন্যাসের পটভূমিতে যতটা সম্ভব বাস্তব করেই তুলতে চেয়েছেন।

'সত্যাসত্য' নভেল অফ আইডিয়াজ হলেও দেশকালের বিশদ পরিচয়,

কাহিনী ও চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে সুধী ও বাদল যখন বিলেত এসেছে তখন সময়টা ১৯২৮ সালের সূচনা। আর উপন্যাসের শেষ খণ্ডে বাদলের মৃত্যু ১৯২৯ সালের শরৎকালে। এই দুবছর ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা গেছে নানা টালমাটাল। ইংরেজ হতে-চাওয়া বাদল বিলেতে বসেও স্বদেশের কথা ভুলতে পারেনি— 'নওলকিশোরের মুখে শুনতে মন যাচ্ছিল গান্ধী কেমন আছেন, কী তাঁর ইদানীন্তন কর্মপন্থা, মডারেটরা সাইমনের উপর বিরূপ হয়ে থাকবে কতদিন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধছে কি না। খুব আশ্চর্য লাগছিল এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। এত কথাও তার মনে আছে! পরিত্যক্ত দেশ সম্বন্ধে এতটা কৌতূহলই বা তার এল কোত্থেকে?' (যার যেথা দেশ)। বিস্ময়কর নয় যে বাদলের বিশ্বচিন্তার মধ্যে ভারতবর্ষের কাস্টসিস্টেমও স্থান পেয়েছে। কেমন করে জাতিপ্রথার উচ্ছেদ করা যায় তার উপায়নির্দেশে অন্তত সাময়িকভাবে তাকে স্বদেশচিন্তায় উত্তেজিত দেখা যায়। আর সুধী বিলেতে থাকলেও সব সময়ই তার মন পড়ে আছে ভারতবর্ষে। সাইমন কমিশন (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ বোম্বাইতে অবতরণ) থেকে শুরু করে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু, শারদা আইন, 'পূর্ণ' স্বরাজের ধারণা ও মোতিলাল নেহরুর লখনৌ-প্রস্তাব, শ্রমিক ধর্মঘট, স্প্র্যাট্ ও ব্র্যাডলির গ্রেপ্তার ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা— এই সময়ের সব ঘটনাই উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে, এবং শুধু ঘটনার উল্লেখ নয়, চরিত্রের উপর তার প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে। গান্ধীজীর স্বরাজের ধারণা সুধীকে তরুণ বয়সেই আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু বিলাতি কাপড় পোড়ানোর যখন সময় এলো তখন সে সম্মত হতে পারেনি— 'যা নিজে তৈরি করতে পারিনে তাকে পোড়ানো হচ্ছে পরের প্রতি ঈর্ষা-প্রণোদিত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাপুরুষতা।' (অজ্ঞাতবাস)। অথচ চরকাকে স্বদেশী আন্দোলনের একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে তার বাধেনি, তার বিশ্বাস, 'চরকায় পার্লামেন্টারী স্বরাজ হোক বা নাই হোক, দেশের শতকরা আশিজন— দেশের কৃষককুল— যদি পরমুখাপেক্ষী হয় তবে সেই হবে গান্ধীজীর স্বপ্নের স্বরাজ!' ১৯২০ সালে সুধী-র পক্ষে গান্ধীজীর নামে জয়ধ্বনি করাই স্বাভাবিক, তখন 'গ্রামে গ্রামে গান্ধীর নাম রাষ্ট্র হয়েছিল। কেউ হাটে গিয়ে শুনে এসে সবাইকে শুনিয়েছে, কেউ আদালতে গিয়ে। গান্ধী যে মানুষ নন, মানুষের বেশে নারায়ণ, এ নিয়ে তাদের কল্পনার অন্ত ছিল না। তিনি যেবার নিকটস্থ শহর দিয়ে রেলপথে যাচ্ছিলেন সেবার রেলগাড়ির প্রত্যেক কামরায় কেবল তিনি, তিনি, তিনি। তাঁকে ধরবার জন্যে সরকার বাহাদুর কত চেষ্টা করছেন, কিন্তু সর্বত্রই তো তিনি, কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন।' (অজ্ঞাতবাস)। কিন্তু ১৯২৮ সালে

অবস্থান্তর ঘটেছে। সুধী-র বয়সও বেড়েছে। সুধীকে তখন আর একান্ত-ভাবে গান্ধীবাদী বলা যায় না। খদ্দর পরে বটে, কিন্তু তার কারণ বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে স্বদেশী মিলের কাপড় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াচ্ছে, আর তাই সে খদ্দরের পক্ষপাতী। 'আমার ধ্যান হচ্ছে টাকার ছড়াছড়ি বা চরকার ঘর্ঘর নয়, আত্মপ্রকাশের বিচিত্র ও প্রশস্ত আয়োজন।' (দুঃখমোচন)। আশ্রম-জীবনের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। গান্ধীজির অহিংসার আদর্শ সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, এমনকি কখনো তার মুখে অহিংস অসহযোগিতার সমর্থনও শোনা যায়। অথচ একালের বিশ্বপটভূমিকায় অহিংস অসহযোগিতার অসহায়তাও তার জানা। রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজির অহিংসা-নীতির প্রয়োগ নিয়ে সুধীর সংশয় আছে— 'ফলাফলের জন্য গান্ধীজীর উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও তিনি পলিটিসিয়ান নন, তিনি সেন্ট। তাঁর চাল অন্যশ্রেণীর চাল। তাঁর অহিংসাও বিশুদ্ধ অহিংসা। কিন্তু অহিংসার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় ক্ষতি হচ্ছে এই যে ন্যায়ের উপর তেমন জোর পড়ছে না। আচারটা মুখ্য হয়ে বিচারকে আড়াল করছে।' (মর্ত্যের স্বর্গ)। অন্যরকম আপত্তিও আছে, যেমন, 'আমি তাঁর শিষ্য, তাঁর মানবপ্রেম আমাকেও আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাঁর মতো পরকে প্রভাবিত করবার প্রত্যাশা নিয়ে স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করতে লালায়িত নই, পরকে প্রভাবিত করতেই আমার অরুচি।' (দুঃখমোচন)। পটবর্ধনের সঙ্গে আলোচনার সময়েও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে সুধী-র মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সুধীকে কখনো মিস্টিক বলা হলেও সে মিস্টিক নয়। দেশকালের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠযোগ। ১৯২৯ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অহিংস বিপ্লবী কর্মতৎপরতাও নতুন উদ্যমে দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, বিক্ষোভ। এর মধ্যে সুধীকে পথ বেছে নিতে হবে। সুধী-র জীবন তাই বাইরে থেকে যতটা নিস্তরঙ্গ, প্রশ্নহীন, প্রশান্ত মনে হয়, আদৌ তা নয়। আর অন্নদাশঙ্করের মতো সুধী-রও মনে জাগে, 'সব প্রশ্নের উপরের প্রশ্ন, কেমন ভাবে বাঁচব। জীবন নিয়ে কী করব। জীবনে কী হব। তর্কে এর মীমাংসা নেই। দৃষ্টান্তে হয়তো আছে। সুধী দৃষ্টান্ত অধ্যয়ন করে।' (মর্ত্যের স্বর্গ)।

দেশকালের সঙ্গে যোগ যেমন সুধীকে বাস্তবতা দিয়েছে, তেমনি তার পূর্বজীবনের বিশদ বর্ণনা তার হয়ে-ওঠার ইতিহাসকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।— 'ওর বাবা ছিলেন কলেজের পণ্ডিত। তাঁর কিছু সঞ্চয় ছিল, তাই হাতে করে বিলেত আসা। মা নেই। ভাই নেই। বোন যদি থাকে তবে তার বা তাদের বিয়ে হয়েছে। কিছু ব্রহ্মত্ব আছে, তারই উপস্বত্ব থেকে

মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটবে। কেবল সুধীদার নয়, তার স্ত্রীর, যদি বিয়ে করে। এবং দুটি একটি সন্তানের, যদি হয়।' (দুঃখমোচন)। সুধী-র মামার উল্লেখ আছে। সুধী-র অনুপস্থিতিতে তিনি জমিজমা দেখাশোনা করেন। ১৯২০ সালে সুধী তখন এক ছোট শহরে অখ্যাত হাইস্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র। এক বছরের মধ্যে স্বরাজ— গান্ধীজীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে সুধী স্বরাজ-আশ্রমে ভর্তি হলো। জাতীয় শিক্ষা-নীতি ও বিদ্যাপীঠের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু তারপর আশ্রম ভেঙে গেছে— সতীর্থ শ্রীরতনের সঙ্গে সে ভারতভ্রমণে বেরিয়েছে। ভারতবর্ষের গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয়লাভের এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে সত্যান্বেষণের সহায়ক হয়েছে। গ্রামের মানুষকে সাহায্য করতে গিয়ে শ্রীরতন ও সুধী দুজনেই রাজদ্বারে চালান হয়ে গেল। শ্রীরতন ইংরেজ আদালতের সঙ্গে অসহযোগ করায় কারাবরণ করল। কিন্তু 'সুধী অমন মূঢ়তার পরিচয় দিল না। সমস্ত খুলে বলল। বন্ড্ দিতে অস্বীকৃত হয়ে শ্রীরতন গেল জেলে। বেকসুর খালাস হয়ে সুধী পড়ল একলা।" শ্রীরতনের মূঢ়তা ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু সুধী বন্ড্ দিতে স্বীকৃত হয়ে বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছে। বোঝা গেল সুধী শুধু অসহযোগ আন্দোলনে নয়, দেশোদ্ধারের তথাকথিত 'স্বদেশী' পথে বিশ্বাস হারিয়েছে। তা না হলে পিতৃবন্ধু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেনের গৃহে আশ্রয় নিতে পারত না। তারপর বাদলের আগ্রহাতিশয্যে পাটনা কলেজে সুধী তার সহপাঠী হল। এই সময়ই সুধী-র মনে জাগে জীবনজিজ্ঞাসা— 'এর উত্তর কেউ কারুকে দিতে পারে না, বাদল। নিজের কাছে বহু সাধনায় মেলে। ধর্মগ্রন্থে এর নিদর্শন আছে। কিন্তু তাতে তোমার সন্তোষ হবে না। আমারও হয় না। নিজের উপলব্ধিই আসল। অপরাপরদের উপলব্ধির সঙ্গে তার তুলনা করবার জন্যে শাস্ত্র পাঠ করি। মিল দেখলে আনন্দ পাই, না দেখলে অন্তরের দিকে চোখ ফেরাই। শঙ্করভাষ্য অগ্রাহ্য করে আমার আপন ভাষ্য রচনা করি। আমার অপরোক্ষ অনুভূতি আমার আদিম প্রমাণ; গীতা উপনিষদ আমার মধ্যবর্তী প্রমাণ; আমার স্বকীয় ভাষ্য আমার অন্তিম প্রমাণ।' (অজ্ঞাতবাস)। সুধী-র স্বকীয় ভাষ্য কোনো পূর্ণতা পায়নি তাই নিজেকে সে আধ্যাত্মিক-প্রকৃতির তো নয়ই, এমনকি দার্শনিকও বলতে চায়নি। সুধী-র কাছে সন্ধানটাই বড়ো, আর সেই সন্ধানের পথে দেশবিদেশের সাধক মনীষী দার্শনিকের চিন্তাভাবনার সাহায্য সে নিয়েছে।

সুধীকে তাই সত্যের রূপক বলেই এক অদ্ভুত আশ্চর্য প্রাণী মনে হওয়ার কারণ নেই। এক ধরনের আদর্শবাদ তার মধ্যে আগাগোড়া দেখা গেছে—

গোমাংস আহার থেকে নৈতিক অসংযম— সব কিছু তার কাছে আপত্তিকর ; কিন্তু প্রাণের সাবলীল গতি, যৌবনধর্ম, সৌন্দর্যবোধ বিসর্জন দিয়ে নীতি-বাগীশ সাজার ইচ্ছা তার মধ্যে কখনো জাগেনি। সে বাঁশি বাজায় ; নিসর্গপ্রকৃতি তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। গান্ধীজির সঙ্গে এখানে সে মতানৈক্য অনুভব করে— 'গান্ধীজীর সঙ্গে এ ক্ষেত্রেও আমার অমিল। এত বড় মানবপ্রেমিকের মধ্যে এতটুকু প্রকৃতিপ্রেম নেই, এ আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। প্রাণীর প্রতি এত মমতা, প্রাণের সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের আভাস নেই।' (দুঃখমোচন)। তবে সুধী-র কাছে নিসর্গপ্রকৃতি যেন নারীর বিকল্প, মন খারাপ হলেই সে প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে— 'প্রকৃতির সান্নিধ্য তার ভিতর-বাহির আপ্লুত করেছিল অনির্বচনীয় প্রীতিরসে। প্রকৃতিই তার স্ত্রী, অন্য কেউ নয়। অন্য কেউ হতে পারে না। অশোকার কথা ভেবে তার হাসি পাচ্ছিল।' (কলঙ্কবতী)।

অথচ অশোকার সঙ্গে 'মনের খুশি' সম্পর্ক পাতানোর সময় সুধী প্রকৃতি ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিও আকর্ষণ বোধ করেছে। তার আত্মবিশ্লেষণ থেকে আমরা জানি, 'মেয়েদের সম্বন্ধে সে কোনোদিন চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেনি। এর কারণ এ নয় যে, সে কামিনীকাঞ্চনে বিরাগী। এও নয় যে তার ভোগ-ক্ষমতা দুর্বল। যথার্থ কারণ, সে ভালোবাসার মতো কাউকে দেখেনি। তার ভালোবাসা তার সমগ্র সত্তা জুড়বে, তার জীবনের সবটাকে জড়াবে। জীবনশিল্পে পুনরুক্তির স্থান নেই। তাই সুধী-র অনুরাগ হবে একানুগ।' (অজ্ঞাতবাস)। অশোকার সঙ্গে পরিচয়ের পর সুধী-র হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে এমন নয়। সুধী বলেছে, 'আমাকে সাধু-সন্ন্যাসীর মতো দেখায়। কিন্তু তা যে আমি নই আপনিই ভালো জানেন। আপনার সঙ্গে আমি তাস খেলেছি। আলাপ করেছি। রঙ্গ করেছি। মনের খুশি সম্পর্ক পাতিয়েছি। বয়স্যদের সমাজে আমি আড্ডা দিয়ে থাকি। কাউকে উন্নত করার সংকল্প আমার নেই ও সংকেত আমি জানিনে। সত্য বলে যাকে বুঝি তার প্রচার আপাতত চাইনে, তার ব্যতিরেকে সংসার অচল হয়েছে বা হবে এ ধারণা আমার নেই। অপরে যাকে সত্য বলে বোঝে তাকে আমি গ্রহণ করতে পারি কি না ভেবে দেখি, নির্বিচারে উপেক্ষা করিনে।' (কলঙ্কবতী)। সুধীকে আদর্শায়িত করার কোনো চেষ্টা এখানে নেই। সুধী মনে মনে অশোকাকে নিয়ে দাম্পত্যজীবনের স্বপ্নও দেখেছে (অজ্ঞাতবাস)। অশোকাকে প্রত্যাখ্যানের সময় সুধী-র মুখে যে-সব আদর্শের কথা শোনা যায় তার অনেকটাই আরোপিত, হয়তো আত্মপক্ষ সমর্থনে তৈরি-করা এক বক্তৃতা (অশোকার মধ্যে আত্মনির্ভরতার অভাব ও পল্লীগ্রামভীতি যেন হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে)— 'আমাদের জাতীয় আদর্শে

অটল থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থার আমূল সংশোধন সম্ভব কি না তাই নিয়ে আমি চিন্তায় মগ্ন, আমার জীবিকার চিন্তাও সেই বৃহত্তর চিন্তার অঙ্গ। তুমি আমার সঙ্গিনী হবে এর চেয়ে সৌভাগ্য আমার কি হতে পারে, মণি। কিন্তু তা যদি হও তো হবে স্বেচ্ছায়। আমি তোমাকে নিশিদিন মনে মনে আহ্বান করেছি বটে, কিন্তু বাচনিক আহ্বান করলে অন্যায় করব। তোমাকে দেবার মতো স্নেহময়ের যা আছে, আমার তার শতাংশ নেই, আমার উপার্জনের ক্ষমতা তো নেইই, অভিলাষও নেই।' (দুঃখমোচন)। সুধী মুখে যাই বলুক না কেন, মনে জানে উজ্জয়িনীকে স্বপ্নে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করার পর অশোকার সঙ্গে দাম্পত্য-জীবনের কথা আর ভাবা যায় না— 'নারীর দান ফিরিয়ে দেবার মতো ধনী সে নয়, সে পূর্ণবয়স্ক মানুষ, নারীকে তার সত্তার নিগূঢ় প্রার্থনা। কিন্তু সে যে স্বপ্নে অঙ্গীকার করেছে উজ্জয়িনীর বৈরাগ্য গ্রহণ করবে। স্বপ্ন তার কাছে নিতান্ত নিরর্থক নয়।' (কলঙ্কবতী)। আন্ট এলেনর ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। তিনি প্রথমে সুধীকে তথাকথিত বৈরাগ্য থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন, 'যে ত্যাগ তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, যাকে স্বীকার করতে তুমি স্বাভাবিক আনন্দ বোধ করছ না, তেমন ত্যাগ নাই-বা করলে। কোন সার্থকতার জন্যে তুমি বৈরাগ্য বহন করবে?' পরে কৌতুক করে বলেছেন, 'যদি তুমি বৈরাগী না হয়ে অনুরাগী হতে তবে তোমার চিকিৎসার ফল হত, সুধী।' (অজ্ঞাতবাস)। অবশ্য অশোকা আর উজ্জয়িনীকে নিয়ে একটা দ্বন্দ্বের আভাসমাত্র আছে, কিন্তু অশোকা যে জীবনশিল্পীর ডিজাইনের বাইরে অবস্থান করছে, তাই প্রত্যাশিত সংকট স্বপ্ন দর্শনের সাহায্যে পরিহার করা সম্ভব হল। আসলে সুধী শুধু উজ্জয়িনীর শুভাকাঙ্ক্ষী নয়, মনে মনে অনুরাগীও বটে। উজ্জয়িনীকে দেখার আগেই অনুরাগের সঞ্চার। উজ্জয়িনীকে দেখার পর বিষাদ, উত্তেজনা, উদ্বেগ যেন তার এতদিনের সাধনাকে মিথ্যা করে দিয়েছে। একদিন 'উদ্বেগরাহিত্য' ছিল তার সাধনার অঙ্গ। কিন্তু এখন 'সে আলোক বর্জন করে সুড়ঙ্গে বেড়ায়। অবিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণে জাগে উজ্জয়িনীর ধ্যানমূর্তি।' সুধী 'নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি' অর্জনের কথা বলেছে, কিন্তু সে দৃষ্টি রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, আর সেখানেই সে রক্তমাংসের মানুষ— 'সুধী-র সহসা মনে হলো, কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী, কে কার বন্ধু, কে কার ভাই। সামাজিক সম্পর্কই কি সব। সেই সম্পর্কই কি রিয়াল! আমরা যে চির-পুরাতন চির-নবীন আত্মা। আমাদের সকলের সঙ্গেই সকলের আত্মীয়তা, সকলের সখ্য, সকলের প্রেম। পরস্পরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, যেতে যেতে স্নেহভালোবাসা পাচ্ছি। সমাজ আছে, সমাজের কানুন আছে, কিন্তু সেই একমাত্র রিয়ালিটি নয়, চরম

রিয়্যালিটি নয়। সবার উপরে মানুষ সত্য। তা যদি না হতো তবে রাধা-কৃষ্ণের অসামাজিক প্রেম যুগ যুগ ধরে ভারতের হৃদয় অধিকার করত না।' (অপসরণ)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামাজিক সংস্কারই জয়ী হলো। এর বীজ আগেই ছিল— 'প্রকৃতিকে আমি কম ভালোবাসিনে, কিন্তু সমাজকে ভালোবাসি আরও বেশি।' (দুঃখমোচন)। তাই উজ্জয়িনী যতদিন সামাজিক আচার তথা ধর্মসংস্কারকে মেনেছে, ততদিন তার প্রতি ছিল সুধী-র অপার করুণা, সহানুভূতি, এমনকি তাকে ভালোবাসাও ছিল সম্ভব। কিন্তু উজ্জয়িনীর পরিবর্তনের সংগে সুধী-র পরিবর্তন তাল রাখতে পারেনি— 'এতদিন সে উজ্জয়িনীর পক্ষে ছিল, কেননা ধর্ম ছিল উজ্জয়িনীর পক্ষে। এখন এই উক্তির পর উজ্জয়িনী সুধীর সহানুভূতি হারালো, কেননা ধর্মের সমর্থন হারালো।' (অপসরণ)।

সুধী-র আত্মসংকট হয়তো উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমশ সুধী-র আত্মসংকটের মধ্য দিয়ে তথাকথিত প্রজ্ঞার সংকট প্রবল হয়ে উঠেছে। সুধী-র সাধ এবং সাধ্যের মধ্যেও দেখা দিয়েছে অসেতুসম্ভব বিচ্ছেদ। সুধী বিলেত এসেছিল শুধু দেশ দেখবার জন্যে নয়— 'আমি দূরত্বের দূরবীন সংযোগে ভারতবর্ষকেই দেখবার জন্যে এসেছিলুম, ইংলন্ডে না এসে ফিজি দ্বীপে গিয়ে থাকলেও আমার কাজ হতো। তবে ইংলন্ডের সংগে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ এমন যে আমরা বিদেশ বলতে সচরাচর ইংলন্ডকেই বুঝি, আমাদের ভাষায় ইংলন্ডের প্রতিশব্দ বিলাত।' (অজ্ঞাতবাস)। অশোকাকে লেখা ভারতবর্ষ থেকে সুধী-র চিঠি থেকে জানি, 'ইউরোপ দর্শনের পরে ভারতকে আমি নতুনভাবে আবিষ্কার করছি।' বিলেতে থাকবার সময় ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনার কথা বারবার সে বলেছে— 'গ্রামে গিয়ে পৈতৃক ভদ্রাসন-খানার জীর্ণ সংস্কার করবে ও বর্গাদারদের হাত থেকে জমির আবাদ নিজের হাতে আনবে।' (দুঃখমোচন)। 'সুধী-র খেয়াল সে নিজের হাতে লাঙল ঠেলবে, বীজ বুনবে, আগাছা বাছবে, ফসল কাটবে। নির্ভরযোগ্য স্নেহবশ জনকয়েক চাকর — না, চাকর নয়, সাথী— যদি মেলে তবে চাষ করেও প্রচুর অবসর থাকবে, সেই অবসরে গ্রামের কাজ করবে। গ্রাম্য সমাজের পুনর্গঠন না হলে গ্রামের পুনর্গঠন সম্ভব নয়। অথচ সামাজিক পুনর্গঠন না হলে গ্রামের পুনর্গঠন সম্ভব নয়। অথচ সামাজিক পুনর্গঠন কী করে হবে যদি ভদ্র এবং ইতরের সম্পর্ক হয় শোষকের এবং শোষিতের সম্পর্ক। সুধী তাই নিজের শরীর দিয়ে করতে চায় সেতুবন্ধন, ইতরভদ্রের মধ্যে কর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠা।' (মর্ত্যের স্বর্গ)। কিন্তু সুধী জেনেছে তার পরিকল্পনাকে বাস্তব-রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। — 'একালে উপযুক্ত গোরু যদি বা পাওয়া যায়, উপযুক্ত ভৃত্য পাওয়া দুষ্কর। দেশে লক্ষ্মীর কোপে দিনমজুরের সংখ্যা

অজস্র ও দাবি সামান্য। কিন্তু সস্তা ও রোগা গোরুর মতো চাষ অর্ধেক মাটি করে। যেমন গোরু তেমন কৃষাণ না হলে যেমন কৃষাণ তেমনি গোরুই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তার জন্যে সুধীর মতো মানুষের তত্ত্বাবধান নিষ্প্রয়োজন। বর্গাদার দিয়ে চাষ করালে অর্থের দিক থেকে কিছু লোকসান গেলেও সময়ের দিক থেকে, আরামের দিক থেকে পুষিয়ে যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে সেই জন্যে জমি বর্গা দিয়ে নিশ্চিন্ত। ওদিকে বর্গাদার স্বত্ববান না হওয়ায় জমির উপর তার লেশমাত্র মমতা থাকে না, স্থূল হস্তের পীড়নে তাকে নিঃস্বত্ব করে ছাড়ে। তা দেখে যে মালিকের করুণা হয় তিনি তাঁর জমি বেচে ফেলেন কিংবা তার উপর খাজনা ধার্য করেন। সুধী-র পক্ষে দুই সমান। খাজনা আদায় করাই যদি তার জীবিকা হয়, তবে সে হয় উপস্বত্ব-ভোগী পরাসক্ত জীব। আর জমি বেচলে দেশের মাটির সঙ্গে তার নাড়ির যোগ রইল কোথায়।'

সুধী যেখানে পরম সত্যের সন্ধানী সেখানে তাকে দার্শনিক বললে ভুল হবে না। কিন্তু সে দার্শনিক হলেও সাংসারিক-জ্ঞানবর্জিত নয়। এখানেই তার মনে জাগে অসংখ্য প্রশ্ন— ইউরোপের ধনসম্ভোগবাদ পরিহার্য, কিন্তু ভারতের নিবীর্যতাই কি কাম্য? — 'পরমার্থই প্রথম, কিন্তু প্রথমের সঙ্গে দ্বিতীয়ের তো বিবাদ নেই। প্রথমকে ছেড়ে দ্বিতীয়ের পশ্চাতে ছুটব না, কিন্তু প্রথমকে হাতে রেখে দ্বিতীয়ের সন্ধানে যেতে দোষ কি?' (দুঃখমোচন)। আরও কিছু প্রশ্ন সুধী-র মনে জাগতে পারত। বাদল তাকে একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, 'এই যে তুমি বিলেতে আছ, তোমার খরচ আসছে জমিদারির প্রজাদের কাছ থেকে কিংবা জীবনবীমার কোম্পানির কাছ থেকে। কোম্পানিও টাকা লাভের ব্যবসায় খাটিয়েছিল, ও-টাকা শোষণের টাকা। তুমি তোমার এই খরচের কী হিসাব দিচ্ছ, শুনি? দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করছ। তাতে কার কী প্রাপ্তি? প্রজারাই বা কী পাচ্ছে, শোষিতদের পাওনা কীভাবে মিটছে?' (অপসরণ)। আসলে সুধী-র সত্যানুসন্ধানের মধ্যেও একটা ফাঁক আছে। সুধী যে ইউটোপিয়ার আদর্শ ধ্যান করে সেখানে হিংসা নেই, শোষণ নেই। তার বিশ্বাস 'আমি আমার দেশবাসীকে এমন ভাবে প্রস্তুত করব যে এক পক্ষ যখন নিতে প্রস্তুত হবে অপর পক্ষ তখন দিতে প্রস্তুত হবে। চাষীরা যখন জমির মালিক হতে চাইবে মালিকরা তখন জমি ছেড়ে দিতে চাইবে। জমি ছেড়ে দিয়ে কারুশিল্পে মন দেবে।' কিন্তু বাদল সংগত কারণেই মন্তব্য করে, 'তাতেও শোষণ চলে। সেটাও শোষণ ব্যবস্থার অঙ্গ।' সুধী-র সমাধান কিছুটা বিস্ময়কর— 'মুনাফা আমি চাষীর কাছ থেকে না নিলে তাঁতীর কাছ থেকে নেব। নিয়ে ওদের জন্যেই খরচ করব, অবশ্য নিজেকে একেবারে বঞ্চিত করব না।' সুধী-র শেষ-কথা হল 'অন্তরের পরিবর্তন'।

— 'যদি অন্তরের পরিবর্তন হয় তবে প্রাইভেট প্রফিট থাকলে ক্ষতি কি? রাষ্ট্র কি আমার চেয়ে বিজ্ঞ? আমার চেয়ে বেশি দরদী? ওটা তো একটা মেশিন। চাষীরা ও তাঁতীরা আমার কাছে দু'চার পয়সা ঠকে তো সে পয়সা আমাকে ঠকিয়ে ফেরৎ নেবে। কিন্তু রাষ্ট্র যে নিজের খোশখেয়ালে চাষীকে মিলহ্যান্ড, তাঁতীকে মেকানিক বানিয়ে ভিটেমাটি ছাড়াবে। সংস্কার হারিয়ে, সংস্কৃতি হারিয়ে, নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মতো কোথায় তলিয়ে যাবে ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।' তাই রাষ্ট্র এবং যন্ত্রের বিরুদ্ধে সুধী-র জেহাদ. সুধী-র বিশ্বাস ভারতবর্ষের জনগণ 'আধুনিক সভ্যতা'কে অগ্রাহ্য করবে। আধুনিক সভ্যতাকে সুধী-র মনে হয় এক চোরা-গলি। তার বিশ্বাস 'আমরা ভারতের অশিক্ষিত অসভ্য গ্রাম্য নরনারী, আমরা তো তোদের মতো কলকারখানার জঙ্গলে হারিয়ে যাইনি, আমরা সংকল্প করব নিজের জমিতে নিজের ফসল ফলিয়ে নিজের হাতে কেটে নিজে রেঁধে খেতে। নিজের জমির তুলো নিজের চরকায় কেটে নিজের তাঁতে বুনে নিজে পরতে। এ যদি একা আমার খেয়াল হয় তবে এর ভবিষ্যৎ নেই, কিন্তু এটা একটা বিরাট দেশের বিশাল সমাজের নীতি।' (অপসরণ)। সুধী নিজেকে প্রগতি-বিরোধী মনে করে না। আসলে তার প্রগতির ধারণা প্রচলিত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। একে একধরনের নৈরাজ্যবাদী মনোভাব বলতে পারি।* সেখানে আপস চলে না।

অন্যদিকে সুধী যতই নিজেকে 'চির স্থবির' বলুক না কেন, দু-বছর বিলাত-প্রবাসে পরিবর্তনও তার কম হয়নি। উপন্যাসের শেষে হিসাব-নিকাশের সময় সুধীকে স্বীকার করতে হয়েছে, 'হাঁ। আমিও মানুষ। আমারও এক-আধটা ইসক্রুপ আলগা হয়েছে।' যথা— 'আগে আমার ধারণা ছিল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির ঠোকাঠুকি বাধলে সমাজ সব সময় অভ্রান্ত, ব্যক্তি সব সময় ভ্রান্ত। এখন সে ধারণা শিথিল হয়েছে। সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণার শৈথিল্য আমার নিজের কাছেই অপ্রীতিকর। কিন্তু কী করব, সত্য কি সকলের ঊর্ধ্বে নয়।' (অপসরণ)। হয়তো উজ্জয়িনীর জীবনধারাই সুধীকে জীবন সম্বন্ধে নতুনভাবে ভাবিয়েছে। সুধী-র পরিণতি আমাদের অজ্ঞাত। অন্নদাশঙ্কর 'ক্রান্তদর্শী'র চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'সুধী-র ভূমিকাকে ঘিরেই নতুন উপন্যাস দানা বাঁধে।... কিন্তু সত্যাসত্যের

* দ্র. "এক জীবনে অনেকবার স্বপ্ন দেখা গেল। প্রথম বয়সে ছিল নৈরাজ্যের স্বপ্ন।... সংসারের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। দেখা গেল 'চাই' বললেই 'পাই' হয় না। প্রেম, মৈত্রী, সৃষ্টির প্রেরণা ইত্যাদি সহজলভ্য নয়। মেলে সবই, কিন্তু দৈবে মেলে, বহু সাধনায় মেলে। তার উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়া যায় না, রাষ্ট্র গড়া যায় না।" (স্বপ্নের পর স্বপ্ন, ১৯৫৫)

সুধী যেমনটি, ক্রান্তদর্শীর সুধী তেমনটি হতে পারে না। হলে পদে পদে জবাবদিহির দায় থাকে। না, সুধীকে আমি স্মরণ করলেও নিজের মতো করে বাঁচবার ও বাড়বার স্বাধীনতা দিয়েছি। সেই জন্যে নাম পালটে দিয়ে 'সৌম্য' করেছি। সৌম্য সুধীই, তবু সুধী নয়। ঘটনার আবর্তে পড়ে সে তার স্থিতপ্রজ্ঞ স্বরূপ বজায় রাখতে পারেনি। সে বিনোবার মতো স্থিতপ্রজ্ঞ নয়। সৌম্য সৌম্যই। সে সুধী নয়।' শুধু সৌম্য নয়, সুধীও কি তার স্থিতপ্রজ্ঞ স্বরূপ বজায় রাখতে পেরেছে? অন্নদাশঙ্কর অন্যত্র বলেছেন, 'সত্যকে ভারতের লোক সবচেয়ে উচ্চ আসন দিয়ে এসেছে, নতুবা মহাভারতের নায়ক হতেন কৃষ্ণ কিংবা অর্জুন। ভবিষ্যতে যখন মহাকাব্য রচিত হবে তখন ভারতের মহাকবি সত্যকেই শীর্ষস্থান দেবেন, নায়ক করবেন গান্ধীজীকে।' (গান্ধীজী, ১৯৪৬)। 'সত্যাসত্যে'র কোনো পাঠক এই জন্যই সম্ভবত সুধী প্রসঙ্গে মহানায়ক গান্ধীজির উল্লেখ করেন (গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য)। কিন্তু সুধী বা সৌম্য যেমন বিনোবার মতো স্থিতপ্রজ্ঞ নয়, তেমনি গান্ধীর মতো সত্যসন্ধও নয়— তারা কেউই মহাকাব্যের নায়ক নয়। সুধী সত্যসন্ধানী হয়েও পথ ও অপথের মধ্যে দোলাচলচিত্ত। সুধী-র অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র না হতে পারে, 'কিন্তু মানুষের জগতে বহির্দ্বন্দ্ব আছে, সুধীও মানুষ, তাকেও বহির্দ্বন্দ্বের দিনে অস্ত্র ধরতে হবে। সে অস্ত্র পুরনো না হয়ে নতুন হলেও তা অস্ত্র, তার সঙ্গে নিজের ও পরের ক্ষয়ক্ষতি জড়িত। তার দ্বারা হৃদয় জয় করতে চাইলেও জ্বালার উপশম হয় না। জ্বালা উভয় পক্ষেরই।' (অপসরণ)। তাহলে দ্বন্দ্বকে পরিহার করতে চাইলেও পরিহার করা যায় না। তবে সুধী-র আসন্ন সংসার-প্রবেশের খবর দিয়েই 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের সমাপ্তি। সত্যের আসল পরীক্ষা অপেক্ষা করে আছে সংসার-জীবনে। সেই সংঘাত-সংক্ষোভময় জীবনের আভাসটুকু মাত্র 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের শেষের দিকে পাই। পরিপূর্ণ চিত্র নেই। সুধী ও তার সত্যের পরীক্ষা তাই অনভিনীত নাট্যের নেপথ্যে রয়ে গেল। হয়তো তাই অতৃপ্তি জাগে। কিন্তু সুধীকে বা তার সাধনাকে সে জন্য ব্যর্থ বলতে পারি না॥

ঐতিহ্যের সূত্র, আধুনিকতার নির্মাণ
অন্নদাশঙ্করের ছড়া

পবিত্র সরকার

॥ এক ॥

ছড়া কেন লেখেন অন্নদাশংকরের মতো মানুষ? বিশেষত যে-মানুষ বড়োদের জন্য লেখেন ভাবগম্ভীর কবিতা, একাধিক সত্যাসত্য-সন্ধিৎসু, জীবনসন্ধানী 'এপিক'-ধর্মী ও অন্যান্য উপন্যাস, বহু সরস, মেদুর এমনকী 'মীন-পিয়াসী'-র মতো প্রায় দার্শনিক, ছোটোগল্প এবং সর্বোপরি অসংখ্য প্রবন্ধ, যে প্রবন্ধ অনেকটাই আত্মকথনধর্মী, যেন বা নিজের সঙ্গে নিজের বিচার, বিষয়কে সূত্র করে নিজের ভাবনার উন্মোচনই যাঁর লক্ষ্য? অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো জীবনবিস্তারী এমন একজন লেখক— যিনি বহুধা কর্মে এবং বিচিত্র সৃষ্টিতে নিজেকে বিকীর্ণ করেছেন, তিনি কেন ছড়া লেখারও কথা ভাবলেন? অন্য সব লেখায় তো তাঁকে এমন লঘু মেজাজে দেখি না। বস্তুতপক্ষে ছড়া না লিখলে অন্নদাশংকরের যে-মূর্তি আমাদের সামনে তৈরি হত তার সম্বন্ধে এই কথাগুলি কিছুতেই বলতে ভরসা পেতাম না আমরা, যে-কথাগুলি তিনি চাইছেন তাঁর 'এপিটাফ'-এ লেখা হোক—

ফুর্তি করতে ভালোবাসত
ভালোবাসত ফুর্তি করে
ফুর্তি করে কাজ করত
ফুর্তির ছল পেলে বর্তে যেত। (১৮২)[১]

তাঁর যা 'পাবলিক ইমেজ', তা থেকে এই কথাগুলি মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা হত। তাঁর ঘরে বা পরিবারে তাঁর ছবিটিও আমাদের কাছে ততটা এসে পোঁছোয়নি, ফলে তাঁর ছড়াগুলিই শুধু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রায় অচেনা একটা দিক আমাদের সামনে খুলে দেয়, তাঁর 'এপিটাফ'-এর দাবিকে অর্থবহ করে তোলে। ছড়ালেখক অন্নদাশংকর খুব স্পষ্টভাবেই অন্য অন্নদাশংকর থেকে পৃথক হয়ে যান। প্রবন্ধকার এবং কথাকার অন্নদাশংকরের মধ্যে একটা কোনো আত্মীয়তা আছে, কখনও কখনও দুয়ের অন্বিষ্ট এক হয়ে যায়, আবার

তাঁর কবিতার পৃথিবীও যেন ছন্দে-বন্ধে বিনুর অনেক কথাই বলে দেয়। ফলে প্রবন্ধ কথাসাহিত্য-কবিতা— এই তিন ধরনের প্রকাশনা একই ব্যক্তির উৎস থেকে ঘটেছে, এমন বিশ্বাস খুব দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে না। কিন্তু ছড়ার অন্নদাশঙ্কর এ তিনের স্রষ্টার থেকেই একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন, মেজাজে, ভঙ্গিতে, লেখক ও পাঠকের তুলনামূলক অবস্থানে তিনি অন্য সব অন্নদাশঙ্করের চেয়ে পৃথক। প্রবন্ধে আখ্যানে কবিতায় অন্নদাশঙ্কর পাঠকের সহৃদয় ও ভাবুক বন্ধু, তাঁর সহজিয়া সখ্য পাঠকদের জীবনসম্বন্ধে কিছু গূঢ় সন্ধানে ডাক দেয়, তাঁর নিজের সন্ধানের সঙ্গী করে। কিন্তু ছড়ায় অন্নদাশঙ্কর ছোটো-বড়ো সমস্ত পাঠকের প্রায় অব্যাহতরূপে ফূর্তিবাজ এক খেলার সাথি, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই মজা আর কৌতুক জমিয়ে তোলেন তিনি। আমাদের ভেবে বিস্ময় লাগে যে, কোনো এক আশ্চর্য কৌশলে কিন্তু দুর্বোধ্য কারণে তিনি তাঁর এই মুখটি অন্যান্য রচনায় প্রায় সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছেন। তাতে হয়তো অন্যান্য রচনা কিছুটা বঞ্চিত হয়েছে। ছড়ার ঠাট্টা-তামাশা ও ক্ষণিক ফিচলেমি তাঁর অন্য সব লেখারও চরিত্র বদলে দিতে পারত।

ছড়া কেন লিখলেন তাঁর অজুহাত একটা অবশ্য তিনি দিয়েছেন 'ছড়া সমগ্র'-র (১৯৯৪) ভূমিকায়— "যারা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে আয়েসে আরামে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের শ্রমের ঋণ আমি শোধ করব কী উপায়ে? আমি তো চাষী বা কারিগর বা মজুর নই। এ ঋণ অর্থ দিয়ে শোধ করা যায় না। সেইজন্যে গান্ধীজী বলেছেন সুতো কেটে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ঋণ শোধ করতে। কায়িক শ্রমে আমার মন নেই। জোর করে চরকা কেটেছি, ছেড়ে দিয়েছি। পিতৃঋণ ঋষিঋণ ইত্যাদির মতো এটাও একপ্রকার ঋণ। কাব্যে বা উপন্যাসে বা প্রবন্ধে এ ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি। পারবও না। কোনো মতেই সে সব রচনা সহজবোধ্য হবে না। সহজবোধ্য করতে গেলে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। সেটা আমার নীতি নয়। তাহলে আমি কী করব? আমি ছড়া লিখব। কিন্তু লিখতে পারব কি? 'না' 'না' করতে করতে একদিন লিখেই ফেলি…"

তাহলে কথাটা এই যে, গল্পে-উপন্যাসে প্রবন্ধে এমনকী তাঁর স্বকীয় গীতিকবিতায় অন্নদাশঙ্কর যে-পাঠকগোষ্ঠীকে সম্ভাষণ করছেন তারা মূলত তাঁর সমপর্যায়ের এবং কিছুটা সীমাবদ্ধ, কিন্তু ছড়ার পাঠকগোষ্ঠী অনেক ব্যাপক— তার মধ্যে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ থেকে নিরক্ষর মানুষ— শ্রমজীবী ও 'অবুদ্ধিজীবী'— সকলেই থাকতে পারেন। তার কারণ ছড়া যতটা পাঠ্য তার চেয়ে অনেক বেশি করে আবৃত্তিযোগ্য এবং শ্রাব্য, এমনকী গান হিসেবেও তা পাঠ্যতার ছোটো গণ্ডি খুব সহজেই পেরিয়ে যেতে পারে— 'তেলের শিশি ভাঙল ব'লে' ছড়াটির ক্ষেত্রে যা হয়েছে। অর্থাৎ ছড়া লেখা রবীন্দ্রনাথের

নাটকের উপনন্দের মতো অন্নদাশঙ্করেরও এক ধরনের ঋণশোধ— তা সাধারণ মানুষের ঋণ, তাঁর দেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ঋণ। এখানেও আবার তাঁর 'মীন-পিয়াসি' গল্পের কথা মনে পড়ে যায় আমাদের। ছড়া যেহেতু একসময় ছিল লৌকিক রচনা, ব্যক্তির উৎস থেকে নির্গত হলেও যা বহুর রচনা হিসেবেই এমনভাবে গৃহীত হত যেন তা বহুর দ্বারাই রচিত হল, অন্নদাশঙ্কর তাঁর ছড়ার ভাষা ও নন্দনতত্ত্বকে সেই লোকনন্দনতত্ত্বের এবং লোকপ্রকরণের খুব কাছাকাছি রেখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিপ্রধান নাগরিক ছড়ার ঢং থেকে দূরবর্তী থেকেছেন। এ বিষয়টি পরে[২] আমরা আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করব, কিন্তু অন্নদাশঙ্করের ছড়ার এই উৎসটি বুঝতে না পারলে এই সাহিত্য-রূপটির বিষয় এবং প্রকরণের স্বচ্ছতা ও সরসতার বিষয়টিও সম্যক স্পষ্ট হবে না।

॥ দুই ॥

অন্নদাশঙ্করের ছড়া প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশের একেবারে প্রথম থেকেই, 'মৌচাক' শিশুপত্রিকার জন্য প্রথমত। 'ছড়া-সমগ্র'-তে সংকলিত প্রথম ছড়া 'লণ্ডন ফগ'-এর তারিখ ১৯২৭ অর্থাৎ তেইশ বছর বয়সের; শেষ ছড়া 'চাবুক'-এর ১৯৯২। তিনি এখনও, এই নবতি-অতিক্রান্ত বয়সেও ছড়া লিখছেন জানি, যদিও অন্যান্য লেখায়, বিশেষত গল্প-উপন্যাস আর কবিতা লেখায় বেশ কিছুদিন ভাঁটা পড়েছে। 'ছড়া-সমগ্র'-র মোট ৫৬৪টি ছড়া, ছোটোদের ২৬৬টি, বড়োদের ২৯৮টি। নিছক গণিতের হিসেবে বড়োদের ছড়া খানিকটা পরিমাণে বেশি হলেও বড়োদের ছড়ার মধ্যে কিছু রচনা আছে যা ঠিক ছড়া নয়, কবিতাই বলা যায়; 'পোড়ামাটি'-তে অমিত্রাক্ষরের প্যারডি, 'দিলীপদাকে', 'বিষ্ণুকে'— এগুলিকে লঘুরসের কবিতা ছাড়া অন্য কোনো নাম দেওয়া যায় না। 'সৈনিক', 'পাপ', 'মণিদাকে', 'খোকনকে', 'নিত্য নূতন দ্বন্দ্ব', এমনকি 'কলকাতা'-র প্রথম অংশ তো ছড়ার লঘুরসকে পরিহারই করেছে। এরকম আরও বেশ কিছু পাই। ছোটোদের ছড়াতেও 'শিশুর প্রার্থনা' (২৯-৩০) একটি সুন্দর কবিতা ছাড়া কিছু নয়—

জগৎ জুড়ে ভয়ের মেলা
ভয় লাগে যে সারা বেলা
কেমন করে করব খেলা
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু!
ভয় ভেঙে দাও সকল লোকের
সকল রোগের সকল শোকের
সকল রকম ভয়ানকের
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।

আবার 'ছড়া-সমগ্র'-তেই, বা মূল বইগুলিতে, এমন কিছু বড়োদের ছড়া মুদ্রিত হয়েছে যেগুলি ছোটোদের ছড়া বলেও দিব্যি চালানো যায়। যেমন 'উড়কি ধানের মুড়কি'-র 'হিতোপদেশ', 'কাজী'। এ বইয়েরই 'চাল না পেলে'-র মাত্র একটি ছড়াই—'গাঁজা খাবেন চার ছিলিম'—ছোটোদের পাঠ্য হিসেবে আপত্তিকর মনে হতে পারে, বাকিগুলি নেহাতই নির্দোষ। এইরকম 'লেবু', 'বাজার', 'শিলনোড়া সংবাদ', 'পরামর্শ', 'শালিধানের চিঁড়ে'-র 'চাঁদে নিয়ে যাও' 'যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ'-র 'বাঘের পিঠে' ইত্যাদি। ছড়ার বইয়ের নামকরণও বোঝা যায় না তা বড়োদের, কারণ একই লৌকিক ছড়ার দুটি পদগুচ্ছ ভেঙে একটিতে ছোটোদের ('বিন্নি ধানের খই') অন্যটিতে বড়োদের ছড়ার বইয়ের ('উড়কি ধানের মুড়কি') নাম দেওয়া হয়েছে, এমন দেখা যাচ্ছে।

ছোটোদের আর বড়োদের ছড়ার ছন্দোবন্ধের সাদৃশ্য আছে, প্রকরণও প্রায়ই খুব একটা পৃথক নয় কিন্তু বড়োদের ছড়া রাজনৈতিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করেছে বেশি, ছোটোদের ছড়ায় তার অবতারণা কম। বরং সেখানে পশুপাখির স্বভাববৈচিত্র্য এবং তাদের সম্বন্ধে অন্যদের প্রতিক্রিয়া, শারীরিক শীতগ্রীষ্মের অনুভবের অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপন, খেলা-ধুলার জগতের নানা সূত্র অনেক বেশি আছে। বড়োদের ছড়ায় আছে বড়োদের জগতের উপযোগী কিছু কিছু শব্দবন্ধ ও মন্তব্য, কখনও কখনও বড়োদের কাব্যবস্তুর, যেমন অমিত্রাক্ষরের প্যারোডি। কিন্তু বড়োদের ছড়াও এক কৌতুকময় সারল্যেরই শস্য, তাতে ব্যঙ্গ বা আক্রমণ নেই বললেই চলে। সব কিছুতেই একটা মজা পাওয়ার ব্যাপার লক্ষ করা যায়, এমনকী উদ্‌বেগ বা ভয়েতেও মজা। আগে যেগুলিকে 'কবিতা' বলে চিহ্নিত করেছি সেগুলিতে অবশ্য এই মজা-পাওয়ার উচ্ছলতাকে তিনি প্রত্যাহার করে নেন, এবং কখনও কখনও বেশ বেদনা বা উদ্‌বেগের সুর ফুটে ওঠে। যেমন 'নিত্য নূতন দ্বন্দ্ব' ('যাদু এ তো বড়ো রঙ্গ')-তে—

বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! আর কত বাকী!
আর কতবার হবে একথা প্রমাণ
"বিপ্লব ভক্ষণ করে আপন সন্তান"?
দশ বছরেও ক্ষুধা দূর হল না কি?
স্বাধীনতা ঘোষণায় যে ছিল অগ্রণী
সেই বীরোত্তম আজ ভ্রাতৃকরে হত,
ভ্রাতা সেও বীরবর সেও অপগত
বিনা মেঘে নেমে এল এ কোন্ অশনি! (২৭৪)

তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোটো-বড়ো উভয় শ্রেণীর পাঠকের জন্য লেখা ছড়ার মেজাজটি এক— ঠাট্টা-তামাশা। কোনো কোনো জায়গায় এই ঠাট্টা-তামাশা নিজের প্রচ্ছন্ন বেদনাকে আরও তীব্র ব্যঞ্জনায় পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়, এবং ঠাট্টা-তামাশাকে অতিক্রম করে সেই দুঃখের সুরটি অবশ্যই বাজতে থাকে, কিন্তু কখনোই তা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সিপাহি বিদ্রোহের উপর লেখা কবিতাগুলির মতো তীব্র ব্যঙ্গে বা রুচিহীন আক্রমণে পৌঁছোয় না, বা শঙ্খ ঘোষের 'লাইনেই ছিলাম বাবা'-র ব্যঙ্গাত্মক তীক্ষ্ণতাকেও স্বীকার করতে চায় না। অন্নদাশঙ্করের একটি বিশেষ সহিষ্ণুতা আছে, তিনি কখনোই একটি পক্ষে অনড় ও শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন না, ফলে রাজনৈতিক মতাদর্শের দক্ষিণ-বাম সকল সম্প্রদায়ই তাঁর কটাক্ষের পাত্র হয়ে ওঠে। সব দলের কাছ থেকে তাঁর এই রাজনৈতিক সমদূরত্ব কারও কারও কাছে 'নাইভ্‌টি' বা সরলচিত্ততা মনে হতে পারে, কিন্তু অনেকেই স্বীকার করবেন যে, ছড়াকারের পক্ষে, বিশেষত 'ফুর্তিবাজ' ছড়াকারের পক্ষে, এ এক বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থান; এখান থেকে সকলকেই তিনি ঠাট্টা করতে পারেন, সকলের ব্যাপারেই সমালোচনা করার সুযোগ তাঁর আছে। বিশেষত যে সমালোচনা অসূয়াপ্রসূত নয়, বরং মজা করে কোনো একটা অসংগতি দেখিয়ে দেওয়ার নির্দোষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। অন্নদাশঙ্কর বোধ হয় ধরেই নিয়েছেন যে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর মতো যথেষ্ট শক্তির সঞ্চয় কবির হাতে বা ছড়াকারের হাতে নেই। তিনি যা পারেন তা হল মৃদু রঙ্গের মধ্য দিয়ে সকলের উচ্চারণ ও আচরণের অসংগতি দেখিয়ে দেওয়া। এতে সকলে শোধরাবার জন্য তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে যাবে— এমন উচ্চাশাও তিনি পোষণ করেন না[৬]। ফলে তাঁর সমালোচনায় দীর্ঘ ধারাবাহিকতা দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া খুব একটা লক্ষণীয় নয়— ব্যতিক্রমের মধ্যে বাংলাদেশ-প্রসঙ্গ একটি। সেখানে প্রায় একটি মৃদু দীর্ঘশ্বাসও হয়তো শুনি আমরা, কিন্তু তাঁর 'ফুর্তি'-র ভাণ্ডার অনাহত থাকে।

॥ তিন ॥

ছোটোদের ছড়ায় বিষয়বস্তুকে ছোটোদের জগতের অভিজ্ঞতা ও কৌতূহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন অন্নদাশঙ্কর, শুধু যুদ্ধ ও দেশবিভাগ— এই দুটি ঐতিহাসিক বিপর্যয় ছাড়া। কিন্তু তাও ছোটোদের মতো করে, তাদের চেনা-জগতের জন্তুজানোয়ারের রূপক দিয়ে পরিবেশন করেছেন, যাতে তা ছোটোদের কাছেও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। প্রথমেই মনে

পড়বে ছোটো ছেলেমেয়েদের খুনশুটি ও অভিমানের ভাষা অবিকল গ্রহণ করে রচিত সেই কিংবদন্তির মতো ছড়াটিকে— 'খুকু ও খোকা'—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা?
ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ত ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ি।
তার বেলা?

বস্তুত 'তার বেলা'— এই অনুযোগটির ধুয়োর মতো পুনরাবৃত্তি ছোটোদের অভিমানের ভাষাটিকে অবিকল তুলে আনে— খোকা নিজের বোনের হয়ে যে সওয়াল করছে তা ভাই বোনের চমৎকার একটি মানবিক সম্পর্কেরও ইঙ্গিত তৈরি করে। দেশভাগের বিষয়টি আরও ছড়ায় এসেছে— একটিতে 'দুই বেড়াল ও এক বাঁদর'-এর অ্যালিগরি, অন্যটিতে সেই দুই বেড়াল হুলো-ভুলোকেই এনেছেন অন্নদাশঙ্কর— এতে তাঁর অন্য সব প্রাণী-নির্ভর ছড়া বা 'অ্যানিম্যাল রাইমস'-এর সঙ্গে এ দুটির একটি সাযুজ্য রচিত হয়েছে। আর মহাযুদ্ধের বিষয়টি এসেছে তির্যকভাবে— গড়বেতা স্টেশনে বোমা পড়ার অলীক গুজব শুনে পুরো একটি অঞ্চলের মানুষজনের অঞ্চল ছেড়ে পালানোর চেষ্টা ও তার হাস্যকর পরিণতি।

প্রাণীবিষয়ক ছড়ায় গৃহপালিত ও বন্য অসংখ্য প্রাণী এসেছে— তাদের নিজস্ব আচরণের কৌতুকের দিক যেমন, তেমনই তাদের পালক পোষক ও তাদের প্রতি অন্যদের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া এই ছড়াগুলির রসের ভিত্তি তৈরি করেছে। এমনকী তাদের উপর কল্পিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করে তাদের বক্তব্যও প্রকাশ করেছেন অন্নদাশঙ্কর, যেমন 'উই পোকাদের গান'-এ—

তোমরা শুধু খাদ্য জোগাও
আমরা শুধু খাই
আজকে যেটা রাখলে ঘরে
কালকে সেটা নাই।

হুঁ-হুঁ-হুঁ দাদা
বুদ্ধি ঝেড়ে লিখলে পুঁথি
ভাবলে সে অমর
আমরা তারে কাটব বলে
বেঁধেছি কোমর।
হুঁ হুঁ হুঁ দাদা। (২০)

উই পোকাদের এই উদ্ধত ও অহংকৃত কোরাস সংগীতের তুলনা অন্যত্র নেই, অর্থাৎ প্রাণীরা নিজেরাই নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করছে এমন আর দৃষ্টান্ত দেখি না, কিন্তু প্রাণীদের গল্পের কল্পিত চরিত্র বানিয়ে ছড়া আছে, যেমন 'টুনটুনি ও দুষ্টু বেড়াল' (৩০-২), 'ব্যাঙের ছড়া' (৪২), 'ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমী' (এরা কাল্পনিক প্রাণী, বলা বাহুল্য, ৪৮-৯) 'যেখানে বাঘের ভয়' (৫৩-৫), 'পক্ষিরাজ' (৫৫-৭) ইত্যাদি। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় বেশিরভাগ প্রাণীই বাস্তব ও ইতিহাসবদ্ধ, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কখনও-না-কখনও পোষা বা দেখা প্রাণীর দল, যাদের মধ্যে বেড়ালের ও কুকুরের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেশি। কিন্তু প্রথমে যে সব প্রাণী তাঁর ছড়ার বিষয় হিসেবে এসেছে তাদের একটা তালিকা করা যাক— উইপোকা, ময়না, হনুমান (একাধিকবার), মশা, কুকুর (একাধিকবার), টুনটুনি, বাঁদর, কাঁকড়া, পিঁপড়ে (একাধিকবার), দার্জিলিঙের ইঁদুর, ঘোড়া (খেলনা ও জ্যান্ত দুইই, একাধিকবার), বাদুড়, বাঘ, হাতি, গাধা, শালিক, চন্দনা, পায়রা, কালকেউটে সাপ, বেজি, কাঠবিড়ালি, কাক, ব্যাঙ, হরিণ, ভালুক, শঙ্খচিল, উট, 'ক্লে-পিজন', ঝাড়পোকা, লক্ষ্মীপ্যাঁচা, আরশোলা, উকুন, চিতাবাঘ, কাকাতুয়া, নতুন কাকি টেকটেকাউ, সিংহ, ছাগল। শুধু ছোটোদের ছড়াতেই এরা স্বমহিমায় উপস্থিত। বড়োদের ছড়াতেও তারা কেউ কেউ দেখা দেয়, কিন্তু সেই পরিমাণে নয়। আর সেখানকার প্রাণীরা অধিকাংশত রূপক হয়ে আসে, যেমন 'গৃহযুদ্ধ'-র (১৯৮-৯)—

গোরুর গাড়ির দুই গোরু ছিল
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
কে যে পরাধীনে কী বুদ্ধি দিল
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
আধমরা দুই নির্বোধ প্রাণী
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
গাড়ি নিয়ে করে ঘোর টানাটানি
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

বা 'শ্চিবাই'-এ (২২২)—

ছুঁচো বললেন ছুঁচীকে,
তোমার মতন ছুঁচি কে ?
তোমার যেমন ছুঁচিবাই
এমনটি আর কোথা পাই ?

ওগো গন্ধবেনের ঝি,
তোমার শ্রীচরণের ছুঁচো হয়ে
আমিও ছুঁচি।

তবে 'স্পেস ফেরত' কুকুরের কথাও বড়োদের ছড়ায় আছে, যারা রূপক নয়, সাম্প্রতিক ইতিহাসের অংশ।

আগেই বলা হয়েছে, পশুপাখি সম্বন্ধে লেখক, সংশ্লিষ্ট ও অসংশ্লিষ্ট মানুষজনের অনুকূল ও প্রতিকূল নানা প্রতিক্রিয়া অন্নদাশঙ্করের প্রাণীবিষয়ক ছড়াগুলির প্রধান ভিত্তি। এবং তার রসসৃষ্টির প্রকরণ হল গ্রহণীয় ও স্বাদু অতিরঞ্জন, যেমন কৃষ্ণনগরের (কেশনগর) মশার এই ভয়ংকর উৎপাতের বর্ণনা—

জাপানিরা ভাগল কেন
খবরটা কি রাখেন ?
কেশনগরের মশার মামা
ইম্ফলেতে থাকেন।
পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটত
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হঠত।
মশা
তুচ্ছ মশা!
মশার জ্বালায় সেদিন হত
ডানকার্কের দশা।
মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়! (২৮)

কিন্তু অতিরঞ্জন ছাড়াও, পশুপাখির বিশেষত পোষা কুকুর-বেড়াল ইত্যাদির, সাধারণ ব্যবহারের মধ্যেই এমন একটা মজা আছে, এবং তার মধ্যে মজা

আবিষ্কার করার এমন একটা চোখ অন্নদাশঙ্করের আছে যে, তাকে ছন্দে ফেলে বর্ণনার মধ্যে, সঙ্গে লেখকের সামান্য অতিশয়িত প্রতিক্রিয়া জুড়ে দিয়ে পরিবেশনের মধ্যেই একটা কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়ে যায়—

বেড়াল আসেন রাত বারোটায়
বলেন, খেতে দাও।
মিয়াও মিয়াও মাও।
আর জন্মের মহাজন
বলেন, সুদ লাও
মিয়াও মিয়াও মাও।
কী যে করি! নিদ্রা ছেড়ে
শয্যা থেকে উঠি
রান্নাঘরে ছুটি।
কী যে আছে ওর জন্যে
দুধ ভাত না রুটি।
রান্নাঘরে ছুটি!
বেড়াল চলেন ওসব ফেলে।
হাঁউ মাঁউ খাঁউ।
মাছ কেন না পাঁউ। ('হাঁউ মাঁউ খাঁউ' ৭৯)

এই প্রাণীবিষয়ক ছড়াগুলি থেকেই স্পষ্ট হয়, অন্নদাশঙ্কর শিশুর জগতে শিশুর আকর্ষণের বিষয়গুলিকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। কিন্তু শুধু বাস্তব বা কল্পিত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ নয়, ভূত, পুতুল, পায়েস, বিস্কুট, মুড়ি, ট্রেন প্লেন কপ্টার, রিকশা, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে তিনি ছড়ার উপলক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

তবে 'মজা' কথাটা বারবার ব্যবহার করা হয়তো আমাদের সংগত হয়নি। পশুপাখির ছড়ায় অন্নদাশঙ্করের সস্নেহ কৌতুকরসও যেমন পরিব্যাপ্ত তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত মমতা ও বিচ্ছেদের স্মৃতির মর্মান্তিক দুঃখকেও ধরে রেখেছেন একটি দুটি ছড়ায়। 'বেড়ালের স্বপ্ন' (৮৪-৫) ছড়াটির মধ্যে একটি স্বপ্নের কথা বলেছেন অন্নদাশঙ্কর। যেন ফিরে গেছেন শান্তিনিকেতনে, মাটিতে শুয়ে আছেন, এমন সময় তার বহুদিন আগে হারানো পুষি, সোনা আর টুঙ্কু তিনটি বিড়াল ফিরে এসে তাঁর মাথার কাছে বসেছে, তাঁকে আদর করছে—

চোখগুলি কী করুণ, যেন অনাথ শিশুর মতো
আহা, অনাথ শিশুর মতো।
এমন সময় কেমন করে স্বপন গেল কেটে
আমার স্বপ্ন গেল কেটে।
জেগে দেখি বুক যে আমার কান্নাতে যায় ফেটে
আহা, কান্নাতে যায় ফেটে।
হায়রে ওরা এসেছিল আমার তিনটে বেড়াল
আমার ভালোবাসার বেড়াল।
কেমন করে গেল সরে কতকালের আড়াল
আহা, কতকালের আড়াল।

প্রাণীবিষয়ক ছড়াগুলির পরে একটি বড়ো ভাগ হল সমকালীন বিচিত্র ঘটনা নিয়ে তাৎক্ষণিক ছড়া, যাকে কিছুটা 'সাংবাদিকতাধর্মী' বলা যায়। সাংবাদিকতাধর্মী কথাটা আমরা কোনো নেতিবাচক অর্থে প্রয়োগ করতে চাই না, কারণ মুহূর্তের চমকপ্রদ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের মন্তব্যসহ ছড়া রচনা ছড়াকারদের অতি প্রাচীন অধিকার। যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ঘটনা এরই মধ্যে পড়ে, এবং বড়োদের ছড়ায় সমসাময়িক ঘটনাই খুব বেশি করে অন্নদাশঙ্করকে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত এই ছড়াগুলি যেমন ভারতের সমসাময়িক ইতিহাসের কিছু রেকর্ড রক্ষা করছে, তেমনই অন্নদাশঙ্কর মানুষটিকেও আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে রাজনৈতিক মানুষটিকে। এই ছবি তাঁর গীতিকবিতায় অবশ্যই নেই, আছে তাঁর 'সত্যাসত্য' ও 'রত্ন ও শ্রীমতী'-তে, এবং সবচেয়ে বেশি করে আছে তাঁর প্রবন্ধে। পৃথিবী ও দেশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রতিটি ঘটনায় তাঁর মন সাড়া দিয়ে ওঠে এবং নিজের মন্তব্যে ঘটনাটিকে আলোকিত করে তোলেন এক অভাবিত সরসতায় বা ক্বচিৎক্ষেত্রে বেদনায়। এই মন্তব্যের মধ্যেই ধরা দেন অন্নদাশঙ্কর নামে রাজনৈতিক মানুষটি। এই সব ঘটনা যে আক্ষরিকভাবে ঘটনাই হতে হবে তা নয়, বরং সমকালীন কোনো মনোভাব বা প্রবণতা বা দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর সকৌতুক মন্তব্যের খোঁচা থেকে নিস্তার পায় না, যেমন 'গিন্নি বলেন'-এ (২০২)

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্ট
সকলের মূলে কমিউনিস্ট।
মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি
গোড়ায় কে তার? কমিউনিস্ট।

পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি
তলে তলে কেটা ? কমিউনিস্ট।...
গেল সংস্কৃতি, গেল যে কৃষ্টি
ছেলেরা বনলো কমিউনিস্ট।
মেয়েরাও ওতে পায় কী মিষ্টি
সেধে গুলি খায় কমিউনিস্ট।
যেদিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি
সেদিকেই দেখি কমিউনিস্ট।
তাই বসে বসে করছি লিস্টি
এ পাড়ার কে কে কমিউনিস্ট।

আবার এক শ্রেণীর 'কমিউনিস্টদেরও' তিনি ঠাট্টা করতে ছাড়েন না—

ঘোষ বোস মিত্তির
চট্টো ও বন্দ্যো
শ্রেণীতে শ্রেণীতে এঁরা
বাঁধালেন দ্বন্দ্ব।
শ্রেণীশত্রুরা কারা ?
কী মহান সত্য
মুখো আর গুপ্তো,
দে আর দত্ত। (২৫৫)

সমকালীন যেসব ঘটনা মানুষকে আলোড়িত করেছে তার প্রায় সবই অন্নদাশঙ্করের কৌতুক-কটাক্ষের লক্ষ্য হয়েছে। আগেই বলেছি, এখানে তীব্র আক্রমণ বা ব্যঙ্গ নেই, আছে এক আত্মবিড়ম্বিত কৌতুক, কখনও বা উদ্দীপনাময় ঘটনায় এক সমুত্থিত আবেগ। দ্বিতীয় ধরনের ছড়ার দৃষ্টান্ত একাধিক পাওয়া যাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ উপলক্ষ্যে লেখা ছড়াগুলিতে, যা অন্নদাশঙ্করকে বিশেষভাবে আপ্লুত করেছিল— যদিও প্রকরণের দিক থেকে খুব চমকপ্রদ ছড়া এগুলিতে পাই না। বরং মনে পড়ে মিলের টানে মন-কাড়া কিছু যুগলবন্দি পঙ্‌ক্তি, যেমন—

মহাশূন্যে মনোলোভা
ভালেন্তিনা তেরেসকোভা। (২০৭)

কিংবা একটু লঘুসুরে আক্ষেপ—

দ্বিধা হও, দ্বিধা হও, ওগো মা ধরণী,
চিৎপুরের নাম হল রবীন্দ্র সরণি। (২০৫)

কিংবা কিছুটা রাবীন্দ্রিক উদ্দীপন-মন্ত্র—

মরতে মরতে ভয় যেন যায় ছুটে।
তখন জোয়ার রুধবে কে রে।
দেয়াল যাবে টুটে।
আফ্রিকা! আফ্রিকা!
তখন লোহার দেয়াল যাবে টুটে। (২৩৯)

উন্মুখ ইন্দ্রিয় যেন সর্বদাই প্রস্তুত থাকত এই মানুষটির, ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়ার উপলক্ষ্য অগণন। ছোটো-বড়ো সকলের ছড়া মিলিয়ে তার তালিকা করার চেষ্টাও প্রায় অসম্ভব। তবু যুদ্ধ, দেশভাগ ছাড়া যে সব ঘটনা তাঁকে দিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কিছু পঙ্‌ক্তি-উৎসার ঘটিয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে—অলিম্পিক ১৯৬৪, ভিন্টেজ কার র‍্যালি ১৯৬৮, মহাশূন্যে রকেট প্রেরণ ১৯৭৩, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশ ভ্রমণ, ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের জয়, হ্যালির ধূমকেতুর উদয়, বিশ্ব টেনিস, আর্জেন্টিনার ফুটবলে বিশ্বকাপ জয় ও মারাদোনার গৌরব, চন্দ্র-অভিযানের স্বপ্ন, রাকেশ শর্মার রকেট যাত্রা, রনজি ট্রৌফি, বোরিস বেকারের হার, বার্সেলোনা অলিম্পিক, অলিম্পিকে বেন জনসনের বিপত্তি, বিশ্বকাপে মারাদোনার শাস্তি, নৃত্যরত শংকরন্ নাম্বুদিরির মৃত্যু, সিমলা বৈঠক, ১৯৪৫-এ ইংরেজ সরকারের পাকিস্তান প্রস্তাব স্বীকার, এটলির প্রধানমন্ত্রিত্ব, উদ্‌বাস্তুর প্লাবন, স্বাধীনতার পরে কালোবাজারি ও ভেজাল, যে বিষয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করতে লোভ হয়—

মানুষকে যদি বলি দিতে হয়, দাদা,
আমাদের মতো অহিংস মতে মারো,
চালের সঙ্গে মেশাও কাঁকর শাদা
ফাঁসির হুকুম হবে না একজনারো।

তেলের সঙ্গে মেশাও শেয়ালকাঁটা
হোক বেরিবেরি কোলাব্যাঙও সম ফোলা;
তেঁতুলবীচির সঙ্গে মেশাও আটা,
পেট ছেড়ে যাক, যমের দুয়ার খোলা। (২০১)

তার পরে পূর্বপাকিস্তানে ১৯৫২-তে নির্বাচনের সম্ভাবনা, লিয়াকৎ আলির মস্কো যাত্রা, আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন, দেশে বহুদলীয় রাজনীতির সমস্যা, মিশরে ফারুক খেদিবকে তাড়িয়ে জেনারাল নেগুইব-এর ক্ষমতা দখল,

আসাম-পশ্চিমবাংলায় বন্যা, ভারতীয়দের গোয়া অভিযান, সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেস ত্যাগ, গামাল আবদুল নাসেরের সুয়েজ খাল অবরোধ, শান্তিনিকেতনে সেন-পদবিধারী আমলার বিরুদ্ধতা, আমেদাবাদে দাঙ্গা, ১৯৫৯-র খাদ্য আন্দোলন ('ভাত দেবার ভাতার না, কিল দেবার গোঁসাই'), লুনিকের চাঁদের বক্ষভেদ, আসামে বঙ্গাল খেদা, কুকুরের মহাশূন্য ভ্রমণ, গাগারিনের শূন্যে অভিযান, চিৎপুরের রবীন্দ্র সরণি নামকরণ, বাজারে চালের দাম বৃদ্ধি— যা উৎপাদন করেছে চমৎকার একটি ছড়া—

চাল কম খান
লাল গম খান।
চাল কম খান
শালগম খান।

চাল কম খান
আলুদম খান।
চাল কম খান
চমচম খান।

অন্নদাশঙ্কর হয়তো নেহাত দয়াবশত লেখেননি যে চালের বদলে কাঁচকলা খাওয়ার অনুরোধও জানানো হয়েছিল বঙ্গবাসীকে। কিংবা এমনও হতে পারে যে চাল আর কাঁচকলাকে জড়িয়ে ছড়ায় ভালো মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল।

সেই সঙ্গে এসেছে সরদার প্যাটেলের মৃত্যু ('ভাই / স্বর্গে নরকে যেখানেই হোক ঠাঁই, / দেখবে সেথায় মুসলমানও আছে / কিন্তু ওদের তাড়াবার পথ নাই।'— ২০৫), ভালেন্তিনা তেরেসকোভার শূন্য-প্রদক্ষিণ— রকেটে পৃথিবীর প্রথম নারী-অভিযাত্রী অন্নদাশঙ্করকে উদ্বুদ্ধ করেছেন ; চীনযুদ্ধ ও কামরাজ নাদার, বাজারে মাছের দুর্লভতা ও ইলিশের প্রচুর দাম, দেশি কুলাকদের উৎপাত, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, আংরেজি হঠাও হুংকার, কংগ্রেসে তরুণ তুর্কিদের সাফল্য, ('মনে হয় তো বঙ্গ ভঙ্গ এমন বেশি দূরে কী।'), মানুষের চন্দ্রাবতরণ, কংগ্রেসের ভাঙন, তুষারকান্তি ঘোষের দুটি বিবাহ-বার্ষিকী, ছন্দোগুরু প্রবোধচন্দ্র সেনের জন্মদিন, মূর্তি-বদলের রাজনীতি, নির্বাচন ও ভোট-বর্জন ('ছোড়দা এসে ঘুষি বাগায়, 'ভোট দিস নে ভজা।' —২৫৭), 'ইন্দিরার সম্মান', লোডশেডিং, জরুরি অবস্থা ('ভাগ্যে হঠাৎ পড়ল খসে / মহৎ ত্রাসের কেল্লা / নয় পাষাণের নয়কো লোহার / ফাঁপা তাসের কেল্লা-রে, ফাঁকা তাসের কেল্লা'— ২৬৫), আয়ারাম-গয়ারাম উৎসব, জনতা দলের ছত্রভঙ্গ ও রাজনারায়ণের কূটনীতি ('যদুকুল ধ্বংস হল নিজেরই মুষলে'), ওয়ানচু কমিশন, নানা খরা ও নানা বন্যা, আন্তুলে-র দুর্নীতি, ইন্দিরা গান্ধির স্বৈরশাসন ("কাশ্মীরিনী বানায় ভেড়া / দিল্লি থেকে বঙ্গ"), একুশে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, বাংলাদেশের ভ্রাতৃহত্যা, নজরুলকে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, জিয়াউর রহমানের ক্ষমতালিপ্সা, লেবাননের যুদ্ধ, নিউট্রন বোমা,...

র‍্যাগিং, পাতাল রেল, মুজিব হত্যা, ইদি আমিন, বাঘের বংশলোপ, চেকোশ্লোভাকিয়ার বিচ্ছেদ, বেনজির ভুট্টোর পরাজয়, বন্ধ-এর হুজুগ, সবুজের লয়, মূর্তি ভাঙার রাজনীতি, ড্রাগের বিপত্তি, ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের বিপর্যয়, কলকাতার তিনশো বছর, বাজারে আদার দুর্মূল্যতা, গণটোকাটুকি, ('টোকাটুকি করে যে / গাড়িঘোড়া চড়ে সে। / পড়ে শুনে করে পাস / দুঃখী সে বারো মাস'।—১৩৭) খেলার মাঠে হাঙ্গামা, চোখে 'জয়-বাংলা' ব্যাধির প্রকোপ, ডায়ানার সঙ্গে রাজপুত্র চার্লসের বিয়ে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাজীব গান্ধির পরাজয়ের সম্ভাবনা, মিছিল ভাঙতে জলকামান ব্যবহার, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের ভেজাল, সরষের তেলের আকাল— কোন্ বিষয়ে মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া নেই তাঁর ছড়ায় ? একই সঙ্গে খাদ্যরসিক বাজার-বিলাসী সংসারী এক বাঙালি, সেই সঙ্গে আঞ্চলিক, দৈশিক ও বিশ্বগত যত কিছু ঘটনা তার প্রায় সবই অন্নদাশঙ্করের চৈতন্যে অভিঘাত সৃষ্টি করে কখনও কৌতুক, কখনও কটাক্ষ কখনও বা উদ্দীপনা বা উচ্ছ্বাস আদায় করে নিয়েছে।

এ ছড়াগুলিতে কখনও কখনও মৃদু খোঁচাও আছে, যেমন সরদার প্যাটেল বা রাজনারায়ণ সম্বন্ধে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নামটিকে স্পষ্ট করেননি লেখক। ফলে ভয় হয়, যদি 'ছড়া-সমগ্র'-তে পরে ঐতিহাসিক টীকাভাষ্য যুক্ত না হয় তবে এগুলির প্রতিবেশ-পটভূমি পাঠকের কাছে ক্রমশ অনচ্ছ হয়ে যাবে এবং এগুলির পুরো রস আর নিষ্কাশিত হবে না।[৪] প্রচ্ছন্ন allusion-এর এই এক ঝুঁকি থেকেই যায়।

এই প্রবন্ধ লেখকের কাছে অবশ্য বিশেষ প্রিয় অন্নদাশঙ্করের সেই সব ছড়া, যেখানে প্রায় নিজেই তিনি বিষয় হয়ে ওঠেন, আসল বিষয় নিছক উপলক্ষ্যমাত্র হয়ে যায়, এবং তিনি তাঁর নিজের অস্বস্তি, দুর্গতি, বিড়ম্বনা, নাকাল হওয়া ইত্যাদি নিয়ে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন। সংকলনের একেবারে প্রথম ছড়াটি ('লন্ডন ফগ'—১৭-৮) থেকে আরম্ভ করে বহু ছড়াতে এই ভাবে লেখক ব্যক্তিটি, যে-ব্যক্তি শীতগ্রীষ্মবর্ষায় কাতর, বাজারের চড়া দামে পর্যুদস্ত। আগের বিষয়মুখ্য ছড়াগুলিতেও অবশ্য লেখকের উপস্থিতি যথেষ্ট, তাঁর কটাক্ষ ও মন্তব্যের কথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু এসব ছড়ায় অন্নদাশঙ্কর নিজে তার চেয়ে একটু বেশি করে উপস্থিত। এবং সেই উপস্থিতি ও আত্মপ্রক্ষেপ তাঁকে এবং ছড়াগুলিকে আমাদের কাছে বেশি আকর্ষক করে তোলে। এইরকম একটি স্মরণীয় ছড়া 'কলম কিনি কেন ?'—

কলম কিনি চোরকে দিতে
চোর যে আমার প্রাণের মিতে।
বুক পকেটে পাঞ্জাবিতে
কলম রাখি চোরকে দিতে। (৬৩)

বড়োদের ছড়ায় তারই একটি উপভোগ্য নজির 'দূরদৃষ্ট' (২২৭)—

কী করব ? পড়ে গেছি সেনেদের কোপে।
সেনানীরা রয়েছেন ঝাপে আর ঝোপে
খাপে আর খোপে।
কোথায় পালাই বল। ও'রাই তো দেশ।
তবে কি জমাব পাড়ি আবার উরোপে ?
বীমা তো করেছি বহু, কিন্তু করিনি এ—
বয়স যখন ছিল সেনবাড়ি বিয়ে।
মরি পশ্তিয়ে।
কী করব। ছিল না তো দূরদৃষ্টিলেশ।
খোয়াইতে পড়ে আছি দূরদৃষ্ট নিয়ে।

এই বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতা যখন লেখকের নিজের উপর থেকে অন্যের উপর নিক্ষিপ্ত হয় তখনও তা সমানই উপভোগ্য হয়ে থাকে—

শুদ্ধোদন দাশগুপ্ত
শুদ্ধোদন দাশগুপ্,
ঘরের কোণে বসে আছ
কেন অমন চাপচুপ।
হায়রে আমার পোড়া কপাল
হায়রে আমার পোড়া কপ্।
হোটেল থেকে দিয়ে গেল
গণ্ডা কয়েক মাটন চপ।
বেড়াল এসে খেয়ে গেল
খপাখপ গপাগপ। (৬১)

ফুটবল লেগে তাঁর বেয়ানের বিড়ম্বনা ('ঘুম্ঘুভাঙার পাঁচালি'—১৮৭-৮) কি কম উপভোগ্য ?

॥ চার ॥

অন্নদাশঙ্করের ছড়ার প্রকরণগত কাঠামো আলোচনা করতে গেলে দেখি, মূলত ছড়ার যে পরম্পরাগত ছন্দ, সেই দলবৃত্তকেই তিনি অবলম্বন করেছেন সবচেয়ে বেশি করে, যদিও সরল কলাবৃত্তে কিছু ছড়াও আছে। এবং বড়োদের ছড়ায় অমিত্রাক্ষরের প্যারোডিতে এবং অন্যত্র আছে কয়েকটি মিশ্রবৃত্তের কবিতা। এমনিতে ছোটোদের জন্য লিখেছেন বলে, এবং বড়োদের মধ্যেও সাধারণ

পাঠকরাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য বলে, খুব অভিনব বা চোখে ধাক্কা-দেওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেননি। তবু সংগতভাবেই মিলের উপর ভিত্তি করে মিল-নিয়ন্ত্রিত বেশ কিছু ছড়া তিনি লিখেছেন, এবং মিলের প্রয়োজনে, কখনও ছন্দের প্রয়োজনে (metra causa) শব্দকে তিনি ভেঙেছেন, বদলেছেন। তাঁর এই ধরনের 'লিংগুইস্টিক' বা ভাষানির্ভর ছড়াগুলি তাঁর ছড়ার ভাণ্ডারে আর-একটি স্তর তৈরি করে। অর্থাৎ নিছক বিবৃতি ও মন্তব্যের বাইরে গিয়ে তার ভাষার কারিগরির দিকে আমাদের দৃষ্টিকে টানতে থাকে। অল্প দু-তিনটি লিমেরিক আছে ছোটোদের অংশে, তাতে মিলের বিষয়টি মুখ্য, আর বড়োদের অংশে আছে ক্লেরিহিউ জাতীয় সুগঠনের ছোটো কবিতা, এবং মিলের ভিত্তিতে নামকরণের সূত্র গ্রহণ করা হয়েছে কোথাও ('খাটবে না খুটবে না / পড়বে না শুনবে না / শিখবে না লিখবে না কিছু / — এ ছেলেটা বিচ্ছু।' ২৩)। মিলের ভিত্তিতে উদ্ভট কল্পনায় চলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত 'ভেলকি' ৪০)—

চণ্ডীচরণ দাস ছিল
পড়তে পড়তে হাসছিল।
হাসতে হাসতে হাঁস হল,
হায় কী সর্বনাশ হল।

উদ্ভটের কারবার অবশ্য এমনিতে অন্নদাশংকরে খুব বেশি নেই, তাঁর কাছে বাস্তবই যথেষ্ট মজাদার। বাস্তবের মানুষ পশু পাখি ইত্যাদির কিছু আচরণ তাঁর মধ্যে আনন্দের বা উপভোগের ঢেউ তোলে, কখনও বা নিজের দেখার নতুন অবস্থান এবং তজ্জাত মন্তব্য ও ব্যাখ্যান তাকে উপভোগ্য করে তোলে। তাই কদাচিৎ অন্নদাশংকর উদ্ভট কল্পনার দ্বারস্থ হন। তবু তার মধ্যে আরও দু একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য—

হা হা,
সত্যভূষণ রাহা,
যে কথাটা বললে তুমি
সত্য বটে তাহা।
চামচিকেরা ফুলকপি খায়
কেউ জানে না, আহা। (৪১)

এই পর্যায়ে 'ফলার' (৭৭) ছড়াটিও দিব্যি ভালো, যাতে 'সোনার পাথর-বাটি'তে 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' খাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। অন্নদাশংকরের এই 'ভাষিক' ছড়াগুলিতে শিশুর জগতের বিচিত্র ভাষাপ্রক্রিয়া আমদানি করেছেন—

যেমন ঝগড়ায় শিশুদের শব্দক্রীড়া ও শব্দবিকৃতি ('এক যে ছিল পার্বতী। ফার্বতী / মার্বতী / ধার্বতী' ৪৪), তাদের খেলার ছন্দ ('ঘোড়ার ওপর ঘোড়ায় চড়ি / টগবগ টগবগ' ৪৯)। বাংলা বাগ্‌ধারা নিয়ে মজা ('পটল নামে লোক ভালো / পটলচেরা চোখ ভালো / পটল খেতে ভালো যে / কিন্তু পটল তুলবে কে ?' ৫২), শব্দকর্তন ('শুদ্ধোদন দাশগুপ্ত' ৬১, 'সুরজিৎ দাশগুপ্ত' ৬৮), তাদের কাটাকুটি বা ছবি-আঁকার খেলা ('লেখো দেখি বাঘ। / বাঘ / ব কেটে ছ করো / ঘ কেটে গ করো / হয়ে যাক ছাগ। / বাঘ, তুই ভাগ' ৮৬ ; 'চকখড়ি চকখড়ি চাক / এইবার আঁকছি কাক। / কাক নয় শাদা, তাই হাঁস / হাঁস হল হাঁস হল— বাস। / প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডাক / চকখড়ি চকখড়ি চাক।' ৪০), একটু বড়দের সন্ধি ও শব্দবিশ্লেষের খেলা ('গোঁয়ার আমি, গোঁয়ার তুমি / করছি, দাদা, গোঁয়ার্তুমি' ১০১) বা এইরকম বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

এক হাতে বাজে না তালি
গালার সঙ্গে আছে গালি।
মারার সঙ্গে আছে মারি
কাড়ার সঙ্গে আছে কাড়ি। (১১৭)

কিংবা কবি নিত্যধনের সন্ধি-আগ্রহে 'চা আনতে' 'চা আসছে' এবং 'চা আজ্ঞে' যথাক্রমে 'চান্তে' 'চাসছে' এবা 'চাজ্ঞে' হয়ে যাওয়া এর আর এক উপভোগ্য দৃষ্টান্ত। বড়োদের ছড়ায় এই ভাষিক ক্রীড়ার উদাহরণ তত বেশি নেই। তবু বড়োদের ছড়ায় এহিয়া' (ইয়াহিয়া থেকে) ও নামধাতু 'লিকুইডেটিতে' নামধাতু লক্ষণীয়। আর সেখানে নানা ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও বাস্তব ধ্বনির অনুকরণাত্মক রূপ বড়োদের ছড়াতেও আছে, যেমন 'গৃহযুদ্ধ'-এ (১৯৮-৯)—

গোরুর গাড়ির দুই গোরু ছিল
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।
কে যে পরাধীনে কী বুদ্ধি দিল
ধে রে তাক তাক ধিন ধিন।

কিন্তু এই ধরনের ধ্বনির অনুকরণ ছোটোদের ছড়ায় অনেক বেশি—

"আজকে লেখা রইল এই তক্
থক্…থক্…থক্…থক্"… (১৯)
"ঘ্যাঁগো ঘ্যাঁগো ঘ্যাঁগো
করছে যেটা ব্যাঙ্ ও।" (২৬)
"হা রে রে রে রে রে
হা রে রে রে রে রে।" (৩২)

এইরকম 'খপাখপ টপাটপ', 'কপাকপ্ গপাগপ্', 'হা-হা' 'ঠং ঠং' 'ডিং ডং' 'টিং টিং' 'ঝকড় ঝকড় দুড় দুড়', 'ভোঁ ভোঁ', 'টগবগ টগবগ', 'কুক কুক কুককুরু কুরকুর কুর', 'গুড় গুড় গুড়ুক্ গুড়ুম', 'হালুম। হালুম। হালুম!' —এইরকম অজস্র ধ্বনিরূপ ব্যবহার করেছেন অন্নদাশঙ্কর, যা বিশেষত তাঁর ছোটোদের ছড়াগুলির শারীরিক আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ছড়াতে যখন অন্নদাশঙ্কর গল্প বলেন বা নিছক বিবৃতি দেন, তখন এই ধ্বনিরূপায়ণ, কিংবা অজস্র পুনরাবৃত্তি ছড়ার দেহে সৌন্দর্য ও রঙ্গ তৈরি করে। পুনরাবৃত্তি অন্নদাশঙ্করের বিশেষ প্রিয়— 'না খেলিও দাবা রে, / না খেলিও দাবা' 'কেলো রে কেলো রে, / এলো রে এলো রে', 'কে বাঁচাবে আমার মাথা! / ছাতা আমার। আমার ছাতা।', 'এক যে ছিল টিপু, তার / কেউ ছিল না রিপু, তার / কেউ ছিল না রিপু' ইত্যাদি নিছক পুনরাবৃত্তি,। তা ছাড়া আছে উলটানো পুনরাবৃত্তি (=মিরর-ইমেজ পুনরাবৃত্তি— 'ছাতা আমার, আমার ছাতা' যেমন), সমান্তরালতা (parallelism)— যেমন—

ভবী কখনো ভোলে?
না।
হাতী কখনো ঢোলে?
না। (১০২)

॥ পাঁচ ॥

বাংলা ছড়ার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে, এমনকী বাংলা শিশু-কবিতার বরণীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর সবসময়েই নিজের ঘনিষ্ঠ যোগ দেখিয়ে দিতে চান, যার ফলে ছড়া ও কবিতার প্রতিধ্বনিসূচক পঙ্ক্তি তিনি সাবলীলভাবে ব্যবহার করেন। 'বিলেতবাসী আমরা সবাই' (১৮) যদি দ্বিজেন্দ্রলালকে, 'মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি' (২৮০) সুকুমার রায়কে, 'সুয়ো যে রানি ছিল সোনার মঞ্জিলে' (১৯৭) রবীন্দ্রনাথকে বা 'সম্মুখে / সমর হেরি বীরচূড়ামণি / বীরবাহু চলি যবে গেলা বীরভূমে' (১৮৫) যদি মধুসূদনকে স্মরণ করায়, তাহলে অন্নদাশঙ্কর যেমন তাঁর অব্যবহিত পূর্বসূরিদের রচনাকে নিজের রচনায় অন্তর্বয়ন করে নেন, তেমনই প্রাচীন ছড়াকে স্মরণ করেন অজস্র পঙ্ক্তিতে, আনেন প্রবাদ প্রবচন,— এইভাবে তাঁর রচনায় এক ধরনের ধারাবাহিকতার স্মরণ তৈরি হয়, আজকাল যাকে বুঝি বলে 'ইনটারটেক্সচুয়ালিটি'। এরকম উদাহরণ অল্প নেই—

ইরা ইরা ইরানী
রাঙা মাথায় চিরুনি। (২১)
হাঁউ মাউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ। (২২)
ময়নার মা ময়নামতী
ময়না তোমার কই? (২৪)
বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর
পথে এল বান······(৭৭)
গাড়ি ঘোড়া গেল তল
পথে এখন অথই জল। (৮৩)
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ধন্য রে তার হাতি
একবার হরি হরি বল্ (১৯৫)
আগডুম রে বাগডুম রে সাজল রে ঘোড়াডুম
ঘোড়াডুম। (২১১)
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
পথের ধুলোয় পড়ে আছ রাজার দুলাল। (২৯৫)

শুধু পঙ্‌ক্তি বা বাগ্‌ধারা নয়, লোকগল্প ('টুনটুনি ও দুষ্টু বেড়াল' ৩০-৩২), বিদেশি ছড়া ('হাম্পটি ডাম্পটি স্যাট অন এ ওয়াল / লে আও ঢাল আর / লাও তরোয়াল / হাম্পটি ডাম্পটি / হ্যাড এ গ্রেট ফল / পড়েছে রে মরেছে রে / চল চল চল'— 'জলসা'—৮৯), কিংবা এই চমৎকার অন্তর্বয়ন—

বা—বা!
কী মা!
বাআ বাআ ব্ল্যাক শীপ
হ্যাভ ইয়ু এনি উল?
না মা। না মা।
ওটা তোর ভুল।
কালো নই, ভেড়া নই,
গায়ে নেই চুল।
উল আমি কোথা পাব?
ওটা তোর ভুল।
'মেয়ে কেমন শিখছেন' (১২৫

লোক সাহিত্যের অংশ যে ছড়া, তা অন্নদাশঙ্কর সবসময়ই মনে রাখেন, এবং দেশ ও বিদেশের লোক সাহিত্যের সূত্র ধরিয়ে দেন প্রায়ই— দেশী ছড়ার সূত্রে যেমন, তেমনই বিদেশী লিমেরিক, নার্সারি রাইম, ক্লেরিহিউ ব্যালাডে। ফলে লোকজীবনের খুব কাছাকাছি তিনি চলে আসতে চান— যা আবার আমাদের তাঁর 'ছড়া সমগ্র'-র ভূমিকাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে— 'যারা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে আয়েসে আরামে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের শ্রমের ঋণ আমি শোধ করব কী করে?'

১ প্রথম বন্ধনীর সংখ্যা বাণীশিল্প (কলকাতা)-প্রকাশিত 'ছড়া-সমগ্র'-র (১৯৯৪ সংস্করণ) পৃষ্ঠা বোঝাবে।

২ এ প্রবন্ধের ৫ অংশের শেষের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩ 'আতা গাছে তোতা'-র 'যুদ্ধযাত্রা' ছড়াটির এক-টি পঙ্‌ক্তি এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

দাদু বলছে যুদ্ধে যাব
লড়াই করতে নয়
দেখব ওরা কী করছে
আমি যে সঞ্জয়।
দাদু বলছে যুদ্ধে যাব
অসি হাতে নয়
মসী দিয়ে লিখব আমি
জয় পরাজয়। (৭৯)

৪ 'ছড়া-সমগ্র'-র প্রকাশনা অনেক প্রত্যাশা অপূর্ণ রেখেছে। ছড়ার সংকলনগুলির প্রকাশকাল ও প্রকাশ-বিবরণ থাকা উচিত ছিল, আর অবশ্যই উচিত ছিল প্রথম ছত্রের সূচি রাখা। অন্যান্য তথ্যের কথা বাদই দিচ্ছি।

'বাঁচতে শিখব যত দিন বাঁচি'

ধীমান দাশগুপ্ত

'সুদীর্ঘ জীবন আমি করিনি কামনা।'

না, সুদীর্ঘ জীবন কাম্য ছিল না তাঁর।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের।

তাঁর বাবা ঠাকুরদা কেউই দীর্ঘজীবী হননি। তিনি ভেবেছিলেন, তিনিও হবেন না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই তাঁর চলে যাবার কথা। কেননা তাঁর ধারণা ছিল তিনিও তাঁর মা-র মতো বাঁচবেন পঁয়ত্রিশ বছর মাত্র।

দীর্ঘ জীবন তিনি চাননি।

'আমার অন্বিষ্ট ছিল সম্পূর্ণ জীবন'।

দীর্ঘ জীবন তিনি চাননি। জরাগ্রস্ত কাল তিনি চাননি। চেয়েছেন যৌবনের সঙ্গে জীবনেরও ইতি।

দীর্ঘ জীবনের বদলে জীবনকে তিনি চেয়েছেন স্বল্পায়ু হলেও জীবন্ত বিচিত্র ও বর্ণবহুল রূপে। সম্পূর্ণ রূপে।

এবং যা তিনি চেয়েছিলেন তা তিনি পেয়েছেন। জীবন তাঁর প্রকৃতই জীবন্ত বিচিত্র বহুধা ও বর্ণবহুল হয়েছে।

যা তিনি চাননি তাও তিনি পেয়েছেন। জীবন তাঁর দীর্ঘও হয়েছে।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর বদলে চলে যায় তাঁর এক ছেলে.চিত্রকাম। যে-ঘটনা তাঁর জীবনে ও তাঁর সাহিত্যে বিরাট এক মোড়-বদল ঘটিয়ে দিয়ে যায়। আর তা তাঁর জীবনকে আরও সম্পূর্ণ আরও অখণ্ড হয়ে উঠতে সাহায্যই করেছে।

এখানে আমরা দেখব বিবিধ বৈচিত্র্য, নানান টানাপোড়েন ও সমস্ত সন্ধির মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কীভাবে একটা সমগ্র ও অখণ্ড ব্যাপার হয়ে উঠল।

তাঁর জীবন প্রথমত বিচিত্র। কত যে দেখেছেন, কত যে করেছেন, কত যে পেয়েছেন। বিপুল অভিজ্ঞতা।

এখন তাঁর বয়স হল নব্বই বছর (জন্ম ১৫ মার্চ ১৯০৪)। কিন্তু নব্বইটি দিনও তিনি বাঁচবেন কিনা ঠাকুমার তাতেই ছিল ঘোর সন্দেহ। কেননা

জন্মের সময় তাঁর সম্বল ছিল একটি মাথা আর কয়েকখানি হাড় মাত্র। তাঁর ভার নিয়ে তাঁকে ঠাকুমা ডুবিয়ে রাখতেন তেল আর হলুদের গামলায়। সে গামলা পড়ে থাকত উঠোনে। সারাদিন রোদ পড়ত গায়ে। একটু একটু করে তাঁর মাংস লাগে।

ছাত্রাবস্থায় তিনি ছিলেন অতি কৃতী ছাত্র, পরীক্ষায় ভালো ফল আর উচ্চ স্থান লাভ প্রায় একচেটিয়া ছিল তাঁর। কিন্তু ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে তাঁর মন ছিল না মোটেই। লেখাপড়ার চেয়েও, সময় বেশি কেটেছে তখন খেলাধুলোয় আচার-অনুষ্ঠানে মেলামেশায়। সাংসারিক কথাবার্তা, সামাজিক মেলামেশা আর মেয়েদের সান্নিধ্য যখন তাঁকে বয়সের তুলনায় পরিপক্ব করে তোলে।

স্কুলে ও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তাঁর ভারনাকুলার ছিল ওড়িয়া। কিন্তু ভারনাকুলার পরীক্ষার দিন তিনি ওড়িয়ার বদলে বাংলা প্রশ্নপত্র পেয়ে দেখেন সবই তাঁর জানা। কেন উত্তর দেবেন না! ভুল না ধরিয়ে দিয়ে তিনি বাংলাতেই উত্তর দেন। ততদিনে তাঁর প্রথম বাংলা রচনা, তলস্তয়ের গল্পের অনুবাদ—তিনটি প্রশ্ন, প্রবাসীতে বেরিয়ে গেছে। সাহিত্যিক জীবনেও, ওড়িয়া রচনা দিয়ে তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত হলেও, পরে তিনি বাংলায় সরে আসেন।

বংশে প্রথম ইংরেজ সরকারের চাকরি নিয়েছিলেন তাঁর বাবা। আর আই.সি.এস. অফিসাররূপে তিনি নিজে ইংরেজরাজ কর্মের উচ্চতম কর্মী হন, ইস্পাতের কাঠামোর শীর্ষ ধাপে ওঠেন। বাবা পরে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশীয় রাজ্যে চাকরি নেন। আর তিনি রাজকর্ম থেকে অকালে অবসর নিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁর সাহিত্যিক শিক্ষানবিশির সূচনা হয়েছিল ছেলেবেলাতেই, মুক্তপ্রাণ জীবনের কাছে। মা-ঠাকুমার সঙ্গে তিনি যেতেন বলরাম মন্দির দর্শনে। ঠাকুর দেখার পর এক পাশে সরে গিয়ে মাহলাতে মহিলাতে কথাবার্তা হত। শাশুড়িরা একদিকে, বউরা আরেক দিকে, কুমারীরা আরো একদিকে। কী প্রাণচাঞ্চল্য, কী ফুর্তি, কী গোপনতা সেই কথোপকথনে! নারী যে রহস্যময়ী তা তাঁকে বই পড়ে শিখতে হয়নি।

লুকোচুরি খেলায় তাঁর ওস্তাদি ছিল। তবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি মেয়েকেই তিনি প্রতিবার ধরতেন বা ধরা দিতেন। তাঁর প্রিয় পড়োশিনি। কোথায় যে বিয়ে হয়ে গেল তার! কী যে হল পরে, জানেন না। অতি মিষ্টি স্বভাব।

তাঁর প্রথম কবিতার প্রথম প্রেরণাময়ী অবশ্য আরেকটি বালিকা। সেটি কলকাতার মেয়ে। দেখতে তেমন ভালো নয় কিন্তু খুব স্মার্ট। ওড়িশার মফস্সলে কলকাতার মেয়ে একটি দুর্লভ বিস্ময়। লিখেই ফেলেন তিনি

বাল্মীকির মতো তাঁর প্রথম শ্লোক। সেই লেখা এঁটে রাখেন দেয়ালের গায়ে। যাতে খুকুমণির চোখে পড়ে ও সে পড়ে অবাক হয়ে যায় যে তিনি একজন কবি। তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি তাকে ভালোবাসেন। খুকুমণি কিন্তু কবিতার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার বিদ্যেও ততদূর নয়।

আরও একটি তরুণী। তার জন্য ও তার প্রেরণাতেই তাঁর আই.সি.এস -এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, প্রথম স্থান লাভ ও প্রশিক্ষণের জন্য ইংলন্ড গমন। কিন্তু ফিরে এসে তার সঙ্গেও আর যোগাযোগ থাকে না, যোগাযোগ হয় না।

জীবনে তিনি অনেক কিছু হতে চেয়েছেন কিংবা তাঁর গুরুজন চেয়েছিলেন যে তিনি হন। বাবা বলেছিলেন, ছেলে জর্জ ওয়াশিংটন হবে। তিনি ওয়াশিংটন না হয়ে তাঁর দেশের একটি কন্যাকে বিবাহ করেন। বাবা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করলেও বউমাকে আশীর্বাদ করেন।

সাহিত্যিক নন, প্রথমে তিনি হতে চেয়েছিলেন সাংবাদিক। কলকাতায় হাতে কলমে সাংবাদিকতা শিখে পালিয়ে যাবেন আমেরিকায়। কিন্তু বসুমতী সম্পাদক তাঁকে বলেন শর্টহ্যান্ড শিখতে আর সার্ভেন্ট সম্পাদক বলেন প্রুফ সংশোধন করতে। এদিকে তিনি হতে চান সম্পাদক, ইংরেজিতে লিখতে চান সম্পাদকীয়। বিরক্ত হয়ে তিনি আমেরিকার বদলে চলে যান বিলেতে, সাংবাদিকের বদলে আই.সি.এস. হতে।

তার ঢের আগে, বারো বছর বয়সেই, সবুজপত্রের পাতায় তাঁর চোখে পড়েছিল আর্ট বলে একটি কথা। তার মানে কী সঠিক জানা না থাকলেও সাহিত্যে তার নমুনা তাঁর চোখের সামনেই ছিল। রূপকে বাদ দিয়ে সার নয়, সারকে বাদ দিয়ে রূপ নয়। তখন থেকেই তাঁর নজর রূপের উপরে, মন সারের উপরে। ওই সময়েই তাঁর প্রথম উপনয়ন হয়। আর্টের গুরুগৃহে উপনয়ন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী তাঁর দুই আদিগুরু।

তেইশ বছর বয়সে ইউরোপের মাটিতে উপনীত হওয়াও এক-প্রকার উপ-নয়ন। তাঁর সেই দ্বিতীয় উপনয়ন না ঘটলে তাঁর ভবিষ্যৎ কেমন আকার নিত কে জানে! তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে সমন্বয় ঘটেছে, স্বদেশ ও স্বকালের যে সমন্বয় ঘটেছে, তার একটা বড় কারণ তাঁর এই ইংলন্ড গমন ও কন্টিনেন্ট ভ্রমণ।

বছর পঞ্চাশ বয়সে আরো একবার উপনয়ন হয় তাঁর। বার বার তিনবার। হঠাৎ একদিন দৃষ্টি খুলে যায়। তিনি নিরীক্ষণ করেন এ বিশ্বের অন্তরে আছে এক সৌন্দর্যলোক। সেই অন্দর মহলে যে প্রবেশ করে সে অন্ধকারেও পায় আলোর দিশা, অসুন্দরেও সুন্দরের দেখা, অমঙ্গলেও মঙ্গলের আভাস। তাঁর উপর বরাত তাঁকে আরও ভিতরে যেতে হবে। আরও গভীরে। যেখানে

রয়েছে সার সৌন্দর্য। শুধুমাত্র বাইরের রূপ নিয়ে তিনি করবেন কী, যদি অন্তঃসৌন্দর্য তাঁকে ধরা না দেয়?

এর আগে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর ছেলে চলে গেছে। যেন বলে গেছে যে তাঁর জীবনযাপনের ধারায় মারাত্মক কোনো ভুল ছিল। চাকরি জীবনে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তিনি ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিলেন। আর ক্ষমতার মতো অনর্থ কী আছে! ওই ট্র্যাজেডি যেন বুঝিয়ে দিল যে জীবনের আমূল পরিবর্তনই শ্রেয়। সেই যে ভাবনা শুরু হল তার পরিণতি রাজকর্ম থেকে তাঁর সাতচল্লিশ বছর বয়সে স্বেচ্ছা-অবসর। কিন্তু জীবনকে সরল, নিরাভরণ, অকপট করে আনা এক কথা, আর আর্টকে সরল, নিরাভরণ, অকপট করে তোলা আরেক।

প্রথম বয়সে তাঁর উচ্চাভিলাষ ছিল তিনি হবেন শক্তিশালী ও সুচতুর লেখক। তাঁর লেখা হবে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো উজ্জ্বল। কিন্তু পুত্রশোকের ট্র্যাজেডির পর থেকে তাঁর ব্রত হল তাঁর লেখা হবে সহজ ও সরল, সপ্রেম ও সরস। তাতে থাকবে অমৃতের স্বাদ। তাতে থাকবে সৌন্দর্যের সারাৎসার। জীবনের সঙ্গে সংগতি রাখতে গিয়ে আর্টেও তিনি ক্ষমতা বিসর্জন দেন। আর্টে ছলচাতুরি ছাড়েন, উজ্জ্বলতা পরিহার করেন। আর্ট হয়ে দাঁড়ায় আর্টলেস। এক একটি বাক্য হয় এক একটি সূত্রের মতো সংক্ষিপ্ত। জেন গুরুদের যেমন। সারটাই আসল। ধারটা কিছু নয়। ভারটা তো বাহুল্য।

সার বলতে অন্তঃসার তো থাকবেই, অন্তঃসৌন্দর্যও থাকা চাই। সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগটা তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে পান। আর বিচিত্রের প্রতি আকর্ষণ। বৈচিত্র্য তো শুধু অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যে নয়, তাঁর জীবনেও।

যুদ্ধ দেখেছেন, দাঙ্গা দেখেছেন, মন্বন্তর দেখেছেন। স্বাধীনতা ও দেশভাগ। যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও যুদ্ধপূর্ব জার্মানি।

সিংহল গেছেন, জাপান গেছেন, ইংলণ্ড গেছেন, ইউরোপ ঘুরেছেন। কিন্তু আমেরিকা বাদ। আমেরিকার মেয়েকে বিয়ে করেছেন তবু আমেরিকা যান নি ('আমার আমেরিকার স্বপ্ন মিলিয়ে এসেছিল। চিত্ত জুড়েছিল ইউরোপ')।

ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন, জজ হয়েছেন, মহাকরণে সচিব হয়েছেন। সরকারি কাজে ধাঁ-দৌড় করেছেন, অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 'সব সিদ্ধান্তই যে ঠিক তা নয়, তবে, কাউকে গুলি করে মারতে বা ফাঁসীতে ঝোলাতে হুকুম দিইনি।'

গান্ধীর সঙ্গ পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়েছেন, রলাঁর সঙ্গ পেয়েছেন। রাধাকৃষ্ণন ও নেহরুর।

নেহরুর সঙ্গে মিটিং করেছেন, ইন্দিরার সঙ্গে এক টেবিলে ইটিং, রাজীবের সঙ্গে মিটিং ও ইটিং দুইই।

বাস চড়েছেন, ট্রেন চড়েছেন, প্লেন চড়েছেন, জাহাজ চড়েছেন। চড়েছেন পালকি ও গোরুর গাড়ি। হাতি ও ঘোড়া। শুধু উট বাদ—

'অনেক আগে আমার ছেলেবেলায়
উটের গাড়ী চলত নাকি
দূর বাঁকুড়া জেলায়।
বড়ো হয়ে চাকরি পেলেম যেই
দেখি সেথায় মোটর চলে
উটের গাড়ী নেই।
আরো বড়ো হলেম যখন আবার
কথা ছিল বদলি হয়ে
রাজস্থানে যাবার।
গেলে আমার মিটত একটি সাধ
হাতী ঘোড়া সব চড়েছি
উট চড়াটাই বাদ।'

গেটে ও দান্তে, তলস্তয় ও শোপেনহাওয়ার, রাফেল ও রলাঁ, শ ও মান— কত যে বিশ্ব-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, কবিতা ও প্রবন্ধ! কত না বিখ্যাত ভারতীয় সম্পর্কে। আর বোধ করি সমস্ত বিখ্যাত বাঙালি সম্পর্কেই। শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নেতাজি বাদ।

রবীন্দ্রনাথের মতো, সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনায়, প্রতিটি স্মরণীয় মুহূর্তে রিয়্যাক্ট করেছেন ও নিজের প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়েছেন— নাৎসিবাদের উদ্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশভাগ ও প্রদেশ ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, চীন-ভারত সংঘর্ষ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বাংলাদেশের জন্ম, জরুরি অবস্থা, উপ-মহাসাগরীয় সমর। শুধু ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধ বাদ।

তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাসগুলির নায়কেরা তাঁর মতোই ভাবত ভালোবাসার গভীরতা ও গাঢ়তা দীর্ঘদিন থাকে না, চিরন্তন একনিষ্ঠতা বলে কোনো কিছু হয় না, তাই তারা তাদের প্রিয়াদের চিরকালের মতো বিয়ে করবে, ভালোবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে এমন অঙ্গীকার দিতে পারেনি। কিন্তু তাঁর ও লীলা রায়ের যুগ্ম জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা দেখি, ভালোবাসার গভীরতা ও গাঢ়তা চিরকাল থাকে, থাকতে পারে, চিরন্তন একনিষ্ঠতা সম্ভব। আর এইভাবে ঘটে তাঁর বক্তব্যের ওপর তাঁর শিল্পের ওপর তাঁর জীবনের জয়।

নয়তো তাঁর বহু বক্তব্য বা বিবৃতিই ২০, ৩০ বা ৪০ বছর পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে— যেন Prophetic Statements। যেমন ইউরোপের কমিউনিটি থিয়েটার আন্দোলনের আদলে আমাদের দেশেও লিটল থিয়েটারের প্রবর্তন কেন প্রয়োজন ও কেমন হবে তার ধরন ও কাঠামো সে-সম্বন্ধে ১৯৩০ সনেই তিনি স্পষ্ট মত দেন (‘লিটল থিয়েটারের সমস্তই ছোট। স্টেজ ছোট, প্রেক্ষাগৃহ ছোট, নাটক ছোট। এ্যামেচার থিয়েটার আমাদের অনেক আছে। কিন্তু লিটল থিয়েটার তার চেয়ে উঁচুদরের। লিটল থিয়েটার প্রতিদিন নাট্য-চর্চা করবে, ছুটির দিনে একটু তামাসা দেখাবে না। লিটল থিয়েটারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দু'শো জন মেম্বারের আত্মোৎকর্ষ। দু'শোজন মানুষের ঘরোয়া ব্যাপার—ক্লাব বললেও হয়, পরিবার বললেও চলে’।)। যে প্রকল্প পরে উৎপল দত্তদের দ্বারা, লিটল থিয়েটার গ্রুপদের দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত।

যেমন ১৯৩২ সনে নওগাঁয় কেন্দ্রীয় হাইস্কুলে কৃষিকে করতে চান তিনি উপরের ক্লাসের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়, তাঁর বিশ্বাস ছিল, বিষয়টা ঐচ্ছিক হলেও আবশ্যিকের মতোই কাজ দেবে। ছাত্রেরা প্রায় সবাই চাষী গৃহস্থের পুত্র। চাষ কেমন করে আরও বৈজ্ঞানিক ও আরও লাভজনক হয়, সেটা তাদের ঘরের দোরগোড়ায় তারা নিখরচায় শিখতে পারবে। চাকরির জন্যে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হবে না। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, চাষির ছেলেরাও চায় চাকুরে হতে, তাদের চাষে অরুচি। তাদের অভিভাবকরাও চান জাতে উঠতে। চান চাষিকে চাষ শেখানোর নয়, হাইস্কুল হোক, চাষিকে রাজভাষা শিখিয়ে রাজপুরুষ বানানোর। তখনকার মতো তাঁর আইডিয়া ব্যর্থই হয়। উনচল্লিশ বছর পরে স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়ে তিনি শোনেন, তাঁর সেই পরিকল্পনার কাগজপত্র সরকার পড়েছেন ও বাংলাদেশ স্থির করেছে সব হাইস্কুলেই কৃষিবিদ্যা শেখাবে। না, কিছুই ব্যর্থ যায় না। তবে তার সময় অসময় আছে।

যেমন সাহিত্য অকাদেমির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলেন, অকাদেমির কাজ হবে চোদ্দ পনেরোটি ভাষা নিয়ে। বিভিন্ন ভাষার সমস্যা বিভিন্ন। ফলে প্রত্যেকটি ভাষার জন্যে সাহিত্য অকাদেমির স্বতন্ত্র শাখা স্থাপন করা হোক। শুনে নেহরু না বলেন। তা যদি করা হয় তবে না কি ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবি উঠবে, ভারত বলকান হয়ে যাবে। রাধাকৃষ্ণন নেহরুকে সমর্থন করেন। লেখককে কেউ সমর্থন করেন না। এর কিছুদিন পরেই শ্রীরামুলুর অনশনে দেহত্যাগ। কোথায় ভেসে যায় নেহরুর যুক্তি! ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন করতেই হয়। পানিকরের কমিশনের সুপারিশে বহু রাজ্য ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়। যেগুলি তখন হয় না সেগুলিও পরে, গোলমালের

ভিতর দিয়ে হয়। কালক্রমে রাজ্যে-রাজ্যে সাহিত্যের আঞ্চলিক অকাদেমিও গড়ে ওঠে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমি।

দেশভাগ ও প্রদেশভাগ, চীন-ভারত সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বলকানিকরণ, জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ, নারীমুক্তি— নানান বিষয়ে তাঁর স্ট্যান্ড বা মত পরবর্তী কালে সঠিক ও অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতই প্রফেটের মতন দূরদর্শিতা তাঁর। যেজন্য তিনি সাহিত্যিকের চেয়ে বড়, চিন্তাবিদ।

চিন্তাবিদ বলেই তাঁর জীবনে শুধু বৈচিত্র্য নয়, টানাপোড়েনও এসেছে, টানাপোড়েনও আছে। নানান পর্বে, নানান স্তরে, বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে।

যেমন ষোল-সতেরো বছর বয়সে তাঁর ব্যক্তিজীবনে আসে এক দোটানা। এক হাত ধরে পশ্চিম তাঁকে টানে আধুনিক জগতের মুখ্যস্রোত যেখানে প্রবহমান সেখানে; আর এক হাত ধরে পল্লী তাঁকে টানে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগযুক্ত ভারতীয় জনগণের মুখ্যস্রোত যেখানে প্রবহমান সেখানে। এ দোটানা তাঁর জীবনে আসে গান্ধীযুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি একবার এদিকে ঝোঁকেন একবার ওদিকে। কিছুতেই মনঃস্থির হয় না। অবশেষে তিনি পশ্চিমেই যাত্রা করেন। অবগাহন করেন আধুনিক জগতের মুখ্যস্রোতে।

তেমনি বাইশ বছর বয়সে তাঁর সাহিত্যিক জীবনে আসে আর এক দোটানা। ওড়িয়া ও বাংলা দুটি ভাষাই নয়, একমাত্র বাংলা ভাষা হবে তাঁর সাহিত্যের ভাষা, এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া তখন ছিল জুয়াখেলার সামিল। ওড়িয়া ভাষার প্রথম শ্রেণীর লেখক না হয়ে হবেন হয়তো বাংলা ভাষার দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। কী লাভ? তিনি কিন্তু তখন এসব গণনাকে মনে ঠাঁই না দিয়েই বাংলাভাষায় সরে আসেন এবং কালক্রমে বাংলা ভাষাতেও প্রথম শ্রেণীর লেখক হন।

তার পরে কর্মজীবন তাঁকে টেনে নিয়ে গেল প্রশাসনের জগতে। বাস্তব পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে। এমন এক জগতে যেখানে তাঁকে অসংখ্য মানুষের সুবিধা-অসুবিধার দায়ভাগ নিতে হয়, সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের দ্রষ্টা হতে হয়। আবার দোটানা। দুই চড়ার মাঝখান দিয়ে নৌকো চালাতে হয় তাঁকে। একদিকে রিয়ালিটির আকর্ষণ, অন্যদিকে সাহিত্যের আকর্ষণ। নৌকোটা শেষে ডুবতে বসেছিল। তাকে রক্ষা করার জন্য চাকরিটাই ছেড়ে দিতে হল। সাহিত্যকে ছাড়লে তিনি কেউ নন, কিছু নন। আর চাকরি রেখে সাহিত্য করলে তাঁর প্রত্যয়, সাহিত্যে একটা মাঝারি উচ্চতায় ওঠা যাবে, চূড়ান্ত উচ্চতায় নয়।

সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে আর একটি টানাপোড়েন তাঁর এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তলস্তয়ের কাছ থেকে যে বিশুদ্ধ শিল্পাদর্শ তিনি আহরণ

করেছিলেন— একদিকে সেই অত্যুচ্চ শিল্পাদর্শের প্রতি তাঁর টান, অন্যদিকে গান্ধীর প্রভাবে পড়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের শরিক হবার বাসনা— যে টানাপোড়েন সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সাহিত্যচেতনা ও গদ্যরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর শৈলীতে গান্ধীর বাক্‌রীতির যে প্রলেপ তার উৎস ওইখানে।

এই টানাপোড়েন তাঁর শৈলীর ক্ষেত্রে এই রূপ পায়— আর্ট কি আপনি আপনার উদ্দেশ্য, আপনি আপনার উপায় না আর্ট তার চেয়ে মহত্তর আর কিছুর, তার চেয়ে বেশি কিছুর উপায়? রলাঁ বা শেষ-বয়সের তলস্তয়ের দৃষ্টি ছিল জনগণের উপরে। আর্টের জন্যই আর্ট নয়, জনগণের জন্য আর্ট। কিন্তু বহু শিল্পী-সাহিত্যিকের মতে আবার আর্ট সমঝদারদের জন্যে, বিদগ্ধ-জনের জন্যে। তা সর্বজনবোধ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তা উচ্চতর গণিতের মতো। আগে তো সরল গণিত শিখতে হবে। দুটি মত ও দুটি পথের সমন্বয় ও সংশ্লেষণ করে লেখক ঠিক করেন, তিনি পাঠকদের দিকে অর্ধেক দূর যাবেন, পাঠকরা তাঁর দিকে অর্ধেক দূর আসবেন। তিনি যেমন তাঁদের জন্য শ্রম স্বীকার করবেন তেমনি তাঁরাও তাঁর জন্য শ্রম স্বীকার করবেন। বিশুদ্ধ আর্টের রসাস্বাদন ও রূপভোগের জন্য জনগণকেও প্রস্তুত হতে হবে। যা নিছক জনপ্রিয় তা রসোত্তীর্ণ ও রূপোত্তীর্ণ তথা দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ নাও হতে পারে।

কিন্তু উত্তীর্ণ হওয়াটাই লক্ষ্য। তাই আর্টে তিনি ক্ষমতা বিসর্জন দিলেও রস বিসর্জন দেন না, রূপ বিসর্জন দেন না। সত্তরে পড়ে তিনি হৃদয়ংগম করেন যে জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটলেও আর্টের আমূল পরিবর্তন ঘটে না। ঘটা উচিতও নয়। জীবনের সঙ্গে আর্টকে সবসময়ে মেলাতে গেলে সে তার আপনার লক্ষ্য ভেদ করতে পারে না। জীবনের লক্ষ্য আর আর্টের লক্ষ্য এক নয়। মানুষ হিশেবে ভালো হতে চাওয়া নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্তু মানুষ হিশেবে ভালো হতে গিয়ে শিল্পী হিশেবে মন্দ হওয়া একেবারেই ভুল। শিল্পের ভালো নীতির বিচারে নয়, রসের বিচারে, রূপের বিচারে। এর সঙ্গে সত্যের নিরিখেও। কিন্তু নিছক নীতির চাপে যেন আর্ট চাপা না পড়ে।

এইভাবে একটার পর একটা দোটানার সমাধান করতে করতে চলেন লেখক। আর টানাপোড়েনের চেয়েও যা বৃহত্তর কিছু তা-ও ঘটে তাঁর জীবনে। সন্নিধি। অন্তত তিনটি সন্নিধি। একটি মনন বনাম বিশ্বাস। জীবন-দেবতার কাছে জীবনভর যে তিনটি বর তিনি চেয়েছেন তার একটি হল প্রেম। তাঁর সত্তা তাঁর হৃদয় যেন সুধারসে ভরে যায়। তিনি যেন সেই রসের আস্বাদন পান ও দেন। তাঁর প্রেম যেন সকলের প্রতি প্রসারিত হয়, সকলের মধ্যে যিনি ঊর্ধ্বে তাঁর সমীপেও পৌঁছোয়। এই বরের সুবাদে

তিনি বুদ্ধিজীবীর চেয়ে বড়ো, একজন হৃদয়জীবী। 'তাঁর রচনা এমন এক মননশীলতার জগৎ যেখানে বিশ্বাসীরা জেগে ওঠে।'

দ্বিতীয় সন্নিধি কর্তব্য বনাম রসের। তাঁর প্রার্থিত আর একটি বর হল সৃষ্টির আনন্দ-বেদনা। তিনিও যেন কিছু সৃষ্টি করে যেতে পারেন। বিশ্বস্রষ্টা তাঁকেও যেন তাঁর সৃষ্টিশক্তির একটি কণা দেন। তাই দিয়ে তিনিও যেন সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরও একটি ছোটখাটো কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ জগৎ। এই বরের সুবাদে লেখক একটার পর একটা সৃষ্টি করেন আর একটুর পর একটু মুক্ত হন। যদিও তাঁর প্রধান কাজ এই সৃষ্টি, তবু তাঁকে কখনো-কখনো সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে, রসের দায় সরিয়ে রেখে, দেশের ও কালের ভাবনার দায়িত্ব নিতে হয়। নইলে তিনি হবেন পলায়নবাদী। কিন্তু লেখকের যে হাতে গল্প-উপন্যাস লেখা সেই হাতে দায়িত্বের রচনা লেখা নয়। 'আমার ডান হাত চিরকালের মতো পিওর ডিলাইটের জন্যে রাখা। কর্তব্যের জন্যে বাম হাত।'

সবশেষে রিয়ালিটি বনাম ভিশন। তাঁর প্রথম বরটিই ছিল ইলুমিনেশন। তাঁর অন্তর যেন আলোয় ভরে যায়। বিশ্বরহস্য যেন তিনি সেই আলো দিয়ে ভেদ করতে পারেন। সমস্ত যেন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। বারবার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও তাঁকে বাঁচিয়েছে তাঁর এই জ্যোতির্ময় ভিশন। সব মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কখনও মিথ্যা হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করেন যে মানবজীবনই শেষ জীবন নয়। এই জগৎ অনাদি, অনন্ত, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে আরও এক জগৎ আছে, প্রত্যক্ষ জগৎই সমগ্র জগৎ নয়, দুয়ে মিলিয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টি। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে একবার আর বিশ একুশ বছর বয়সে একবার এক-এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করেন, মুহূর্তের জন্যে সব আলো হয়ে যায়। তিনি সমগ্রকে দেখতে পান। তাঁর অন্তরে একজন মিস্টিক ছিল, তাই তিনি কখনও পুরোপুরি র‍্যাশনালিস্ট হননি। তেমনি তাঁর ভিতরে একজন বিশ্বনাগরিক আছে, তাই তিনি কখনও পুরোপুরি ন্যাশনালিস্ট নন।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এবং বিবিধ সন্নিধির ফলস্বরূপ তাঁর যে বিবর্তন ঘটে তা তাঁর জীবন ও শিল্পের এক নান্দনিক সমীকরণ ঘটিয়ে তাঁকে শিল্পীর চেয়ে বড়ো করে তোলে, করে তোলে জীবনশিল্পী। শিল্পী না হয়েও একজন হতে পারেন জীবনশিল্পী যদি তাঁর জীবনটা হয় একটা সমগ্র ও অখণ্ড ব্যাপার, সেখানে কোনো ভাঙাচোরা নেই, অন্তঃবিরোধ নেই, অসংগতি নেই। জীবনটা একটা শিল্পকর্মের বা একখানা গানের মতো সুসংগত ও সযত্ন রচিত। সংগীতের নিয়ম মেনে, সংযম রক্ষা করে, নিষ্ঠার সঙ্গে ও অন্তর থেকে যে গানখানি গাওয়া। যাতে প্রতিদিনের প্রত্যেক কাজ

পরস্পর সংগত হয়েছে, সবটা মিলিয়ে হয়েছে চমৎকার একটা ঠাসবুনন। তাতে অবান্তর কিছু থাকেনি, অভাবও থাকেনি কিছুর। জীবনকে পরতে পরতে পর্বে পর্বে আপন কণ্ঠে গাওয়া হয়েছে, আপন হাতে সাজানো হয়েছে। অন্নদাশংকর এইভাবে একই সঙ্গে শিল্পী ও জীবনশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের মতো। তাঁর জীবন 'কেন বাঁচব' ও 'কেমন ভাবে বাঁচব' এ প্রশ্নের এক চমৎকার উত্তর।

সারা জীবন তিনি তাঁর ইচ্ছা-মতো বেঁচেছেন। আর সৃষ্টিশক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সৃষ্টিশক্তি একপ্রকার আগুন। যে আগুন মহাজগতে জ্বলছে সে আগুন তাঁর অন্তরেও। তাকে জ্বালিয়ে রাখাই তাঁর সাহিত্যিক হওয়ার পূর্বশর্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আয়ুরও। নতুবা তিনি কবে মরে যেতেন।

একদা তাঁর প্রার্থনা ছিল যৌবন চলে গেলে যেন জীবনও চলে যায়। কিন্তু বাস্তবে প্রথম যৌবন যখন চলে গেল দ্বিতীয় যৌবন তার স্থান নিল। তাঁর জীবন হল দীর্ঘতর, সৃষ্টি বিচিত্রতর—

যৌবনের দূত আমি যৌবনের শেষে
হেথা হতে যাব চলে অন্য কোনোখানে।
সেখানেও নিত্য লীলা মাধবী বিতানে।
যৌবন পোহালে যাব যৌবনের দেশে।

* * *

আসবে না ফিরে তরুণ সময়
অন্তর হবে তারুণ্যময়।
প্রথম যৌবনের হলো ইতি
দ্বিতীয় যৌবনের হবে স্থিতি।

তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্ব দ্বিতীয় যৌবন এনে দেয়। 'রত্ন ও শ্রীমতী' তৃতীয় খণ্ড লেখা শেষ হতে এই তৃতীয় পর্ব তথা দ্বিতীয় যৌবনও নিঃশেষ। পরবর্তী পঁচিশ বছর, আজ অবধি, তাঁর জীবনের চতুর্থ পর্ব। সেই যে ১৯৫২ সনে তিনি লিখেছিলেন—

সকালে যদি রিভিউ লিখি বিকালে লিখি কাব্য
কখন কথা কইব তবে? কখন তবে ভাবব?
কখন তবে নাইব এবং খাব।

* * *

দুপুরে যদি পত্র লিখি নিশীথে নিবন্ধ
কখন ভালোবাসব তবে? করব কখন দ্বন্দ্ব?
কখন তবে শোব, স্বপ্ন দেখব!

* * *

এবেলা যদি কাহিনী লিখি ওবেলা লিখি ভাষণ
কখন তবে খেলব, বল? করব কখন শাসন?
কখন তবে নাচব এবং বাঁচব!—

তারপর থেকে আজ-পর্যন্ত তাঁর সেই আশ-মিটিয়ে বাঁচা চলেছে। এই বাঁচা শুধু জীবনে নয়— শিল্পেও। সশিল্প জীবনে—

ধর্মে আমার হলো নাকো মতি
ভাবিনে কী হবে পরকালে গতি।
ইহকালে যদি না জানি বাঁচতে
কেন যাব কৈবল্য যাচতে!
ধর্ম না যদি বাঁচতে শেখায়
তারে নিয়ে আমি করব কী, হায়!
জানি নাকো আমি কত দিন আছি
বাঁচতে শিখব যত দিন বাঁচি।
ধর্ম যদি-না বাঁচতে শেখায়
শিল্পের কাছে যাব পুনরায়।
দিবসরাত্রি সৃষ্টি যে করে
রসমাধুর্য বৃষ্টি যে করে
জীবন কি তার কখনো ফুরায়!
পেয়ালা যে তার ভরে পুনরায়।

এই বাঁচতে শেখার মোটো (motto) ও অনিঃশেষ জীবনের সাধনার জন্যই তাঁর অস্তিত্বকে জীবনশিল্প বলেছি। জীবন ও শিল্প যেখানে পরস্পর পরস্পরে ওতঃপ্রোত। জীবন কবে সম্পূর্ণ হবে? না, যেদিন সমস্ত লেখা সমাপ্ত হবে—

এমন দিন কবে সত্য হবে
সকল লেখা হবে সাঙ্গ
প্রণাম করে যাব ধরিত্রীরে
জীবন হবে পূর্ণাঙ্গ।

তবু জীবনে শিল্পই সব নয়—

জীবনে সব নয় কবিতা লেখা।
সত্য করে চাই বাঁচতে শেখা।
সে পথে যদি পড়ে অন্তরেখা
মরণ নয় সেও বাঁচতে শেখা।—

এই অনাদি অনন্ত জগতে কত কী দেখবার আছে, দেখতে হবে। করবার আছে, করতে হবে। হবার আছে,

হতে হবে। এ শুধু লেখকের নিছক বিবৃতি নয়, অন্তরঙ্গ বিশ্বাস। এই জীবনশিল্পীর ধর্ম তাহলে কী?

তবে তাই হোক, আমার ধর্ম
সব ছেড়ে দিয়ে শিল্পকর্ম।
আমার মুক্তি নীরবে নিজনে
অপ্রতিমের প্রতিমা সৃজনে।
আমি ধ্যান করি পরম রূপের
বীভৎসতাও তাঁরই হেরফের।
তাঁকেই দেখেছি চোখ খোলা রেখে
তাঁকেই এঁকেছি হাতে কালি মেখে।
এ জীবনে তাঁরে দেখা আর আঁকা
এই তো মুক্তি। আর সব ফাঁকা।

এ-ই লেখকের জীবনধর্ম, জীবনশিল্পীর জীবনধর্ম এই। জীবন, শিল্প আর ধর্ম সব কিছুকে একসঙ্গে গেঁথে এক পরম সমীকরণে পেঁছে যান অন্নদাশঙ্কর।

পঞ্চান্ন বছর আগে নিজের জন্য এপিটাফে লেখক লিখেছিলেন—

লোকটা ছিল তরুণ
শেষ নিঃশ্বাসে
শেষ হিক্কায়
শেষ ধুক্‌ধুকে
তরুণ।

এই তারুণ্যই অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে প্রথম ও প্রধান কথা। এই বইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভাব্য নাম ছিল তাই 'চিরহরিৎ বৃক্ষ'। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'আমাদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর হলেন এক মহীরুহ, শিল্পী হিসেবে, মানুষ হিসেবেও।' তাঁকে সামনে রেখেই নিজের সম্পর্কে কবি বীরেন্দ্রর এই উক্তি— 'আমি সারা জীবন পাতাঝরা গাছের মতো হায়রে, তুমি এখনো বলো চিরহরিৎ বৃক্ষ হতে!'

সমাপ্তিতে বলতে হয়, মরতে ভয় পায় শুষ্ক বল্কল বৃদ্ধরাই, চিরহরিৎ তরুণরা নয়। তাই অন্নদাশঙ্কর রায় লিখতে পারেন, লেখেন, 'ব্রহ্মস্বাদ যতবার পাই ততবার পেতে সাধ যায়। ব্রহ্ম বিহারে তৃপ্তি নেই। মরণ এর কাছে কিছু নয়। ও আমি এক লাফে পেরিয়ে যাব।' (— মীনপিয়াসী গল্প থেকে)॥

১৫. ১০. ৯৪.

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি

বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থনির্দেশ

কবিতা ও ছড়া

১ রাখী ১৯২৯
২ একটি বসন্ত ১৯৩১
৩ কালের শাসন ১৯৩৩
৪ কামনা পঞ্চবিংশতি ১৯৩৪
৫ উড়কি ধানের মুড়কি ১৯৪২
৬ নূতনা রাধা ১৯৪৩
৭ রাঙা ধানের খৈ ১৯৫০
৮ ডালিম গাছে মৌ ১৯৫৮
৯ শালি ধানের চিড়ে ১৯৭২
১০ আতাগাছে তোতা ১৯৭৪
১১ হৈ রে বাবুই হৈ ১৯৭৭
১২ হট্টমালার দেশে ১৯৮০
১৩ ক্ষীর নদীর কূলে ১৯৮০
১৪ রাঙা মাথায় চিরুনি ১৯৮০
১৫ ছড়া সমগ্র ১৯৮৫
১৬ শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৮৬
১৭ বিন্নি ধানের খই ১৯৮৯
১৮ কলকাতার পাঁচালী ১৯৯২
১৯ যাদু এ তো বড় রঙ্গ ১৯৯৪
২০ সাত ভাই চম্পা ১৯৯৪

গল্প

১ প্রকৃতির পরিহাস ১৯৩৪
২ দুকান কাটা ১৯৪৪
৩ হাসনসখী ১৯৪৫
৪ মন পবন ১৯৪৬
৫ যৌবন জ্বালা ১৯৫০
৬ কামিনীকাঞ্চন ১৯৫৪
৭ রূপের দায় ১৯৫৮
৮ গল্প ১৯৬০
৯ কথা ১৯৭১
১০ কাহিনী ১৯৮০
১১ শ্রেষ্ঠ গল্প ১৯৮৪

উপন্যাস

১ আগুন নিয়ে খেলা ১৯৩০
২ অসমাপিকা ১৯৩১
৩ সত্যাসত্য : যার যেথা দেশ ১৯৩২
৪ পুতুল নিয়ে খেলা ১৯৩৩
৫ সত্যাসত্য : অজ্ঞাতবাস ১৯৩৩
৬ সত্যাসত্য : কলঙ্কবতী ১৯৩৪
৭ সত্যাসত্য : দুঃখমোচন ১৯৩৬
৮ সত্যাসত্য : মর্তের স্বর্গ ১৯৪০
৯ সত্যাসত্য : অপসরণ ১৯৪২
১০ না ১৯৫১
১১ কন্যা ১৯৫৩
১২ রত্ন ও শ্রীমতী (১ম) ১৯৫৬
১৩ রত্ন ও শ্রীমতী (২য়) ১৯৫৮
১৪ সুখ ১৯৬১
১৫ বিশল্যকরণী ১৯৬৭
১৬ তৃষ্ণার জল ১৯৬৯
১৭ রত্ন ও শ্রীমতী (৩য়) ১৯৭২
১৮ রাজঅতিথি ১৯৭৮
১৯ ক্রান্তদর্শী (১ম) ১৯৮৪
২০ ক্রান্তদর্শী (২য়) ১৯৮৫

২১ ক্রান্তদর্শী (৩য়) ১৯৮৫
২২ ক্রান্তদর্শী (৪র্থ) ১৯৮৬

প্রবন্ধ

১ তারুণ্য ১৯২৮
২ আমরা ১৯৩৭
৩ জীবনশিল্পী ১৯৪১
৪ ইশারা ১৯৪৩
৫ বিনুর বই (প্রথম পর্ব) ১৯৪৪
৬ জীয়ন কাঠি ১৯৪৯
৭ দেশকালপাত্র ১৯৪৯
৮ প্রত্যয় ১৯৫১
৯ নতুন করে বাঁচা ১৯৫৩
১০ আধুনিকতা ১৯৫৩
১১ সাহিত্যে সংকট ১৯৫৫
১২ কণ্ঠস্বর ১৯৫৬
১৩ অপ্রমাদ ১৯৬০
১৪ দেখা ১৯৬১
১৫ রবীন্দ্রনাথ ১৯৬২
১৬ প্রবন্ধ ১৯৬৪
১৭ খোলা মন ও খোলা দরজা ১৯৬৭
১৮ আর্ট ১৯৬৮
১৯ গান্ধী ১৯৭০
২০ দিশা ১৯৭০
২১ প্রাণরক্ষা ও বংশরক্ষার অধিকার ১৯৭০
২২ শুভোদয় ১৯৭২
২৩ বাংলার রেনেসাঁস ১৯৭৪
২৪ শিক্ষার সংকট ১৯৭৬
২৫ কাঁদো, প্রিয় দেশ ১৯৭৬
২৬ প্রেম ও বন্ধুতা ১৯৭৬
২৭ চক্রবাল ১৯৭৮
২৮ আই.সি.এস. ১৯৭৮
২৯ লালন ও তাঁর গান ১৯৭৮
৩০ চিত্ত যেথা ভয়শূন্য ১৯৭৮

৩১ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ১৯৭৮
৩২ বাংলাদেশে ১৯৭৯
৩৩ সাতকাহন ১৯৭৯
৩৪ টলস্টয় ১৯৮০
৩৫ স্বাধীনতার পূর্বাভাস ১৯৮০
৩৬ জাতিবৈর ১৯৮১
৩৭ শিক্ষার ভবিষ্যৎ ১৯৮১
৩৮ সংহতির সংকট ১৯৮৪
৩৯ সংস্কৃতির বিবর্তন ১৯৮৪
৪০ সিংহাবলোকন ১৯৮৫
৪১ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ১৯৮৫
৪২ নতুন প্রবন্ধ ১৯৮৬
৪৩ দেখাশোনা ১৯৮৮
৪৪ স্রোতের দীয়া ১৯৮৯
৪৫ এই সময় ১৯৮৯
৪৬ যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ১৯৯০
৪৭ সন্ধিক্ষণ ১৯৯১
৪৮ যেন ভুলে না যাই ১৯৯২
৪৯ বিনুর বই (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একত্রে) ১৯৯৩

বিবিধ

১ পথে প্রবাসে (ভ্রমণকাহিনী) ১৯৩১
২ ইউরোপের চিঠি (ভ্রমণকাহিনী) ১৯৪৩
৩ পাহাড়ী (কিশোর উপন্যাস) ১৯৪৪
৪ আলাপ (চিঠিপত্র) ১৯৫৩
৫ রাতের অতিথি (কাব্যনাট্য) ১৯৫৪
৬ চতুরালি (নাটক) ১৯৫৫
৭ জাপানে (ভ্রমণকাহিনী) ১৯৫৯
৮ ফেরা (ভ্রমণকাহিনী) ১৯৬৬
৯ চেনাশোনা (ভ্রমণকাহিনী) ১৯৭৫
১০ কিশোর সঞ্চয়ন (সংকলন গ্রন্থ) ১৯৮৪

রচনা সমগ্র

১ প্রবন্ধ সমগ্র[১] (১ম খণ্ড) : সম্পাদনা / ধীমান দাশগুপ্ত ১৯৯২
২ প্রবন্ধ সমগ্র (২য় খণ্ড) : সম্পাদনা / ধীমান দাশগুপ্ত ১৯৯৩

৩ প্রবন্ধ সমগ্র (৩য় খণ্ড) : সম্পাদনা / ধীমান দাশগুপ্ত ১৯৯৪
৪ অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী[২] (১ম খণ্ড) : সম্পাদনা / ধীমান দাশগুপ্ত ১৯৮৭
৫ অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (২য় খণ্ড) : সম্পাদনা / ধীমান দাশগুপ্ত ১৯৮৭
৬ অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (৩য় খণ্ড) : সম্পাদনা / ধীমান দাশগুপ্ত ১৯৮৮
৭ অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) সম্পাদনা / ধীমান দাশগুপ্ত ১৯৮৯
৮ অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (৫ম খণ্ড) সম্পাদনা / ধীমান দাশগুপ্ত ১৯৯৪

[প্রবন্ধ সমগ্রের প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রচ্ছদ প্রবীর সেন, দাম ১ম ও ২য় খণ্ড ৮০্ করে, ৩য় খণ্ড ১০০্

রচনাবলীর প্রকাশক বাণীশিল্প ও শ্যামলী, প্রচ্ছদ প্রণবেশ মাইতি, দাম : ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড ৬০্ করে, ৪র্থ খণ্ড ৮০্, ৫ম খণ্ড ১৩০্ ।]

অন্যান্য ভাষা

১ সবুজ কবিতা (ওড়িয়া কবিতা) ১৯৩১
২ বাসন্তী (ওড়িয়া উপন্যাসের তিনটি পরিচ্ছেদ) ১৯৩১
৩ Bengali Literature (ইংরেজি প্রবন্ধ) ১৯৪২
৪ সবুজ অক্ষর (ওড়িয়া রচনাসংগ্রহ) ১৯৬৬
৫ Flight and Pursuit (ইংরেজি প্রবন্ধ) ১৯৬৮
৬ Yes, I Saw Gandhi (ইংরেজি প্রবন্ধ) ১৯৭৬
৭ Companion of the Road (কবিতার অনুবাদ) ১৯৭৬
৮ A Writer Speaks (ইংরেজি প্রবন্ধ) ১৯৭৭
৯ Woman and Other Stories (গল্পের অনুবাদ) ১৯৭৭
১০ An Outline of Indian Culture (ইংরেজি প্রবন্ধ) ১৯৭৮
১১ In Retrospect (ইংরেজি প্রবন্ধ) ১৯৮৯

১ আনুমানিক ৮ খণ্ডে প্রকাশিতব্য।
২ আনুমানিক ১৪ খণ্ডে প্রকাশিতব্য।

কালানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জি

তারুণ্য

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদ শ্রীমতী লীলা রায়

মূল্য পাঁচ সিকা

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সাতটি প্রবন্ধই ইংলণ্ডে প্রবাসকালে লিখিত। রচনাকাল ১৯২৮।

উৎসর্গ—আমার দেশের আমার কালের / তরুণ তরুণীকে / নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন।

প্রথম প্রকাশ ১৯২৮। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৪ (১৯৪৭)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক লেখেন, ১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে তারুণ্য লেখা হয়। ইচ্ছা ছিল প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরীক্ষা করে দেখব আমার মতবাদ বা আন্তরিক বিশ্বাস কী পরিমাণে বিবর্ত্তিত বা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। পরীক্ষার মাপকাটি হবে 'তারুণ্য'।

রাখী

প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রচ্ছদে কোন চিত্র নেই, শুধু নামাঙ্কন।

মূল্য অনুল্লিখিত

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৭-২৯। রচনাস্থল ইউরোপ।

উৎসর্গ—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ করে— / আমরা দু'জনা দুই কাননের পাখী / একটি রজনী একটি শাখার শাখী / তোমায় আমায় মিল নাই মিল নাই / তাই বাঁধিলাম রাখী।

প্রথম প্রকাশ ১৯২৯। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩০

দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের সংকেত অনুসারে স্থানে স্থানে পরিমার্জিত।

আগুন নিয়ে খেলা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য তিন টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩০।

উৎসর্গ—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু-কে।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৩৭। দ্বিতীয় সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬। তৃতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৫২। চতুর্থ সংস্করণ মাঘ ১৩৫৭। পঞ্চম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৩

পথে প্রবাসে

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য চার টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯২৭-২৯।

উৎসর্গ—শ্রীসরলা দেবী আয়ুষ্মতীষু

প্রথম সংস্করণ ১৯৩১। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৭। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪১। চতুর্থ সংস্করণ ১৯৪৬। পঞ্চম সংস্করণ ১৯৪৯। ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৫৩। সপ্তম সংস্করণ ১৯৫৬। অষ্টম সংস্করণ ১৯৫৯। নবম সংস্করণ ১৯৬৩। দশম সংস্করণ ১৯৬৬

মিত্র-ঘোষ পেপার-ব্যাক ক্লাসিক্স-এ বইটির পেপার-ব্যাক সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৮০ তে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. থেকে।

গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা সংযোজিত।

অসমাপিকা

প্রকাশক—শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার, এম, সি, সরকার এন্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রচ্ছদ—কোন ছবি নেই, শুধু নামাঙ্কন।

দাম দুই টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল মার্চ-এপ্রিল, ১৯৩০। পরে সামান্য যোগ-বিয়োগ করা হয়েছে।

উৎসর্গ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সুহৃদ্বরেষু

প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫২। তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬১
প্রথম সংস্করণে কোনো ভূমিকা ছিল না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও রচনাবলী সংস্করণে ভূমিকা ছিল।

একটি বসন্ত

প্রকাশক—শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার, এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রচ্ছদে ফুলপাতার ক্ষুদ্রাকার ছবি ও নামাংকন, প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই।

দাম বারো আনা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯২৯।

উৎসর্গ—জয়্‌সু্‌-কে

প্রথম প্রকাশ ১৩৩৯—বৈশাখ

গ্রন্থের অংশবিশেষ পরে নূতনা রাধা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

যার যেথা দেশ

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট—শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য—পাঁচ টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩০-৩২।

উৎসর্গ—শ্রীভবানী ভট্টাচার্য সুহৃদ্বরেষু

প্রথম সংস্করণ ১৩৩৯। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৭। তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫৩। চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬২

গ্রন্থের কথারম্ভে লেখক বলছেন, সত্যাসত্য এপিক নয়। বৃহৎ উপন্যাস।

পুতুল নিয়ে খেলা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট—শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা। নামাংকন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

দাম—তিন টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩০।

উৎসর্গ—শ্রীমনোরঞ্জন রায় সোদরপ্রতিমেষু

প্রথম প্রকাশ ১৩৪০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫১। তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫৬। চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৩

কালের শাসন

প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রচ্ছদে কোন চিত্র নেই, শুধু নামাঙ্কন।

দাম বারো আনা

গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাবলির রচনাস্থল ইউরোপ, জাহাজ ও ভারতবর্ষ।

রচনাকাল ১৯২৯-৩০।

উৎসর্গ—জয়স

প্রথম প্রকাশ ১৩৪০

গ্রন্থের অংশবিশেষ নূতনা রাধা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

অজ্ঞাতবাস

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম ছয় টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩২-৩৩।

উৎসর্গ—শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫২। তৃতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬০। চতুর্থ সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬৫

কলঙ্কবতী

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম ছয় টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩৪।

উৎসর্গ—শ্রীহরিশ্চন্দ্র বড়ালকে।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪১। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫২। তৃতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬০। চতুর্থ সংস্করণ কার্তিক ১৩৬৭

প্রকৃতির পরিহাস

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট—শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম অনুল্লেখিত

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩৩-৩৪।

উৎসর্গ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বয়স্যবরেষু।

প্রথম সংস্করণ ১৩৪১। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩

কামনা পঞ্চবিংশতি

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদে কোন চিত্র নেই, শুধু নামাঙ্কন। নামাঙ্কন শ্রীমতী লীলা রায়ের।

দাম আট আনা

গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাবলির রচনাকাল ১৯২৯-৩০।

উৎসর্গ—শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী কবিকরকমলেষু।

প্রথম প্রকাশ ১৩৪১

গ্রন্থের অংশবিশেষ নূতনা রাধা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

দুঃখমোচন

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম ছয় টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩৫-৩৬।

উৎসর্গ—বীররাঘবনের স্মারক।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৩। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩। তৃতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬০। চতুর্থ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

আমরা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদ—কোন ছবি নেই, শুধু নামাঙ্কন।

দাম—এক টাকা

উৎসর্গ—'চিত্রবহা'র সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমধর্ম্মাকে।

প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৬

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে তারুণ্য বইটি থেকে চারটি প্রবন্ধ নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে ওই প্রবন্ধকটি তারুণ্যকে ফেরত দেবার ও কয়েকটি নতুন লেখা যোগ করার পর আমরা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুস্তক।

এই বইয়ের প্রথমাংশ ১৯৩৬-৩৭ সালের ও দ্বিতীয়াংশ ১৯৪২-৪৫ সালের লেখা।

মর্তের স্বর্গ

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম ছয় টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩৮-৪০।

উৎসর্গ—শ্রীহরিহর মহাপাত্র সুহৃদ্বরেষু।

প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৪৬। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩। তৃতীয় সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২। চতুর্থ সংস্করণ আষাঢ় ১৩৭৪

সত্যাসত্য-র এই খণ্ডের নাম হত মর্ত্যের শর্ত। একবার এক সমালোচক এর উল্লেখ করেন মর্তের স্বর্গ বলে। সেই ভুল লেখক স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন।

জীবনশিল্পী

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পীর নাম অনুল্লেখিত।

দাম পাঁচ সিকা

উৎসর্গ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূজনীয়েষু ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৮।

প্রথম সংস্করণ ১৯৪১। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯

অপসরণ

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম—ছয় টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫১-৫২।

উৎসর্গ—শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীকে।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৯। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩। তৃতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬০। চতুর্থ সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬৩

এই খণ্ডের সঙ্গে সত্যাসত্য উপন্যাসমালা শেষ হল। লেখা শুরু হয় ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে, বহরমপুরে; লেখা শেষ হয় ১৯৪২ সালের ৭ এপ্রিল, বাঁকুড়ায়। বারো বছরের সাধনা প্রকাশিত হয় ছয় খণ্ডে।

উড়কি ধানের মুড়কি

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম ছয় টাকা পঞ্চাশ

উৎসর্গ—শ্রীদিলীপকুমার রায়কে।

প্রথম সংস্করণ ১৯৪২। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৩। চতুর্থ সংস্করণ ১৯৫৫। পঞ্চম সংস্করণ ১৯৬৩! ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫

বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—

'উড়কি ধানের মুড়কি দেব
শাশুড়ি ভুলাতে!'

নূতনা রাধা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদ—লেখকের ভাষায় 'প্রচ্ছদের পরিকল্পনাটি শ্রদ্ধাস্পদ শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের'।

দাম দুই টাকা

এই গ্রন্থটি একটি সংকলন গ্রন্থ। এই সংকলনে আছে প্রথম স্বাক্ষর, রাখী, একটি বসন্ত, কামনা পঞ্চবিংশতি, কালের শাসন, লিপি, নীড়, জার্নাল ও ক্রীড়া: এই কটি গ্রন্থ বা পর্যায়ের সমস্ত বা নির্বাচিত কিছু কবিতা।

উৎসর্গ—স্বতন্ত্র গ্রন্থ বা পর্যায়গুলি বিভিন্ন ব্যক্তিকে উৎসর্গ করা হয়েছিল বলে এই সংকলন গ্রন্থটি আর আলাদা ভাবে কারুকে উৎসর্গ করা হয়নি।

প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯

ইউরোপের চিঠি

প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম ছয় টাকা

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির রচনাকাল ১৩৩৪-৩৭। রচনাস্থল লণ্ডনসহ ইউরোপের নানা স্থান। কোনোটি ট্রেনে বা জাহাজে, কোনোটি কাফেতে।

উৎসর্গ—'মৌচাক' সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার করকমলেষু।

প্রথম প্রকাশ ১৩৫০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬২। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২। চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮২

এই গ্রন্থের রচনাগুলি প্রবন্ধ নয়, চিঠি। লেখা হয়েছিল মৌচাক মাসিকপত্রের পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে। বইয়ে বেশ কিছু ছবি ছিল।

ইশারা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, লেখকের ভাষায়, শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের।

দাম এক টাকা

পুস্তকের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে লেখা।

উৎসর্গ—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী পূজনীয়েষু।

প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৩

দু'কান কাটা

শুধুমাত্র এই নামের গল্প হিসেবে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং পরে মনপবন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত

এবং অবশেষে গল্প নামক সংকলন গ্রন্থের শামিল।

উৎসর্গ—শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে।

প্রকাশকাল ১৩৫০

বিনুর বই

প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম দুই টাকা

উৎসর্গ— শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার-কে।

প্রথম সংস্করণ কার্তিক ১৩৫১। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৯

ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হলেও এটি একটি টানা গোটা রচনা। রচনাকাল চল্লিশের দশক। লেখকের মতে রচনাটি ঠিক কাহিনীমূলক নয়। কাহিনী যদি হয়ে থাকে তবে জীবনের নয়, মনের। কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে নয়।

পাহাড়ী

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য পাঁচ টাকা

রচনাকাল ১৯৩৩-৩৪।

উৎসর্গ—অভয়াশঙ্কর / রাজরাজেশ্বরী / অজয়াশঙ্কর / ব্রজেন্দ্রমোহিনী-কে / বড়দাদা

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৭। তৃতীয় সংস্করণ ১৩৮৬

এই কিশোর উপন্যাসটি অনেকাংশেই আত্মজৈবনিক।

হাসনসখী

শুধুমাত্র এই নামের গল্প হিসেবে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং পরে মনপবন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত

এবং অবশেষে গল্প নামক সংকলন গ্রন্থের শামিল।

উৎসর্গ—শ্রীমননকুমার মৈত্রকে।

প্রকাশকাল ১৩৫২

মনপবন

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত দুটি গল্প ও অগ্রন্থিত পাঁচটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত এই গ্রন্থ পরে গল্প নামক সংকলন গ্রন্থের শামিল।

উৎসর্গ দুটি গল্প শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে, একটি গল্প শ্রীমননকুমার মৈত্রকে, দুটি গল্প শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ও দুটি গল্প শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে।

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩

জীয়নকাটি

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা। অক্ষরবিন্যাস অজয়াশঙ্কর রায়ের।

দাম এক টাকা চার আনা

উৎসর্গ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন, আই.সি.এস, শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫

পুস্তকের রচনাগুলি, লেখকের মতে, সংকট কালে সাহিত্যিকের কর্তব্য কী, এই প্রশ্নের উত্তর—নানাভাবে।

দেশকালপাত্র

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম এক টাকা চার আনা

উৎসর্গ—স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি (তে)।

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫

পুস্তকের রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা। প্রথম রচনাটি (চেনাশোনা) পরে বর্ধিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিশেবে আত্মপ্রকাশ করে।

রাঙা ধানের খৈ

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সপ্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ—প্রভাস সেন।

মূল্য তিন টাকা

উৎসর্গ—আনন্দরূপ ও তৃপ্তি ও তাদের বয়সী সব ছেলেমেয়েদের হাতে দিলুম।

প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫৭। দ্বিতীয় সংস্করণ চৈত্র ১৩৬২। তৃতীয় সংস্করণ চৈত্র ১৩৬৮। চতুর্থ সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮৪

বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—

'হৈ রে বাবুই হৈ
রাঙা ধানের খৈ।'—ছড়া

যৌবনজ্বালা

প্রথমার্ধের (১৯২৯-৩০) দুটি গল্প এবং দ্বিতীয়ার্ধের (১৯৪০-৫০) ছটি গল্প নিয়ে একটি গ্রন্থ হিশেবে প্রকাশিত

এবং পরে গল্প নামক সংকলন-গ্রন্থের শামিল।

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ—শ্রীগোপালদাস মজুমদার করকমলেষু

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৭

না

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম তিন টাকা

রচনাকাল ১৯৫০-৫১।

উৎসর্গ—অমিয় চক্রবর্তী বন্ধুবরেষু।

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৮। দ্বিতীয় মুদ্রণ কার্তিক ১৩৫৯। তৃতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৬৯

লেখকের মতে মনপবন ও যৌবনজ্বালার মতো না-তেও তিনি নিজেকে প্রক্ষেপ করেছেন অংশত। কিন্তু কাহিনী কাহিনীই। চরিত্রগুলিও কাল্পনিক।

প্রত্যয়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য দেড় টাকা

উৎসর্গ—কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব শ্রদ্ধাস্পদেষু

সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ এক ও অভিন্ন।

সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ অহিংস।

৩০শে বৈশাখ ১৩৫৮ — অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮

কন্যা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম সাড়ে তিন টাকা।

রচনাকাল ১৯৫৩

উৎসর্গ—শ্রীমান পুণ্যশ্লোক রায় কল্যাণীয়েষু।

প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৬০। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬১। তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬৯

লেখকের মতে, এই উপন্যাস হল শাশ্বত নারীর অন্বেষণের কাহিনী। 'আমি কাউকে পরামর্শ দেব না সেই পথের পথিক হতে। বরং সতর্ক করব। ধরে নাও যে এ বইটাই একটা warning বা চেতাবনী।'

নতুন করে বাঁচা

প্রকাশক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট শ্রীঅজিত গুপ্তের আঁকা।

মূল্য : এক টাকা বারো আনা

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২।

উৎসর্গ—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম সংস্করণ ১৩৬০

এ বইয়ের একাধিক প্রবন্ধে, লেখকের ভাষায়, নবজীবনের নক্শা আঁকা।

আধুনিকতা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য দুই টাকা

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৯৪১ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লেখা।

উৎসর্গ—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী পূজনীয়াসু।

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩

লেখকের ভাষায়, এই বইটির মূল সুর আধুনিকতা।

আলাপ

প্রকাশক—বেগম উমরতুল আলম, সাহিত্য-নিকেতন, কাজীর দেউড়ী, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদশিল্পী মঈনুল আলম

মূল্য এক টাকা মাত্র

বইটি কারুকে উৎসর্গ করা হয়নি।

প্রথম প্রকাশ ১৩৬০

মাহবুব-উল্ আলম ও অন্নদাশংকর রায়ের মধ্যে যেসব চিঠি চালাচালি হয়েছিল সেই পত্রালাপভিত্তিক পুস্তিকা।

রাতের অতিথি

পত্রিকায় প্রকাশের পর, স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে, কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত (১৯৫৪) ও পরে শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত (১৯৮৬)।

দাম এক টাকা

এই কাব্যনাট্যটি লেখকের জীবনদর্শন বোঝার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

কামিনীকাঞ্চন

আটটি গল্পের একটি সংকলন হিসেবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এবং

পরে কথা নামক সংকলন-গ্রন্থের শামিল।

বইয়ের গল্পগুলি ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে লেখা।

উৎসর্গ—হুমায়ুন কবিরকে।

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪

চতুরালি

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য দেড় টাকা

উৎসর্গ—শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী করকমলে।

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৬২

ভূমিকায় লেখক বলছেন, আমার প্রথম নাটিকা ছাপা হয়েও প্রকাশিত হয়নি। পরে হারিয়ে যায়। নাম ছিল আপদ বিদায়। এটা ১৯২৮ সালের ঘটনা। অবশিষ্ট চারটি নাটিকা মিলে চতুরালি হলো। সূচীপত্র ও রচনা-কাল—দম্পতী (১৯৩৮) / ওলট পালট (১৯৪২)। হাসব না কাঁদব / হাওয়া বদল (১৯৫৪)

সাহিত্যে সংকট

প্রকাশক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম দু'টাকা

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি প্রাথমিক ভাবে ১৯৫২ সালের শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা-মালা রূপে ১৯৫৫ সালে রচিত ও ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বক্তৃতার আকারে প্রদত্ত।

উৎসর্গ—আচার্য যদুনাথ সরকার পূজনীয়েষু।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬২

মনু ও শ্রীমতী (১ম ভাগ)

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা। ভিতরের নামাঙ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

দাম চার টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫৫।

উৎসর্গ—মাতৃস্মৃতি / পিতৃস্মৃতি।

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৩। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৭

গ্রন্থের শুরুতে লেখকের সুদীর্ঘ ও মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত।

কণ্ঠস্বর

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম তিন টাকা

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে লেখা।

উৎসর্গ—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬

লেখকের মতে, শিল্পসৃষ্টি ছাড়া দেশকালের আর-দশটা সমস্যা নিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চে তোলার ফল এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি।

রত্ন ও শ্রীমতী (দ্বিতীয় ভাগ)

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা। ভিতরের নামাঙ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

দাম ছয় টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫৬-৫৭।

উৎসর্গ—মাতৃস্মৃতি / পিতৃস্মৃতি।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৪। দ্বিতীয় প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮

লেখক একসময়ে ধরে নিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় ভাগই শেষভাগ। পরে বারো বছর বাদে তৃতীয় ভাগ লেখা হয়।

ডালিম গাছে মৌ

প্রকাশক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রচ্ছদপটশিল্পী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধ্রুবজ্যোতি সেন।

মূল্য দু টাকা

উৎসর্গ—পারিজাত / তপতী / বন্দনা / প্রণতি / ভারতী / সোমনাথ / গোপাল—জ্যাঠামশাই।

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৫

বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—আতাগাছে তোতাপাখী
ডালিমগাছে মৌ। - ছড়া

রূপের দায়

সাতটি গল্পের একটি সঙ্কলন হিশেবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

এবং পরকথা নামক সংকলন-গ্রন্থের শামিল।

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি ১৯৫৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে লেখা।

উৎসর্গ—শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ (ভাদ্র ১৩৬৫)

জাপানে

প্রকাশক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ ও চিত্রণশিল্পী শ্রীধ্রুবজ্যোতিঃ সেন।

দাম সাত টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫০।

উৎসর্গ—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৬৫। দ্বিতীয় সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

বইটি ১৯৬২-র সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত।

গল্প

প্রকাশক— শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা। অক্ষর বিন্যাস: শ্রীমতী গীতা রায়।

দাম—পাঁচ টাকা

১৯২৯ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত লেখা লেখকের যাবতীয় গল্পের সংকলন এই গ্রন্থটি। এই সংকলনের শামিল হয়েছে প্রকৃতির পরিহাস (১৩৪১), দু' কানকাটা (১৩৫০), হাসনসখী (১৩৫২), মনপবন (১৩৫৩) ও যৌবনজ্বালা (১৩৫৭)—এই ক'টি গ্রন্থ বা পুস্তিকা এবং পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত, ১৩৫৭-য় পূর্বাশায় প্রকাশিত, দূরের মানুষ গল্পটি।

সংকলনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রন্থ বা পুস্তিকাই কারুকে না কারুকে উৎসর্গ করা বলে এই সংকলনটি আলাদা ভাবে আর কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি। শুধু দূরের মানুষ গল্পটি কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ স্মরণে উৎসর্গীকৃত।

প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

অপ্রমাদ

প্রকাশক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য: তিন টাকা

উৎসর্গ—সেজ কাকা ও সেজ কাকিমার শ্রীচরণে

প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

ভূমিকায় লেখক বলছেন, অহিংসার মতো অপ্রমাদ ও প্রাচীন ভারতীয় সাধনার অগ্রগণ্য সূত্র। প্রবন্ধগুলি মূলত পঞ্চাশের দশকে লেখা।

সুখ

প্রকাশক—প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন ডি. এম. লাইব্রেরী।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক ভস্তক—৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত।

দাম পঁচিশ টাকা

এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৩৬৭।

উৎসর্গ—অমিতাভ ও জয়া রায় যুক্ত করকমলেষু।

প্রথম প্রকাশ ১৯৬১। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯২

দেখা

প্রকাশক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য তিন টাকা

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির রচনাকাল ১৯৫৯-৬০।

উৎসর্গ—শ্রীকালিদাস রায় / শ্রী দুর্গাদাস রায় করকমলেষু।

প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় দেখাশোনা (১৯৮৮) নামে।

রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য পাঁচ টাকা

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে এবং মূলত রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে লেখা।

উৎসর্গ—আচার্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৯

প্রবন্ধ

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য বত্রিশ টাকা

তারুণ্য (১৯২৮), আমরা (৩৭), জীবনশিল্পী (৪১), ইশারা (৪৩), বিনুর বই ১ম পর্ব (৪৪), জীয়নকাটি (৪৯), দেশকালপাত্র (৪৯), প্রত্যয় (৫১), আধুনিকতা (৫৩) ও কণ্ঠস্বর (৫৬) এই কটি গ্রন্থ একত্র করে এবং কিছু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংযোজিত করে এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে প্রবন্ধগুলিকে সাজানো হয়েছে বিষয়ভিত্তিক ভাবে।

উৎসর্গ—অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলি প্রতিটিই কারুকে-না কারুকে উৎসর্গ করা বলে এই সংকলনটি আলাদা ভাবে আর কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি।

প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪

ফেরা

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা

উৎসর্গ—ডক্টর সরোজকুমার দাস ও স্বর্গীয়া তটিনী দাস 'পথে প্রবাসে'র সেসব দিনের স্মারক এই 'ফেরা'।

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৭২

খোলা মন ও খোলা দরজা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম আট টাকা

উৎসর্গ—আবু সয়ীদ আইয়ুব শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৭৪

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫। এর অনেকগুলিই পত্র হিসেবে রচিত ও প্রেরিত—লেখকের পত্রসাহিত্যের বিশিষ্ট উদাহরণ।

বিশল্যকরণী

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
মূল্য পাঁচ টাকা
রচনাকাল ১৯৬৬। উপসংহারটি ১৯৬৭-তে রচিত।
উৎসর্গ—শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।
প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৭৪

আর্ট

প্রকাশক—প্রথম সংস্করণ ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে ও দ্বিতীয় সংস্করণ পুনশ্চ (১১৮ এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ১০) থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা পূর্ণেন্দু পত্রী।
দাম কুড়ি টাকা
১৯৪৪ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত পঁচিশ বছর সময় ধরে বইটি লেখা। এর মধ্যে প্রথম পর্যায় ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ও দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে রচিত।
উৎসর্গ—বুদ্ধদেব বসু প্রিয়বরেষু।
প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৯
গ্রন্থের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

তৃষ্ণার জল

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬
প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
দাম ছয় টাকা
১৯৬৭ সনে রচিত। ১৯৬৮ তে পুনর্লিখিত।
উৎসর্গ—ডক্টর বিবেক সেনগুপ্ত / শ্রীমতী অঞ্জলি সেনগুপ্ত করকমলে।
প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৫

গান্ধী

প্রকাশক—শমিত সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
মূল্য ষোলো টাকা

মূলগ্রন্থের রচনাকাল ১৯৬৮-৬৯।

উৎসর্গ—শ্রীমতী লীলা রায় প্রিয়তমাসু।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৬। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৯০

গান্ধীজীর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে এ বই প্রকাশিত হয়।

দিশা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম আট টাকা

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রকম লেখা মিলিয়ে এই সঙ্কলন গ্রন্থ।

উৎসর্গ—শ্রীকরুণাকুমার হাজরা সুহৃদ্বরেষু।

প্রথম প্রকাশ মাঘ, ১৩৭৭

প্রারম্ভে লেখকের নিবেদন, ইনটেলেকচুয়াল বলে গণ্য হবার বিপত্তি এই যে প্রয়োজনের সময় দেশের লোককে দিশা দেখাতে হয়। জ্ঞান বুদ্ধির আলোয়। এটা একপ্রকার বাধ্যবাধকতা।

প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার

প্রকাশক—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, মন্ত্রীনিবাস, রাজভবন, কলিকাতা-১

প্রচ্ছদ শ্রীসুধাময় দাশগুপ্ত।

মূল্য পঁচিশ পয়সা

পুস্তিকাটি কারুকে উৎসর্গ করা হয়নি।

রচনাকাল ১৯৭০

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭০

এই পুস্তিকার প্রথম অনুচ্ছেদ আরো অনেকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে দৈনিকে ছাপতে দেওয়া হয়েছিল।

কথা

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম পঁচিশ টাকা

১৯৫০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত লেখা লেখকের যাবতীয় গল্পের সংকলন

এই গ্রন্থটি। এই সংকলনের শামিল হয়েছে কামিনীকাঞ্চন (১৯৫৪) ও রূপের দায় (১৯৫৮) এই দু'টি গ্রন্থ এবং মীন পিয়াসী, বর ও জন্মদিনে এই তিনটি পর্যায় ভুক্ত যাবতীয় গল্প।

সংকলনের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ দুটি দুই ব্যক্তিকে উৎসর্গীকৃত। আর পর্যায় তিনটি যথাক্রমে রাজেন্দ্রলাল দত্তের স্মৃতির উদ্দেশে, কিরণ বসুর স্মৃতির উদ্দেশে ও গুরুদয়াল মল্লিকের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা।

প্রথম প্রকাশ ১৯৭১

রত্ন ও শ্রীমতী (তৃতীয় ভাগ)

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা। ভিতরের নামাঙ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

দাম আট টাকা

গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৭০-৭১।

উৎসর্গ—মাতৃস্মৃতি / পিতৃস্মৃতি।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৮

এই উপন্যাসমালার তৃতীয় ভাগই শেষভাগ। লেখকের ভাষায়, যত কথা বলবার ছিল তত কথা বলা হলো না। কিন্তু কাহিনী যথাস্থানে সমাপ্ত হয়েছে।

শুভোদয়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম—সাড়ে সাত টাকা

উৎসর্গ—বাংলাদেশে আমার সমানধর্মা আবুল ফজল বন্ধুবরেষু।

লেখক ভূমিকায় বলছেন, এই গ্রন্থটি এক হিসাবে একটি স্মারক গ্রন্থ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক।

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭৯

শালি ধানের চিঁড়ে

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম তিন টাকা

উৎসর্গ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭৯

বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—জলপান করতে দিল
শালি ধানের চিঁড়ে। —ছড়া

আতা গাছে তোতা

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ছবি এঁকেছেন প্রদীপ দাশ।

মূল্য চার টাকা

উৎসর্গ— চন্দ্রহাস ও শতরূপা / তোমাদের জন্যে / দাদু।

প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮১

বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—আতা গাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মৌ।
—ছড়া

বাংলার রেনেসাঁস

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য দশ টাকা

গ্রন্থের মূল প্রবন্ধটি ১৯৬৭ সালের লীলা বক্তৃতাবলি রূপে ১৯৭১ সালে প্রস্তুত ও ১৯৭৩ সালে প্রবন্ধের আকার প্রাপ্ত। অন্য প্রবন্ধগুলি ১৯৭০ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে লেখা।

উৎসর্গ—শ্রীমান্ সুরজিত দাশগুপ্ত স্নেহাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৮১। দ্বিতীয় প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৮৮

চেনাশোনা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য ছয় টাকা

গ্রন্থের মূল প্রবন্ধটি ১৯৪২-৪৩ সালে লেখা। পরে এর পরবর্তী অধ্যায়গুলি লেখা হয় ও একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে 'চেনাশোনা' আত্মপ্রকাশ করে।

উৎসর্গ—চিত্রকাম রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে।

প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৮২

শিক্ষার সংকট

প্রকাশক—নিতাই মজুমদার, শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মূল্য আট টাকা

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে লেখা।

উৎসর্গ—শ্রীসতীকান্ত গুহ শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৮৩

লেখকের সংকট-পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ এটি। প্রথম গ্রন্থ সাহিত্যে সংকট (১৯৫৫)।

কাঁদো, প্রিয় দেশ

প্রকাশক—নিতাই মজুমদার, শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ—ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দাম আট টাকা

উৎসর্গ—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে।

প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৩

বাংলাদেশ বিষয়ক ট্রিলজির তৃতীয় ও শেষ গ্রন্থ এটি। প্রথম দুটি হল শুভোদয় ও বাংলাদেশে।

প্রেম ও বন্ধুতা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য ছয় টাকা

নামপ্রবন্ধটি ১৯৭১-এর। অন্য প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা।

উৎসর্গ—শ্রীহরিশ্চন্দ্র বড়াল সুরসিকেষু রসস্য নিবেদনম।

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮৩

হৈ রে বাবুই হৈ

প্রকাশক—দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ - অহিভূষণ মালিক।

মূল্য পনেরো টাকা

ছড়াগুলি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে লেখা।

উৎসর্গ—ঋতুপর্ণা বর্ণিনী আদিত্যবর্ণ শরণ্য : তোমাদের দাদু।

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৭। তৃতীয় মুদ্রণ অগস্ট ১৯৭৯। চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৮১। পঞ্চম মুদ্রণ মে ১৯৮৮। ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

সূচনায় এই উদ্ধৃতি আছে—হৈ রে বাবুই হৈ / রাঙা ধানের খৈ।

রাঙা অতিথি

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম সাত টাকা

উৎসর্গ—শিবরাম চক্রবর্তী প্রিয়বরেষু

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮৫

ভূমিকায় লেখক বলছেন, এই উপন্যাসে একটা সূক্ষ্ম পয়েন্ট আছে।

চক্রবাল

প্রকাশক শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য আট টাকা

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে লেখা। সেগুলিকে দু ভাগে ভাগ করা যায়—জীবনীমূলক ও সাহিত্যিক।

উৎসর্গ - বিষ্ণু দে প্রিয়বরেষু।

প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮

আই. সি. এস.

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই।

দাম সাত টাকা

উৎসর্গ—কৃপাসিন্ধু মিশ্র আই সি এস স্মরণে।

প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৫

ভূমিকায় গ্রন্থটি রচনার পটভূমিকা বর্ণিত হয়েছে।

লালন ও তাঁর গান

প্রকাশক—রবীন বল, শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মূল্য দশ টাকা

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা।

উৎসর্গ—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বন্ধুবরেষু।

প্রথম প্রকাশ বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৮৫। দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুআরী, ১৩৮৭

[পরবর্তী সংস্করণে লালন ফকির ও তাঁর গান নামে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ থেকে চৈত্র ১৩৯৮এ প্রকাশিত

দাম কুড়ি টাকা

প্রচ্ছদপট অঙ্কন গৌতম রায়]

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

প্রকাশক—শীলা ভট্টাচার্য, আশা প্রকাশনী, ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই

দাম : সাত টাকা

উৎসর্গ—শ্রীপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় প্রীতিভাজনেষু।

প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ১৯৭৮

প্রবন্ধগুলির বেশির ভাগই এমারজেন্সীর সময় লেখা।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম. লাইব্রেরী, ৪২নং বিধান সরণী, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম দশ টাকা

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি মূলত সত্তরের দশকে লেখা।

উৎসর্গ—গৌরকিশোর ঘোষ কল্যাণীয়েষু।

প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫

বাংলাদেশে

প্রকাশক—বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী।

দাম বার টাকা

উৎসর্গ—'মোমিনের জবানবন্দী' প্রণেতা জনাব মাহবুব-উল আলম বন্ধুবরেষু।

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮৬

গ্রন্থটি অংশত ভ্রমণকাহিনী, অংশত প্রবন্ধ।

শুভোদয়, বাংলাদেশে ও কাঁদো, প্রিয় দেশ এই তিনখানি গ্রন্থ নিয়ে বাংলাদেশ বিষয়ক একটি ট্রিলজি।

সাতকাহন

প্রকাশক—বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী।

দাম দশ টাকা

উৎসর্গ—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী প্রীতিভাজনেষু।

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮৬

লেখকের মতে, বইখানা তাঁর জীবনের খাপছাড়া কড়চার মতো একরাশ লেখার সমষ্টি। নিজের কথাই সাতকাহন। তবে তার সঙ্গে আছে অপর কয়েকটি বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা।

স্বাধীনতার পূর্বাভাষ

প্রকাশক—রবীন্দ্রনাথ বল, শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মূল্য পনের টাকা মাত্র

মূল গ্রন্থটি ১৯৭৮ সনে ও সূত্রপাত অংশটি ১৯৭৯ সনে লেখা।

উৎসর্গ—আচার্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৮৬

[পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির নাম হয় যুক্তবঙ্গের স্মৃতি]

কাহিনী

প্রকাশক—বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী।

দাম কুড়ি টাকা

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৭১-৭৬।

উৎসর্গ—শ্রীমতী গীতা রায় বড়ো বউমা কল্যাণীয়াসু।

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮৭

ভূমিকায় লেখক বলছেন, সম্ভবত এই আমার শেষ গল্প। এখানে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির পর মাত্র আর একটি গল্পই তিনি লিখেছেন —নীলনয়নীর উপাখ্যান (১৯৯৪)।

টলস্টয়

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা৬

প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীমতী লীলা রায়।

মূল্য বার টাকা মাত্র

টলস্টয়ের সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ একত্র করে বইখানি প্রকাশিত। সঙ্গে কিছু পুরোনো লেখাও আছে।

উৎসর্গ—অশোককুমার ও তৃপ্তি রায় দুজনের হাতে।

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮৭

বইয়ের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে লেখকের প্রথম-প্রকাশিত লেখা (টলস্টয়ের উপকথার অনুবাদ) তিনটি প্রশ্ন (১৯২০)।

রাঙা মাথায় চিরুনি

প্রকাশক—শমিত সরকার, এম সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ মনোজ বিশ্বাস।

মূল্য : পাঁচ টাকা

গ্রন্থটি কাকেও উৎসর্গ করা হয়নি।

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮৭

হট্টমালার দেশে

প্রকাশক—রবীন বল, শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও চিত্রশিল্পী—শ্রীদেবাশিস দেব।

মূল্য পাঁচ টাকা

গ্রন্থটি কারুকে উৎসর্গ করা হয়নি।

প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮০

বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—খোকন মণির বিয়ে দেব
হটুমালার দেশে। —ছড়া

ক্ষীর নদীর কূলে

প্রকাশক—শমিত সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ মনোজ বিশ্বাস

মূল্য দশ টাকা

উৎসর্গ—শ্রীমতী এষা রায় ছোট বউমা কল্যাণীয়াসু

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৮৭। দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ়, ১৩৯০

বইয়ে এই কথামুখটি ছিল—খোকা গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে। —ছড়া

জাতিবৈর

প্রকাশক—বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী

মূল্য দশ টাকা

উৎসর্গ—স্বর্গীয় বিমলাপ্রসাদ চলিহা স্মরণে।

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭

এই গ্রন্থ অসম, উৎকল ও বিহার প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধগুলির এক সংকলন।

শিক্ষার ভবিষ্যৎ

প্রকাশক—আশিসগোপাল মজুমদার, ডি. এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ বলাই পাল।

মূল্য বারো টাকা

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে লেখা।

উৎসর্গ—শ্রীমতী কমল দাশ / শ্রীদেবেশ দাশ যুক্তকরকমলেষু।

প্রথম সংস্করণ মহালয়া, আশ্বিন, ১৩৮৮

গ্রন্থে লেখকের ভূমিকা ছাড়াও প্রকাশকের তরফে একটি বক্তব্য ছিল যে, শিক্ষা বিতর্কে লেখকের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যপ্রসূত প্রবন্ধাদির সংকলন এই গ্রন্থ।

সংস্কৃতির বিবর্তন

প্রকাশক—অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ Stasys Krasauskas

দাম কুড়ি টাকা

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি একটানা লেখা হয়নি, সেগুলির মধ্যে রচনার পৌর্বাপর্যও রাখা হয়নি। একটি প্রবন্ধ (সংস্কৃতির সন্ধিক্ষণ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা। তখন তার নাম ছিল সাহিত্যে সংকট : পুনশ্চ।

উৎসর্গ—শিবনারায়ণ রায় প্রীতিভাজনেষু।

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৪। দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৯

শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রকাশক—অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও লেখকের আলোকচিত্র রবি দত্ত।

দাম পঁয়ষট্টি টাকা

উৎসর্গ—ছোট বোন শ্রীমতী ব্রজেন্দ্রমোহিনী রায় (শান্তি) কল্যাণীয়াসু : বড়দা।

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৪। ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ১৯৯৪

গ্রন্থে লেখকের কোনো ভূমিকা ছিল না, কিন্তু পরিশিষ্টে ধীমান দাশগুপ্তকৃত অনুকথন সংযোজিত হয়েছে।

ক্রান্তদর্শী (১ম পর্ব)

প্রকাশক – শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট প্রণবেশ মাইতি।

মূল্য ৩০ টাকা

এই পর্বের রচনাকাল ১৯৮০-৮১। লেখা শেষ হয় ১৯৮১-র ৩০ নভেম্বর।

উৎসর্গ—শতরূপা রায় স্মরণে।

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৯

ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, এর নাম রাখা উচিত ছিল 'পুনর্নবীকরণ'। ইংরেজীতে যাকে বলে 'রিনিউয়াল'। কিন্তু উপন্যাসের নাম 'পুনর্নবীকরণ' আমার অপছন্দ। আমার পরম প্রীতিভাজন বন্ধু স্বামী নচিকেতসানন্দ আমাকে বলেন 'ক্রান্তদর্শী' নাম রাখতে।

সংহতির সংকট

প্রকাশক—শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যালোক, ৩২।৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন।

দাম কুড়ি টাকা

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে লেখা।

উৎসর্গ—ডক্টর অম্লান দত্ত প্রীতিভাজনেষু।

প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৪

লেখকের সংকট-পর্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ এটি। অন্য দুটি গ্রন্থ সাহিত্যে সংকট (১৯৫৫) ও শিক্ষার সংকট (১৯৭৬)।

কিশোর সঞ্চয়ন

প্রকাশক—উত্তম চৌধুরী, শ্যামলী প্রকাশনী, ১৩৯ বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯

প্রচ্ছদ প্রণবেশ মাইতি।

দাম বারো টাকা

উৎসর্গ—শ্রীমান চন্দ্রহাস রায় কল্যাণীয়েষু।

প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি, ১৯৮৪

বইটি কিশোরদের জন্য রচিত লেখকের গল্প ও বড় গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-কাহিনী এবং ছড়া ও ছড়ানাটিকার এক সংকলন।

[বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ কিশোর সাহিত্য সমগ্র (১ম খণ্ড) নামে মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত (১৯৯৫)। সংকলক : ধীমান দাশগুপ্ত।]

ছড়া সমগ্র

প্রকাশক—অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ প্রণবেশ মাইতি।

লেখকের আলোকচিত্র রবি দত্ত।

দাম সত্তর টাকা

লেখকের ছোটদের ও বড়োদের সমস্ত ছড়াগ্রন্থ এবং অগ্রন্থিত ছড়া একত্র করে এই সংকলন।

উৎসর্গ—'খুকুমণির ছড়া'র নাম না জানা ছড়াকারদের উদ্দেশে।

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৮৫। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৯৩

ক্রান্তদর্শী (২য় পর্ব)

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার, ডি এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট প্রণবেশ মাইতি।

মূল্য ৩০ টাকা

এই পর্বের রচনাকাল ১৯৮২-৮৩। লেখা শেষ হয় ১৯৮৩ র ১১ এপ্রিল।

উৎসর্গ – স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী স্মরণে।

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯১

ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, এটা ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। ইতিহাসের পটভূমিকায় বিভিন্ন চরিত্রের উপাখ্যান তথা জীবনদর্শন।

সিংহাবলোকন

প্রকাশক—শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য।

দাম কুড়ি টাকা

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির রচনা ও প্রকাশ কাল ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪।

উৎসর্গ – ভবানী মুখোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু।

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯১ (আগস্ট ১৯৮৪)

গ্রন্থপ্রকাশের বছর কয়েক আগে লেখা একটি বিবৃতি এই নিবন্ধসংগ্রহের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত।

ক্রান্তদর্শী (৩য় পর্ব)

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণি, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট প্রণবেশ মাইতি।

মূল্য ৩০ টাকা

এই পর্বের রচনাকাল ১৯৮৩-৮৪। লেখা শেষ হয় ১৯৮৪-র ২৭ জুলাই।

উৎসর্গ—শ্রীঅরুণকুমার দত্ত করকমলেষু।

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৯২

ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, কেউ যেন না মনে করেন যে আমি উপন্যাসের ছলে ইতিহাস লিখতে বসেছি। ইতিহাস আরো বেশী জায়গার দাবী রাখে।

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ

প্রকাশক—শ্রীমতী বিদিশা মুখোপাধ্যায়, নবার্ক, ডি সি ৯।৪ শাস্ত্রী-বাগান, পোঃ দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৭০০০৫৯

প্রচ্ছদ শ্রীঅপরূপ উকিল।

মূল্য চল্লিশ টাকা

উৎসর্গ—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী সুচরিতাসু।

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

[দ্বিতীয় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ বাণীশিল্প থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ য়ে প্রকাশিত।

দাম পঁচাত্তর টাকা

প্রচ্ছদ প্রণবেশ মাইতি।

লেখকের আলোকচিত্র রবি দত্ত।

অনুকথন ধীমান দাশগুপ্ত।]

শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রকাশক—অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ প্রণবেশ মাইতি।

দাম কুড়ি টাকা

উৎসর্গ—লীলাকে।

প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৯৩

ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, শ্রেষ্ঠ কবিতা যাকে বলা হচ্ছে আসলে তা নির্বাচিত কবিতা। বেশীর ভাগ স্বনির্বাচিত। কতক শ্রীধীমান দাশগুপ্তের নির্বাচিত।

ভূমিকার শেষে এই উদ্ধৃতি আছে : আমার কবিতা কোকিলের কুহুতান। বারবার বলি বলার সুখে কেবলি / সার তার শুধু কোকিলারে আহ্বান।

ক্রান্তদর্শী (৪র্থ পর্ব)

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট প্রণবেশ মাইতি।

মূল্য ৩০ টাকা

এই পর্বের রচনাকাল ১৯৮৪-৮৫। উপন্যাস শেষ হয় ১৯৮৫-র ১৩ই জুলাই।

উৎসর্গ—স্বর্গীয় নির্মলকুমার বসু স্মরণে।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৩

ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, ক্রান্তদর্শী শেষ হলো। এ বই কিন্তু আমার পরিকল্পিত রিনিউয়াল বা পুনর্নবায়ন নয়।

নতুন প্রবন্ধ

প্রকাশক—উত্তম চৌধুরী, শ্যামলী প্রকাশনী, ১৩৯ বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদ ধীমান দাশগুপ্ত।

দাম ষোলো টাকা

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে লেখা।

উৎসর্গ—শ্রীচিন্তামণি কর করকমলেষু।

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিকে সমাজ-রাজনীতি, জীবনস্মৃতি ও শিল্প-সাহিত্য—এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

দেখাশোনা

প্রকাশক—এস এন. রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট অঙ্কন—সুব্রত চৌধুরী।

দাম—ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ—কালিদাস রায় / দুর্গাদাস রায় স্মরণে।

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৫

ভূমিকায় লেখক বলছেন, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত দেখা-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ যোগবিয়োগের ফলে আর দেখা রইল না, হয়ে গেল দেখাশোনা।

বিন্নি ধানের খই

প্রকাশক—রবীন বল, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদও অলংকরণ শিল্পীর নাম অনুল্লেখিত। [প্রচ্ছদশিল্পী সম্ভবত দেবাশিস দেব]

দাম দশ টাকা

উৎসর্গ—শতরূপা (মুনমুন) স্মরণেঃ দাদু।

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯

এই বইয়ের প্রায় অর্ধেক ছড়া পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ছড়া সমগ্র সংকলনের প্রথম সংস্করণের সামিল হয়। বাকি ছড়াগুলি পরবর্তী কালের রচনা।

স্রোতের দীয়া

প্রকাশক—শ্রীবংশীধর সিংহ, প্রত্যয় প্রকাশনী, ৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ অমল দাশগুপ্ত।

মূল্য—তিরিশ টাকা

উৎসর্গ—নিমাই চট্টোপাধ্যায় কল্যাণীয়েষু।

প্রথম প্রকাশ মহালয়া, ১৩৯৬

বইটি বিভিন্ন নিবন্ধ, চিঠি, ভাষণ ও সাক্ষাৎকারের এক সংকলন।

বইয়ের নামটি, লেখকের ভাষায়, গঙ্গারাম বাউলের গান থেকে পাওয়া।

এই সময়

প্রকাশক—দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী।

মূল্য পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ—অধ্যাপক রেজাউল করীম ডি. লিট্. শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

ভূমিকায় লেখক বলছেন, ডিকেনস 'A Tale of Two Cities'-এর শুরুতে বলেছেন, 'It was the best of times. It was the worst of times'. সেই সময় সম্পর্কে তাঁর উক্তি আমাদের এই সময় সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই সময়ও কি সব চেয়ে ভালো সময় নয়? সব চেয়ে খারাপ সময় নয়?

যুক্তবঙ্গের স্মৃতি

[দ্বিতীয় সংস্করণে স্বাধীনতার পূর্বাভাষ গ্রন্থটির নামান্তর]

প্রকাশক—এস. এন. রায়, মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ অংকন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস।

দাম পঁচিশ টাকা

গ্রন্থে পরিশিষ্ট রূপে সংযোজিত লেখাটির রচনাকাল ১৯৯০।

উৎসর্গ—আচার্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে।

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯৭

সন্ধিক্ষণ

প্রকাশক—দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী।

মূল্য পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ—শ্রীমতী লীলা মজুমদার করকমলেষু।

প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৯৮

গ্রন্থে প্রবন্ধ আছে পূর্ব ইউরোপ, চীন, শ্রীলংকা, ভারত ও যুক্তবঙ্গ সম্বন্ধে। আছে স্মৃতিচারণ ও সাক্ষাৎকারও। প্রবন্ধগুলি ১৯৮৯-৯০ সালে লেখা। গ্রন্থটি ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত।

কলকাতার পাঁচালী

প্রকাশক—শিশির ভট্টাচার্য, প্রকাশক প্রকাশনা সংস্থা, ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পীর নাম অনুল্লেখিত।

দাম ছয় টাকা

পুস্তিকাটি কারুকে উৎসর্গ করা হয়নি।

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ১৯৯২

পুস্তিকাটি লেখকের কলকাতা বিষয়ক ছড়া ও কবিতার সংকলন।

যেন ভুলে না যাই

প্রকাশক—শমিত সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদশিল্পীর নাম অনুল্লেখিত।

মূল্য চল্লিশ টাকা

উৎসর্গ—সুপ্রিয় সরকার কল্যাণীয়েষু।

প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

গ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত বিবিধ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ভাষণ, চিঠিপত্র ও সাক্ষাৎকারের এক সংকলন।

বিনুর বই (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একত্র)

প্রকাশক—অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ লীলা রায় ও প্রণবেশ মাইতি।

দাম ষাট টাকা

বইয়ের প্রথম পর্বের রচনাকাল চল্লিশের দশক ও দ্বিতীয় পর্বের রচনাকাল নব্বইয়ের দশক।

উৎসর্গ—দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার স্মরণে।

প্রথম পর্বের প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের একত্র প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৩

অখণ্ড সংস্করণে কথামুখ হিসেবে বিনু (১৯৪০-৪১) এবং পরিশিষ্ট হিসেবে শরৎচন্দ্র : বিনুর অ্যাডভেঞ্চার (১৯৩৮-৪২) ও রবীন্দ্রনাথ : বিনুর সাক্ষ্য (১৯৪১) সংযোজিত হয়েছে।

যাদু এ তো বড় রঙ্গ

প্রকাশক—শিশির ভট্টাচার্য, সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড, ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী সমীর দাশগুপ্ত।

দাম পনের টাকা

উৎসর্গ—দাউদ হায়দার কল্যাণীয়েষু [উৎসর্গপত্রে একটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে]।

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ১৯৯৪

এই বইয়ের বেশিরভাগ ছড়া পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ছড়া সমগ্র সংকলনের প্রথম সংস্করণের সামিল হয়। বাকি ছড়াগুলি পরবর্তী কালের রচনা।

সাত ভাই চম্পা

প্রকাশক—অবনীন্দ্রনাথ বেরা, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ প্রণবেশ মাইতি।

দাম কুড়ি টাকা

উৎসর্গ—শ্রীমান ধীমান ও শ্রীমতী পুতুল দাশগুপ্তকে।

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪

বইটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে ছোটদের ছড়া, দ্বিতীয় ভাগে বড়োদের ছড়া। বইটি একই সঙ্গে ছড়া সমগ্র সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণের সামিল হয় ও পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে।

সংকলক: ধীমান দাশগুপ্ত

নির্বাচিত রচনা

[রচনাংশ সম্পাদক কর্তৃক নির্বাচিত]

সত্যাসত্য (ষষ্ঠ খণ্ড) : অপসরণ

৪

বাদল জানত না যে তার বাবা তার অসুখের খবর পেয়ে রওনা হয়েছেন। যেদিন শুনল তিনি এডেন থেকে তার করেছেন সেদিন কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। সুধীকে ধরে বসল, "এর মানে কী, সুধীদা ?"

"মানে আবার কী! তোকে দেখতে আসছেন।"

"দেখতে, না নিতে ?"

"সে কথা পরে।"

"আমার কিন্তু আশঙ্কা হয়, তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন।"

"না রে! ধরে নিয়ে যাবেন কেন ? ডাক্তারের পরামর্শ শুনে যা হয় করবেন।"

বাদল সেদিন সমস্তক্ষণ উন্মনা হয়ে রইল। পরের দিন তার প্রথম কথা, "বাবা কত দূরে ?"

"বোধ হয় লোহিত সাগরে।"

"এর মানে কী, বলতে পারো, সুধীদা ? বল, বল, লুকিয়ে রেখো না।" বাদল আব্দার ধরল।

"মানে কী! বাপ কি ছেলেকে দেখতে আসেন না ? আমি কেন জেরার্ড'স্ ক্রস থেকে ছুটে এসেছি ?"

"আমার কিন্তু আশঙ্কা হয়, তিনি আমাকে না নিয়ে ফিরবেন না।"

বাদল তার বাবাকে জুজুর মতো ডরাত। তিনিই তার ডিক্‌টেটর কম্‌প্লেক্‌সের মূলে। ছোটবেলা থেকেই তিনি তাকে এমন ভাবে শাসন করেছেন যে শাসনের আড়ালে তাঁর আন্তরিক স্নেহপ্রবণতা ঢাকা পড়ে গেছে। তিনি যে ছেলেকে মারধর করতেন তা নয়। বকতেন, বললেও বেশি বলা হয়। ছেলের পিছনে খরচ করতেন দেদার, তার কোনো সাধ অপূর্ণ রাখতেন না। অমন লাইব্রেরী ক'জনের আছে ? কিন্তু সব সময় তাঁর মনে এই এক চিন্তা—আমার ছেলে আমার মতো হবে, আমার মতে চলবে। ছেলে

যে তার নিজের মতো হবে বা নিজের পথে চলবে এটা তিনি বরদাস্ত করা দূরে থাক, কল্পনাই করতেন না। অথচ বাদল ঠিক ওই অধিকারটি দাবী করে। নিজের মতো হওয়াই তার আদিম দাবী, মধ্যম দাবী, অন্তিম দাবী। বাদল চায় বাদল হবার লিবার্টি। রায়বাহাদুর স্বরাজ মঞ্জুর করবার পাত্র নন, প্রাদেশিক অটোনমি দিয়ে মনে করেন খুব দিয়েছেন। বাদলও নাছোড়বান্দা। বিলেতে পালিয়ে এসেছে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে। আই সি এস'এর আশা দেখিয়ে।

যেদিন পোর্ট সৈয়দ থেকে তার এলো সেদিন বাদল সন্ত্রস্ত হয়ে সুধীকে বলল, "যদি ধরে নিয়ে যান?"

"অত ভাবছিস কেন, বাদল? যদি ধরে নিয়ে যানই তবে কিছু দিন দেশে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধা কিসের?"

"না, সুধীদা। তুমি বুঝবে না। গেলে ফিরে আসা দুর্ঘট। বাবা আমার জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন, জোর করে—ঐ যে বাঙালীদের কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপনে থাকে, settled in life—তাই করাবেন। তার মানে ডেপুটি কি সাব ডেপুটি।"

"বেশ তো! ডেপুটি সাবডেপুটিরা কি মানুষ নন। তোর যদি মন না লাগে ইস্তফা দিতে কতক্ষণ। তিনি কি তোকে জোর করে চিরকাল চাকরি করাতে পারেন?"

"অসম্ভব।" বাদল ক্রোধে ক্ষোভে নিরাশায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বিংশ শতাব্দীর বাদল আমি, আমার পক্ষে আই সি এস'এর চাকরিই যথেষ্ট অধঃপতন। তাও নয়, ডেপুটিগিরি। আমায় রক্ষা কর, সুধীদা।"

সুধী তাকে শান্ত হতে বলল। তার যদি রুচি না থাকে তবে তার বাবা কি তাকে জোর করে চাকরিতে বহাল করতে পারবেন, তিনি কি চাকরির মালিক?

"তুমি কি জানো না, সুধীদা, বাবার কী রকম প্রভাব! তিনি চেষ্টা করলেই আমার বহালের হুকুম আসবে, কিন্তু তার চেয়ে ফাঁসির হুকুম ভালো। বিংশ শতাব্দীর—"

"ছি বাদল, অতটা অহঙ্কার শোভা পায় না। তোর অহমিকাই তোর বৈরী। এই যে তুই অসুখে ভুগছিস এর গোড়ায় রয়েছে বিশ্বের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেওয়া। আমি তো মনে করি ইংলণ্ডেই হোক আর ভারতবর্ষেই হোক, ছোট্ট একটি স্কুলের মাস্টারি করাই তোর প্রকৃষ্ট জীবিকা। ওর সংকীর্ণ সীমাই তোর যথার্থ বিশ্ব।"

বাদল বিমূঢ় হয়ে সুধীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। তার মতো উচ্চাভিলাষী কিনা ছোট্ট একটি স্কুলের মাস্টার হয়ে জীবন কাটাবে। তবু

যদি কোনো দিন পার্লামেন্টের মেম্বর ও গবর্ণমেন্টের শিক্ষাসচিব হবার ভরসা থাকত!

"সত্যি, বাদল, সীমা অতিক্রম করে কেউ সার্থক হয় না। ব্যর্থই হয়। ছোট্ট একটি পত্রিকার সম্পাদক হতে পারিস, যদি লিখে তৃপ্তি পাস।"

"তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ যে আমি একজন ব্যারিস্টার," বাদল যোগ করল, "হতে পারি।"

"ব্যারিস্টারিও কিছু মন্দ নয়, যদি মফঃস্বলে প্র্যাকটিস করে সন্তুষ্ট থাকিস। চল, ভাগলপুরে বসবি।"

বাদলের মুখভাব দেখে সুধী নিরস্ত হলো।

বাস্তবিক জীবিকার মানদণ্ডে মাপলে বাদলের ভবিষ্যৎ কী! শরীর সারলেও দেশলাই বেচা চলবে না, তেমন কিছু করা তার পক্ষে প্রাণদণ্ড। বিলিতী ডিগ্রী নেই, প্রোফেসারি জুটবে না। তা হলে বাকি থাকে সম্পাদক, মাস্টারি ও ডেপুটিগিরি, যদি না আসছে বছর পাস করে ব্যারিস্টারি। আই সি এস'এর বয়স নেই, বোধ হয় ডেপুটিগিরির বয়সও উত্তীর্ণপ্রায়। বাদলের জন্যে সুধী উদ্বিগ্ন হয়। High thinking বেশ ভালো কথা, কিন্তু plain livingএরও একটা ব্যবস্থা চাই।

মহিমচন্দ্র ওরফে মহিম খুড়ো আসছেন শুনে উজ্জয়িনী একটুও বিচলিত হলো না। বরং একটু উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকল। এই মানুষটিকে একদা সে শ্বশুর না বলে অসুর বলত, ভয় করত অসুরেরই মতো। কিন্তু এখন আর সে ভীত নয়, তার মনে হয় সে তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে, দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, "এই যে খুড়ো কেমন, ভালো আছেন তো?"

"বাদল," সে বলল বাদলকে বিমর্ষ দেখে, "তুমি অমন মুষড়ে পড়ছ কেন? নিয়ে যাবেন তো কী হয়েছে?"

"উজ্জয়িনী", বাদল জানাল, "নিয়ে যদি যান তো সব মাটি হবে।"

"বুঝিয়ে বল, যদি আপত্তি না থাকে।"

"আপত্তি কিছুমাত্র নেই।" বাদল তো বলতেই ব্যগ্র। "তুমি তো জানো, বিলেত আসবার জন্যে আমি কী পরিমাণ উৎকণ্ঠিত ছিলুম। বিয়ে করতে যে রাজি হয়ে গেলুম সেও এই কারণে। তোমার প্রতি যে অসহনীয় অন্যায় করলুম তার অন্য কোনো অজুহাত ছিল না। বলতে গেলে তোমার জীবনটাকে ব্যর্থ করলুম আমার জীবনটাকে সার্থক করতে।"

"আমার জীবন," হাসল উজ্জয়িনী, "অত সহজে ব্যর্থ হবার নয়। তবে তোমার জীবনটা যে সার্থক হয়েছে এটা একটা মস্ত লাভ।"

"এখনো হয়নি। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল হবে।"

"এখনো হয়নি?" উজ্জয়িনী পরিহাস করল। "সত্যি?

"কোন অর্থে জিজ্ঞাসা করছ ?"

"যে অর্থে মেয়েরা করে।" সে হঠাৎ বাদলের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "থাক, বলতে হবে না। আমি শুনতে চাইনে।"

"অর্থাৎ ?" বাদল ভাবতে লাগল।

"অর্থাৎ ?" উজ্জয়িনী হাসতে থাকল।

"কোন অর্থে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে ?" বাদল জল্পনা করল।

"থাক, কী বলছিলে বল।"

"না, আমি এ রহস্য ভেদ করতে চাই।"

কথাবার্তা এগোয় না দেখে উজ্জয়িনী বলল, "কমরেড জেসী কেমন আছেন ? কই দেখতে এলেন না যে ?

এতক্ষণে বাদলের ঠাহর হলো। সে একটু রেগে উঠল। বলল, "কে তোমাকে কী বলেছে, জানিনে। কিন্তু জেসী বড় মিষ্টি মেয়ে। ও যে এখনো আসেনি এর একমাত্র কারণ ও ঠিকানা পায়নি।"

"কাজ নেই ঠিকানা পেয়ে।" উজ্জয়িনী ত্রস্ত স্বরে বলল। "তুমি কি তোমার হারেম সুদ্ধ সবাইকে হাজির করবে নাকি ?

বাদল অত্যন্ত অপ্রতিভ হলো। যে অর্থটা সে এতক্ষণ ধরে অন্বেষণ করছিল সেটাও সঙ্গে সঙ্গে ধরা দিল। "তোমাকে কে কী বলেছে জানিনে। কিন্তু সত্যি আমি কারো সঙ্গে তেমন সম্পর্ক পাতাইনি।" বাদল আন্তরিকতার সহিত জ্ঞাপন করল।

"একদিনের জন্যেও না ?" উজ্জয়িনী কৌতূহলী হলো।

"এক মুহূর্তের জন্যেও না। তা বলে মনে কোরো না আমি সাধু পুরুষ। আশা করেছি কারো কারো কাছে। পাইনি। পেলে অনুতাপ করতুম না। কাজেই তোমরা আমাকে পাপীর পর্যায়ে ফেলতে পারো।"

"পাপ না করেও পাপী ?" উজ্জয়িনী বিস্মিত হলো।

"পাপ করবার ইচ্ছা সত্ত্বেও করতে পাইনি বলে পাপী।" বাদল ব্যাখ্যা করল।

"তা হলে জেসী তোমার Sweetheart নয় ?"

"না, জেসী আমার Sweetheart নয়, যদিও ওর মতো sweet আমি দেখিনি। ওকে দেবে একটা খবর ?"

উজ্জয়িনী বলল, "আচ্ছা।"

৫

উজ্জয়িনী বাদলকে সন্দেহ করত। ঐ সন্দেহ যে ভিত্তিহীন তা জেনে লজ্জিত হলো। বাদলের কাছে তার মার্জনা ভিক্ষা করা উচিত। এই মনে করে

সে বাদলের দুটি হাত নিজের দুটি হাতে ভরে আধো আধো স্বরে বলল, "ক্ষমা কোরো।"

বাদল অবাক হলো। বুঝতে না পেরে সুধাল, "কেন?"

"আমি তোমাকে সন্দেহ করেছি। সন্দেহ করে হারেমসুন্ধ বলেছি। তুমি তো তেমন নও।"

"কিন্তু তুমি যা ভেবেছ তাও তো ঠিক নয়। আমি আমার স্বাধীনতা এখনো প্রয়োগ করিনি বটে, কিন্তু কোনটা সন্দেহজনক? স্বাধীনতা, না তার প্রয়োগ?"

"আমি মাফ চাইছি আমার পাপ মনের জন্যে।" উজ্জয়িনী ঘুরিয়ে বলল। "তোমাকে দোষ দিচ্ছিনে, বাদল। দোষ দিচ্ছি নিজেকে।"

"কেউ সন্দেহ করলে অন্যায় করত না, কেননা আমি যা আশা করেছি তা কপালে না জুটলেও তা ঘটনারই শামিল। সন্দেহ করবার অধিকার কারো নেই। তুমি যদি অনধিকারচর্চা করে থাক তবে ক্ষমা চাইতে পার। ক্ষমা করলুম।"

"ধন্যবাদ। এখন আমার বিবেক পরিষ্কার।" এই বলে উজ্জয়িনী আরো কী চিন্তা করল।

"কী বলছিলুম? বলা বন্ধ হলো যে। শুনবে না?" বাদল বলতে ব্যগ্র হয়েছিল তার বিলেত আসার কথা।

"আমারও কিছু বলবার আছে, সেটা আগে বলি। কেমন?"

"উত্তম।" বাদল একটু বিরক্ত হয়ে অনুমতি দিল।

"দেখ," উজ্জয়িনী ধীরে ধীরে অবতারণা করল, "তোমার আজকের উক্তি যদি মাস কয়েক আগে শুনতুম তা হলে হয়তো এত দূর যেতুম না। কিন্তু আমি যে অনেক দূরে এগিয়েছি। বলব?"

"বলে যাও।"

"আমি আর তোমার স্ত্রী নই।"

"এই কথা? কেন, এ কি খুব নতুন কথা। আমি স্বাধীন হলে কি তুমিও অগত্যা স্বাধীন হও না? বিয়ের বাকি থাকে কী আর?"

"শুধু তাই নয়, আমি—"

"বলে যাও।"

"আমি আরেকজনকে ভালোবাসি।"

"এই কথা।" বাদল ফুৎকার করল। "তুমি যদি বুর্জোয়াদের মতো প্রেম বলে একটা আকাশকুসুমের আবাদ করতে চাও তাতে আমার কী। বুর্জোয়াদের বিশ্বাস ওরই নাম নাকি অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া।"

"আর তুমি? তুমি কি বুর্জোয়া নও?"

"না, উজ্জয়িনী।" বাদল দীপ্তকণ্ঠে বলল, "যে প্রচণ্ড প্রেরণা, যে e'lan vital, জীবসৃষ্টির মূলে তাকে আমি ক্ষীয়মাণ বুর্জোয়াদের মতো ক্ষীণ করতে চাইনে। সে তো খেলা নয়।"

"কী জানি!" উজ্জয়িনী রহস্যমগ্ন চিত্তে মৌন রইল। অস্ফুট স্বরে, বলল, "খেলা নয় তো কী?"

"যদি খেলা হয় তো তার জন্যে আমার সময় নেই। কঠোর মননেই আমার জীবনের রোদটুকু ফুরাল। যদি বাঁচি তো কারো সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রেরণায় দুর্জয় বেগে ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করব তারই নাম অনেক দূরে এগিয়ে যাওয়া, সে যাওয়া কালের বক্ষে।"

উজ্জয়িনী বিশেষ কিছু বুঝল না। যেটুকু বুঝল সেটুকু এই যে বাদল বাঁচবে বলে আশা করে না।

"যদি বাঁচি বলছ কেন?" সে অনুযোগ করল।

"কারণ, বোধ হয় বেশি দিন বাঁচব না, কেন বাঁচব যদি বাঁচাতে না পারি?"

'কাকে বাঁচাতে চাও তুমি? কোনো বন্ধুর অসুখ করেছে?" সে স্নিগ্ধ স্বরে সুধাল। "আমি সাহায্য করতে পারি?"

"না, উজ্জয়িনী। কোনো বন্ধুর নয়, সারা দুনিয়ার অসুখ। সে রোগের নাম ক্যাপিটালিজম, তার ব্যাসিলির নাম প্রাইভেট প্রফিট। তারই দাওয়াই খুঁজতে গিয়ে আমার অসুখ বাধল। সেও মরবে, আমিও বাঁচব না।"

উজ্জয়িনী তাকে কথা বলতে বারণ করল। বাদলের মুখে ঐ অলক্ষুণে বাক্যটা শুনে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেচারা বাদল! সবাই নিজের নিজের সুখ নিয়ে ব্যাপৃত, সে কিনা দুনিয়ার অসুখ নিয়ে। এখন তার এই অসুখের কী প্রতিকার? যে মানুষ দুনিয়াকে বাঁচাত দুনিয়া কেন তাকে বাঁচাবে না? উজ্জয়িনী পণ করল একা যত দূর পারে বাঁচাবে।

সে জেসীর সন্ধানে কুমারকে পাঠাল, যদি জেসীকে দেখলে তার বাঁচতে সাধ যায়।

কুমার ফিরে এসে যে সংবাদ দিল তা শুনে উজ্জয়িনীর চক্ষুস্থির।

"হ্যাঁ! মারা গেছে!" তার মুখ ফুটে বেরোল।

"কে মারা গেছে, উজ্জয়িনী? কে মারা গেছে?" বাদল বায়না ধরল। নাছোড়বান্দা।

উজ্জয়িনী বলল, "পরের কথায় তোমার কাজ কী, বাদল? তুমি যা ভাবছিলে ভাবতে থাক। হাঁ মানবের একমাত্র ভরসা রাশিয়া, যদি যাত্রা মানে ও ডিকটেটরশিপ ছাড়ে।"

"না, বল না আমাকে—কে মারা গেছে?"

"কেউ না বাদল। একটা পোষা বেড়াল ছিল, সেটা মারা যায়নি, তবে মারা যাবার দাখিল।"

"থাক, বানিয়ে বলতে হবে না। আমি কচি খোকা নই যে রূপকথায় ভুলব। বল আমাকে কে মারা গেছে।" বাদল রাগ করল।

কুমার বলল, "শুনলে তুমি উত্তেজিত হতে, তাই তোমাকে শোনাইনি। মারা গেছে মুসোলিনি।

বাদল আহ্লাদে উঠে বসল। কিন্তু কুমারের দিকে চেয়ে তার কী জানি কেন বিশ্বাস হলো না। সে আবার শুয়ে পড়ল বিষণ্ণ হয়ে। হাজার সাধলেও সেদিন সে ওষুধ পথ্য খেল না, কথা কওয়া বন্ধ করল, সমস্তক্ষণ আপন মনে গুজ গুজ করতে থাকল, কে? কে? কে?

উজ্জয়িনী সুধীর সঙ্গে পরামর্শ করল। সুধীও অনেক চিন্তা করল। শেষে সুধী নিজেই বাদলের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তার কানে কানে বলল, "বাদল, জেসী চলে গেছে।"

"কে? কে?" সুধীর হাত সবলে সরিয়ে উঠে বসল বাদল। চেঁচিয়ে বলল "মিথ্যে কথা।"

উজ্জয়িনী তার বিছানায় বসে তাকে ধরে থাকল। সে পাগলের মতো বকতে লাগল, "মিথ্যে কথা। জেসী কখনো চলে যেতে পারে না। সে যে এখনো ছেলেমানুষ, দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে তার সমুখে। তার তো যাবার কথা নয়। না, না, তোমরা ভুল শুনেছ। মিথ্যে নয়, ভুল।" তারপরে বলল, "সুধীদা, তোমাকে মিথ্যুক বলেছি বলে মাপ চাইছি। তুমি মিথ্যুক নও, ভ্রান্ত।"

কুমার মানল, "হ্যাঁ, সুধীদা ভুল শুনেছে। জেসী নয়, তার পিসী।" উজ্জয়িনী চোখ টিপে বলল, "তুমিও ভুল শুনেছ। পিসী নয়, পুষি।" বাদল মিনতি করল, "তোমরা আমাকে একা থাকতে দাও। তোমরা দয়া করে যাও।"

তখন অন্য দুজনে গেল, রইল কেবল সুধী আর বাদল। সুধী গেল না, পাছে বাদল একটা কিছু অনর্থ বাধায়।

বাদল মেজের উপর গা মেলে দিল, হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল। এই ভাবে কতকাল কাটাল। সুধী তার পাশে বসে মনে মনে প্রার্থনা করল তার জন্যে, জেসীর জন্যে। বায়ু যেমন করে অন্তরীক্ষে চলে, শব্দ যেমন করে ঈশ্বরে চলে, আলো যেমন করে শূন্যে চলে, প্রাণও তেমনি করে আরো এক বৃহত্তর অয়নে চলে। এরা কেউ কোনোখানে এক মুহূর্ত থামে না। যেখান থেকে চলে যায় সেখানকার সাথীরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুসরণ করতে পারে না বলেই কাঁদে। কল্পনা করে সে বুঝি কোথাও থেমেছে।

না, সে প্রাণের রথে চড়ে চলেছে এক ভুবন হতে আর এক ভুবনে। জয় হোক।

বাদল বলল কাতর কণ্ঠে, "সুধীদা, সমাজে অবিচার আছে, তাই নিয়ে ভেবে মরছি। কিন্তু এই যে অবিচার—কার অবিচার জানিনে, বিধাতার কি প্রকৃতির কি নিয়তির কি নিখিলব্যাপী অরাজকতার—এই অবিচার চোখে পড়লে কি আর কোনো অবিচার চোখে লাগে।"

সুধী বলল, "কার বিচারে অবিচার? আমাদের বিচারশক্তি কতটুকু? আমরা বিচার করবার কে? আয়, বিচার না করে প্রার্থনা করি।"

বাদল সাড়া দিল না। তেমনি পড়ে থাকল।

উজ্জয়িনী পা টিপে টিপে এলো। জিজ্ঞাসা করল, "ও কিছু খাবে না?" সুধী বলল, "থাক, ওকে আজ উপোস করতে দে। আমিও কিছু খাব না।" জুড়ল, "তবে ওষুধের কথা আলাদা। আমার হাতে দিস, আমিই খাওয়াব। আর শোন, আজ রাত্রে আমি এ ঘরে শোব।"

উজ্জয়িনী তেমনি সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল।

বাদল বলল আর্ত স্বরে, "সুধীদা, আমাকে certitude দাও। বল, জেসী আছে, চিরকাল থাকবে, এই আলো এই আকাশ এই ফুল এই পাখী এই সবই তার। বল, এই অধিকার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করেনি, করবে না।"

সুধী বলল, "সে আছে, থাকবে, ভোগ করবে আবহমানকাল।"

৭

সে রাত্রে বাদল বা সুধী দু'জনের কারো ঘুম এল না। সুধী জেগে থাকল বাদলকে পাহারা দিতে।

বাদল যখন উঠে জানালার কাছে গেল সুধীও উঠল। বাদল বলল, "সুধীদা, তোমারও কি ইনসমনিয়া হলো?"

"না রে। আমি ইচ্ছা করেই জেগে আছি তোকে চোখে চোখে রাখতে।"

"তোমার ভয় নেই, আমি জানালা দিয়ে ঝাঁপ দেব না।" বাদল বলল ভিজে গলায়। "আমার কী মনে হচ্ছে বলব?"

"বল।" সুধী তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারাদের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হলো। "মনে হচ্ছে" বাদল থেমে থেমে বলল, "সমাজের চেয়ে বড় জীবন। জীবনের চেয়ে বড় মরণের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দিগন্তবিসারী নিঃসঙ্গতা। 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।' সত্য শুধু আমি নিজে, আর আমাকে ঘিরে এক পরম রহস্য।"

সুধী তার কাঁধে হাত রাখল। বলল, "কিছুই মিছে নয়। সমাজ সংসার জীবন আত্মা পরলোক সবই সত্য। কোথায় যাবি রে তুই?

যেখানেই ঘাস দেখবি এমনি সাদায় কালোয় আঁকা পূর্ণতার ছবি। রূপগুলি নতুন, কিন্তু রূপকার তো সেই একই, সুতরাং নতুনের তলে তলে চিরন্তন।"

"বলছিলুম," বাদল নির্লিপ্তভাবে বলল, "আমি শেষ পর্যন্ত একা। সেইজন্য সামাজিক চেতনার দ্বারা আবিষ্ট থাকতে মন যায় না। ওর মধ্যে একটা মাদকতা আছে, ওতে ভুলিয়ে রাখে যে অন্তিম মুহূর্তে আমি একা, আমি নিবলে কেউ আমার সঙ্গে নিববে না।"

সুধী বলল, "কিন্তু সম্পর্ক তা সত্ত্বেও থাকে। এই যে তুই জেসীর কথা ভাবছিস এই ভাবনার ঢেউ জেসীর গায়ে লাগছে, যদিও সে অশরীরী। ভাবনার চেয়ে আরো সূক্ষ্ম প্রেম। প্রেমের অনুরণন প্রিয়জনের অন্তরে পৌঁছয়।"

"না, এসব বিশ্বাস করিনে। এসব রূপকথা।" বাদল জানালার ওপারে একটুখানি ঝুঁকে দেখল। সুধী তাকে জড়িয়ে ধরল।

"আচ্ছা, এখন বিছানায় ফিরে যাওয়া যাক। তুমি যখন কিছুতেই ঘুমাবে না তখন তোমাকে আর একটা কথা বলি।"

তারা যে যার বিছানায় ফিরল।

বাদল বলল, "তুমি তো জানো আমার একে একে সব বিশ্বাস লোপ পেয়েছে, লোপ পায়নি কেবল এই বিশ্বাস যে প্রগতি জিনিসটা কাম্য। কিন্তু সেটা সামাজিক চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যার সামাজিক চেতনা গেছে—অন্তত সামাজিক চেতনার আবেশ কেটেছে—তার কাছে সে বিশ্বাস মূল্যহীন।"

সুধী শঙ্কিত হলো। কিছু বলল না।

"তা হলে আমি শেষপর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করিনে।" বাদল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার পরে বলল, "এক যদি বল যে আমি আছি এও তো একটা বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক এটা একটা বিশ্বাস নয়। এটা একটা অনুভূতি।"

"বাদল," সুধী তাকে প্রগাঢ় প্রত্যয়ভরে বলল, "বিশ্বাস কর যে এই অনুভূতি মরণের পরেও থাকে, কাল স্পর্শ করে না এর কেশ, spaceএর কাছে অবান্তর। এই একটিমাত্র বিশ্বাস যদি থাকে তবে সব থাকল। জেসী, ন্যায়বিচার, সার্থকতা, সামঞ্জস্য—সব।"

"কী জানি!" বাদল কায়ক্লেশে বলল, "আর ভাবতে, হিসাব মিলাতে, ভালো লাগে না, ভাই। আমার শরীরে আর দম নেই, ঘড়ির টিক টিক মৃদু হয়ে আসছে। আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো?"

সুধী তাড়াতাড়ি উঠল, উঠে বাদলের হাতে জল দিল। তার জল খাওয়া

শেষ হলে বলল, "তুই এখন চুপ কর দেখি। ঘুম না আসে না আসুক, ক্ষতি নেই, তুই চুপ করে জেসাস্‌র ধ্যান কর।"

বাদল জল খেয়ে একটু শান্ত হলো। তখন সুধী কুমারকে জাগিয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। তার পরে নিজে বাদলকে মাসাজ করতে বসল। তাতে বোধ হয় কিছু ফল হলো। বাদলের তন্দ্রার ভাব এলো।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ! বাদল আবার উঠে জানালার দিকে চাইল। সুধী তাকে খাট থেকে নামতে দিল না, একটু জোর খাটিয়ে শুইয়ে রাখল।

সে বলল, "জল।"

সুধী জল খাওয়াল।

জল খেয়ে সে বলল, "সুধীদা, আমি সরে দাঁড়ালুম। বিবর্তনের মিছিল চলছে, চলতে থাক, আমি তাতে নেই।"

সুধী তাকে কথা বলতে বারণ করল। সে শুনল না। ক্লান্ত করুণ স্বরে বলল, "আমার বিশ্বাস গেছে, বাকী আছে ইচ্ছা। বিশ্বাসহীন ইচ্ছা তো মিছিলের উপর খাটে না। তাই নিজের উপর খাটালুম। সরে দাঁড়ালুম।"

সুধী ডাক্তারের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। উজ্জয়িনীকে জাগিয়ে বলল হট ওয়াটার বটল আনতে, কোকো তৈরি করতে।

বাদল জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছিল আর বলছিল, "সরিয়ে নিলুম আপনাকে এই পদার্থ জগৎ হতে, ঘটনাশৃঙ্খল হতে, ভালোমন্দের দ্বৈত হতে। অপসরণ করলুম দায়িত্ব ও অধিকার হতে, ব্যর্থতা ও সিদ্ধি হতে, সর্ব ফলাকাঙ্ক্ষা হতে। চলতে থাক এই মিছিল, এই স্বপ্ন। আমি সরলুম।"

ডাক্তার এসে তাকে মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়ালেন। সে একটি শান্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ল। তখন ভোর হয়ে আসছে।

দুপুরের দিকে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সে জানতে চাইল, "বাবা কত দূরে?"

খবরটা কাল থেকে চাপা দেওয়া হয়েছিল। রায়বাহাদুর কাল মার্সেলস্ থেকে তার করেছিলেন যে তিনি প্যারিসের পথে আসছেন। আজকেই তাঁর পৌঁছনর কথা। তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সুধী যাবে।

"ওহ্!" বাদল পরম নির্ভয়ে বলল, "আচ্ছা, দেখতে চান, দেখবেন। কিন্তু ধরতে পারবেন না।"

এর পরে উজ্জয়িনীর হাতে খেতে খেতে বাদল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। উজ্জয়িনী সুধীকে ডাকল, "দাদা, একবার এস তো।"

সুধী কুমারকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে বাদলের ভার নিল। আধ ঘন্টা

পরে বাদল চোখ মেলল। ক্ষীণ স্বরে বলল, "আহা! এতকাল পরে একটু··· ঘুমিয়ে বাঁচি।" তারপরে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

একটু পরেই ডাক্তার এসে পড়লেন। কিন্তু ততক্ষণে বাদল বেঁচে গেছে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রহিত।

উজ্জয়িনী ডাক্তারের সামনেই বাদলের পায়ে মাথা রেখে দুই বাহু দিয়ে তাকে বেষ্টন করল। ডাক্তার তা দেখে চোখে রুমাল চেপে কুমারের সঙ্গে বাইরে গেলেন। সুধী নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল বাষ্পান্ধ নয়নে।

সে কী কান্না উজ্জয়িনীর! ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে এমন বিকল হয়ে কাঁদছিল যে কুমার পর্যন্ত অবাক হয়ে ভাবছিল, ও কি কোনো দিন বাদল ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষকে সত্যি ভালোবেসেছে! বাদলই ওর সত্যিকার স্বামী, কুমার শুধু ওর সখা। কুমারের মনে শোচনা, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে হয়তো সেই এই ঘাতকতা করেছে। সেও বাদলের পায়ের কাছে বসে চোখের জলে ভাসতে থাকল।

কিন্তু সকলের চেয়ে মর্মন্তুদ হলো পুত্রহারা বৃদ্ধ পিতার বুকফাটা বিলাপ। "বাবুয়া? বাদল বাবুয়া? নেই? চলে গেছে? হায় হায় হায়।"

সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের উপর ধীরে ধীরে যবনিকা পড়লে কেমন হয়?

৭ই এপ্রিল ১৯৪২

রত্ন ও শ্রীমতী (দ্বিতীয় পর্ব)

সাত

পরীক্ষার ঝঞ্ঝাটে রত্ন বড় চিঠি লিখতে পারে না। গৌরীর তাতে কী আফসোস। সে তার অভ্যাসমতো পাতার পর পাতা লিখে যায়। সেসবও রত্নর পাঠ্য। তবে সবকিছু উত্তরযোগ্য নয়। পরীক্ষার পরে এক সময় উত্তর দিলে ক্ষতি নেই।

ইদানীং গৌরীর চিঠিতে বিচিত্র খবর থাকে। শিকারের বিবরণ। তার জন্যে আলাদা একটা হাতী বরাদ্দ। হাতীটার নাম মান বাহদুর। হাওদার উপর পর্দা খাটানো থাকলেও সে যখন খুশি পর্দা ঠেলে সরিয়ে দেয়। মুখ খোলা রাখে। তার হাতেও বন্দুক। কিন্তু গুলী যদিও ছুঁড়েছে এখনো জীবহত্যা করেনি। বাঘ ভালুক পেলে মারত। কিন্তু তা হলে জঙ্গলে রাত কাটাতে হয়। তাতে সে নারাজ। দিনের বেলা পাখী মারার জন্যেই অভিযান। শুয়োর খোঁচানোর দলে সে যাবে না। সাহেব খোচাতে পারলে যেত। ডোমকলের সাহেবদের সঙ্গে তার প্রোপ্রাইটর যান। কী যে আনন্দ পান তাতে। আনন্দ মদিরা।

বন্দুক ও শিকারের কুহক গৌরীকে ঘরে থাকতে দেয় না। ভোর না হতেই বাইরে টেনে নিয়ে যায়। বাইরে গিয়ে বুঝতে পারে ওটা বাইরেরই কুহক। যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ ভুলে থাকে। কিন্তু বিকেল চারটের সময় থেকে মন কেমন করা শুরু হয়। ওটা যে ডাক আসার সময়। ডাকে যে রত্নর চিঠি থাকে বা থাকতে পারে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে চায়। কিন্তু শিকারের নেশায় এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে ফিরতে বললেই ফেরা তখনি হয় না। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়।

রত্নর চিঠি পেতে এই কয়েক ঘন্টার বিলম্ব তার সমস্ত দিনটা মাটি করে দেয়। ফেরা যাক ফেরা যাক করে সে অন্যান্যদের দিনটাও মাটি করে। পদ্মার চরে যারা চখা শিকারে গেছে তারা কি অত সহজে থলে ভর্তি করতে পারে। চখা অতি হুঁশিয়ার পাখী। খালি হাতে ফিরতেও কেউ রাজী নয়। এক গৌরী ছাড়া। তার লক্ষ্য জ্ঞান নেই। কেবল ফাঁকা আওয়াজ। তার তাতে লজ্জা নেই। সে যে নির্ভয়ে গুলী ছুঁড়তে পেরেছে এই যথেষ্ট কেরদানী। এমনি কিছু দিন চালাতে পারলে ইংরেজ ফেরার হবে। ঐ মহিষমর্দিনীর সঙ্গে লড়তে যাবে কে।

গোরী তার শিকারকাহিনীর শেষে লেখে, 'আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ কী, জান? তোমার চিঠি পাওয়া। চিঠি যখন পাই তখন প্রাণ ফিরে পাই। তার আগে তিন চার ঘণ্টা ছটফট করতে হয়। মনে হয় বাড়ী আজ আর পৌঁছব না। পথে পথেই রাত কাটবে। হাতী হয়তো পথ ভুলে উলটো দিকে চলল। সত্যি সত্যি পৌঁছে যাই। ওরা বলে, এমন কী রাত হয়েছে। আমি বলি, এমন দেরি হবে জানলে আদৌ যেতুম না। লোকগুলো কী শয়তান! কত যে নিরীহ পাখী মেরেছে তার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল নেই। আহা! কী যে কান্না পায় দেখে। নরম তুলতুলে শরীর কাঠের মতো শক্ত। যেন কাঠের পুতুল। চোখের মণি যেন জমাট অশ্রু। কী যে মায়া লাগে দেখতে!'

আরেক দিন লেখে, 'চিঠি পেতে কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়, তাই শিকারে যেতেই পা ওঠে না। ওগো কেমন করে আমি জেলে যাব! সেখানে কি তোমার চিঠি পাব! পেতে অশেষ বিলম্ব হবে না? ওগো কেমন করে আমি গা ঢাকা দিয়ে দেশের জন্যে লড়ব? মাটির তলায় লুকোব? তোমার চিঠি কি রোজ চারটের সময় মিলবে! আজ এক জায়গায় কাল এক জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে লুকিয়ে বেড়াতে হবে আমাকে। কে আমার ঠিকানা জানবে যে তোমার চিঠি পৌঁছে দেবে! প্রিয়তম, তুমি আমার সব পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করেছ। এ নেশা যার আছে সে কেমন করে দেশের স্বাধীনতা আনবে! এ যে মদের চেয়েও প্রবল!'

একদিন রত্নর চিঠি না পেলে সে দিশেহারা হয়। চিঠি তো এক টুকরো কাগজ নয়। একটুখানি সঙ্গসুখ। দিনান্তে ওটুকু যদি না পায় তবে রাত কাটে কী করে! কালরাত্রি যেন পোহাতে চায় না। বার বার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। যা নয় তাই কল্পনা করে। রত্ন কি আর আছে। সে নেই। সে মরে গেছে বা চলে গেছে বা অন্য কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছে। চোখের জলে ভিজে যায় বালিশ। ভিজে যায় বিছানা। গোরী ওঠে, দীপ জ্বালায়। কেরোসিনের টেবল ল্যাম্প। রত্নকে লিখতে বসে।

> আমার স্বাধীনতার জন্যে তুমি দিনরাত ভাবছ। স্বাধীনতা আমি চাই। কিন্তু তোমার হাত থেকে নয়। আমার স্বাধীনতা তোমার অধীনতার জন্যে। তোমার কোলে মাথা রেখে আমি মরতে চাই। এই আমার জীবনের চরম অভিলাষ। তার পর তুমি আমার চিতার উপর তাজমহল গড়ে দিয়ো, যদি সত্যি আমাকে ভালোবেসে থাক।
>
> স্বাধীনতার সংকল্প আমি নিয়েছি। স্বাধীন আমি হবই। কিন্তু আমার স্বাধীনতা তোমার স্বাধীনতার মতো নির্ব্যূঢ় নয়। আমি তোমার হতে চাই বলেই স্বাধীন হতে চাই। তুমি আমার না হয়েও স্বাধীন।

নারী ও পুরুষ সমান স্বাধীন কেন হবে না এ নিয়ে তর্ক করেছি আমিও। এখনো তর্ক করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তো জানি আমার দৌড় কত দূর। লক্ষ্মীবাঈ হব বলে ঘোড়ায় চড়তে গেলুম, মারাঠা মেয়েদের মতো কাছা দিয়ে শাড়ী পরতে পারলুম না। বসতে গিয়ে দেখি বসা অস্বস্তিকর। লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো অস্ত্র হাতে নিলুম। মানুষ মারার আগে পশুপাখী মারতে গেলুম। শিকারের তোড়জোড় করে জীবহত্যা করতে পারলুম না। প্রিয়তম, আমার মতো অপদার্থকে দিয়ে দেশের কাজ হবার নয়। আমি বিপ্লবী নায়িকা নই। আমি একান্তভাবে প্রেমাধীনা পরাধীনা নারী। তোমারই অধীনা।

আচ্ছা, তুমি কি যীশু খ্রীস্ট না মহাত্মা গান্ধী? তোমার পুরোনো চিঠিগুলি আজ আবার নাড়াচাড়া করছি আর ভাবছি তোমার অমন সাধু হবার সাধ হলো কেন? তুমি যাকে যশোবাবু বল আমি তাঁকে মিস্টার ফৌজদার বলি। তাকে তুমি হাজার চেষ্টা করলেও ভালোবাসতে পারবে না। ভালোবাসব বললেই কি ভালোবাসা যায়। এই যেমন হিং বা রসুন। বহু সদ্‌গুণের অধিকারী। কিন্তু ব্যঞ্জনে দাও দেখি। ক'জন খেতে ভালোবাসবে? আলাদা করে দাও দেখি। কারই বা মুখে রুচবে। আমার তো গন্ধে বমি আসে। জোর করে বমি চাপতে যাওয়া কি ভালোবাসা? তার চেয়ে ভোজন ত্যাগ করাই শ্রেয়।

তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। তুমি চাও অন্তঃপরিবর্তন। ধর তাই হলো। কিন্তু হলে কার কোন কাজে লাগবে। এরা আমার কে! সম্পূর্ণ অনাত্মীয় অজানা বিদেশী লোক। আমি এদের কে। বেঁধে আনা বিদেশিনী ক্রীতদাসী। এরা দেবতা হলেই বা আমার কী! আমার দাসীপনা তো ঘুচবে না। আমাকে মর্যাদা দেওয়া হবে দেবীর, কিন্তু সে দেবী খড়ের। তাকে বিসর্জন দিতে বাধবে না। সে যদি মা না হয় তবে তার পরিণাম কী হবে তা কে না জানে। সে থাকতেই আর একটি দেবী আসবে। কথাটা কেউ মুখ ফুটে বলবে না। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে বাকী থাকে না। আমার মূল্য আমার জন্যে নয়। বংশধরের জন্যে। এরা কি কোনো দিন আমার মূল্য অন্যনিরপেক্ষ বলে মানবে। বাইরে মানতে পারে, অন্তরে মানবে না। তা হলে অন্তঃপরিবর্তন কিসের?

কান্ত, তোমার প্রেম আর আমার মুক্তি একসূত্রে গাঁথা। তুমি থাকতে আমি আর কারো দিকে তাকাব না। আর কেউ আমার নয়। আমি আর কারো নই। ওদের অন্তঃপরিবর্তনে আমার কী। রত্ন আছে আমার। আমি রত্নসম্পন্না। আর কোনো সম্পদে আমার কাজ

কী ! রত্নকে লোকে যত্ন করে সিন্দুকে তুলে রাখে। সাধ করে কণ্ঠে ধারণ করে। কিংবা করে কর্ণাভরণ, নাসাভরণ। আমার রত্নকে নিয়ে আমি কী যে করি, কোথায় যে রাখি। আমার ঘর থাকলে আমি ঘরে বন্ধ করে রাখতুম। আমার বাহির থাকলে আমি চোখে চোখে রাখতুম। আমার রত্নকে কে কোন দিন চুরি করে নিয়ে যাবে, ভুলিয়ে নিয়ে ধরে রাখবে, ভেবে আমার ঘুম আসতে চায় না। আমার জীবনে এ কী যাতনা এলো। এমন হবে কে জানত! আমার স্বাধীনতার জন্যে আমি জ্বলেপুড়ে মরছিলুম, এখন দেখছি তোমার স্বাধীনতা আমার গায়ে সয় না। ওগো আমি কী যে অসহায় বোধ করি যখন ভাবি যে আমার রত্নকে আমি বুকে করে রাখতে পারছিনে। আর কেউ যদি তা করে তখন!

রত্ন কিছু দিন আগে গৌরীকে লিখেছিল যশোবাবুর যাতে অন্তঃপরিবর্তন হয় তাই তার কাম্য। জন গ্রেগরীর হতে পারে, যশোবাবুর হতে পারে না? অন্তঃপরিবর্তন বলতে কী বোঝায় তা সে স্পষ্ট করেনি। তার মতে অন্তঃপরিবর্তন হচ্ছে গৌরীকে স্বেচ্ছায় ছাড়পত্র দেওয়া। কিন্তু গৌরীর মতে তা নয়। অন্তত ওর চিঠি থেকে মনে হয় না যে ও ছাড়পত্রের কথা ভাবছে। ও ভাবছে মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি অথচ সেই সঙ্গে সপত্নীজ্বালা থেকে অব্যাহতির কথা। যশোবাবুর অন্তঃপরিবর্তন বলতে গৌরী বোঝে তিনি তাকে মা হতে বাধ্য করবেন না, সে যদি মা না হয় তবু আরেকটি বিয়ে করবেন না। কিন্তু গৌরী বিশ্বাস করে না যে সে অর্থে তার অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। ঘটলে এই পর্যন্ত ঘটবে যে তিনি ওকে দেবীর মর্যাদা দেবেন। ওর উপর জোর খাটাবেন না। কিন্তু প্রত্যাশা খাটাবেন। প্রত্যাশা বিফল হলে পুনশ্চ বিবাহ। পুরুষের সে অধিকার আছে।

রত্নর মনে একটা খটকা বাধল। গৌরী যদি মা না হয় ও যশোবাবু যদি আবার বিয়ে না করেন তা হলে দু'জনের বোঝাপড়া এমন কী কঠিন যে সম্পর্কচ্ছেদ করতেই হবে? তা হলে মুক্তি মানে কী? বিবাহ থেকে মুক্তি নয় বোধ হয়। বিবাহ যেমন আছে তেমনি রেখে যশোবাবু যে অর্থে মুক্ত পুরুষ গৌরীও সেই অর্থে মুক্ত নারী হতে চায় না তো? যশোবাবু যেমন সুধা গৌরীর কিনা তেমনি রত্ন?

চার জনের তাস খেলার উপমা একবার মনে এসেছিল। খেলায় জিতলে সুধাদি পাবেন যশোবাবুকে, রত্ন পাবে গৌরীকে। এই ছিল সে খেলার পণ। এবার যখন সেই উপমা মনে এলো, তখন তার মর্ম বদলে গেল। খেলায় জিতলে যশোবাবু পাবেন সুধাকে, গৌরী পাবে রত্নকে। বিবাহ ব্যতিরেকে। রত্নের মনে খট করে বাজল। সে বিবাহ নামক প্রথাটায় বিশ্বাস করে না,

কিন্তু বিবাহিতা নারীর উপনায়ক হতে ঘৃণাবোধ করে। গোরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধের ভিত্তি হবে গোরীর কুমারীত্ব, তার কুমারত্ব। গোরীকে তা হলে ছাড়পত্র নিতে হয় বা বিবাহ নাকচ করতে হয়। এ রকম জল্পনা মাস কয়েক আগেও শোনা যেত। কিন্তু ইদানীং তার স্বামীর সঙ্গে তার শিকারে যাওয়া ও ঘোড়ায় চড়ার সূত্রে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। খুব একটা বৈরীভাব নেই। তিনি তাকে লক্ষ্মীবাঈ হবার সুযোগ দিয়েছেন বলে সে কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ।

ওদের ওই চারজনের তাস খেলায় সুধাদির হাতের পাঁচ ছিল—'আমার বাপের দেওয়া ঘরদোর পড়ে রয়েছে, জায়গাজমি বারো ভূতে লুটে খাচ্ছে। আমি চললুম রে, যশো। চলি তবে, রানী বোন।' মাঝে মাঝে তিনি ওটা তুলে দেখাতেন আর অমনি দু'দিক থেকে রব উঠত, 'না। না। তুমি যেয়ো না। তোর যাওয়া হতে পারে না।'

তেমনি রত্নর হাতের পাঁচ ছিল—'এখন থেকে আমরা আবার রাখীবন্ধ ভাইবোন। মোগল বাদশা আর রাজপুত রানী। ইতিহাসে অমর।' মাঝে মাঝে সে ওটার উল্লেখ করত আর অমনি আর্তনাদ উঠত, 'তা হলে আমি মরে যাব।'

এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। রত্ন লিখল, 'তুমি হবে লক্ষ্মীবাঈ আর আমি হব তোমার রাখীবন্ধ ভাই। দেশ স্বাধীন হবে। তুমিও স্বাধীন হবে। আমাদের দেখাশোনার দ্বার অবারিত। এই সম্পর্ক মেনে নাও তো আমি পরীক্ষার পর সোজা বেগমপুর গিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই জন্মে কেন, এই মাসেই চার চোখ এক হবে, গোরী বোন।'

গোরী উত্তর দিল, 'আমি তোমার পায়ে কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে বোন বলে ডেকে চরম শাস্তি দিলে! তুমি কি জান না যে ও ডাক আমার প্রাণদণ্ড! আমার মনে হলো আমি মূর্চ্ছা গেছি। ফিটের ব্যারাম আমার কোনো কালে ছিল না। এই প্রথম। রতন, অরূপ রতন, অভাগিনীকে আর কত পরখ করবে। পরখ করতে গিয়ে দেখবে নারীবধ করে বসেছ। রতন, মনের মতন, তুমি কেন আমাকে নিয়ে যাও না? হরণ করে নিয়ে যাও না?'

প্রভাতের কাজ থেকে বিদায় নেওয়া বাকী ছিল। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তার ঘরে তার পড়ার ব্যাঘাত করল রত্ন। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর প্রিয় প্রসঙ্গ উঠল।

'তার পর? তুমি কি তোমার ও অধ্যায় শেষ করে দিয়েছ না এখনো গৌর প্রেমে মাতোয়ারা?' প্রভাত বলল রহস্য করে।

'আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়?' রত্ন রঙীন হলো।

'কী মনে হয় বলব? মনে হয় তোমার মুখে কেউ মুঠো মুঠো ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে। হোলি খেলেছে তোমার সঙ্গে। তুমি যার হৃদয় জয় করেছ তার মতো নারীরত্ন আমিও দেখিনি, তুমিও দেখবে না। কিন্তু ওর ভালোবাসা পাওয়া আর ওকে পাওয়া একই কথা নয়। ও যদি তোমাকে অমন আশা দিয়ে থাকে তবে না বুঝে দিয়েছে। আমার ওই বোনটির উপর আমার অগাধ স্নেহ, কিন্তু ওর সংসারজ্ঞান নেই।'

'কেন ও কথা বলছ?' রত্ন আশ্চর্য হলো।

'কেন বলছি? আচ্ছা, তুমিই বল। ভাগবতে ষোল হাজার গোপবধূর দৃষ্টান্ত আছে। তাঁদের মতো প্রেম আর হয় না। কিন্তু প্রেমের জন্যে তাঁদের একজনও কি কুল ছেড়েছিলেন। পদাবলীতে আমরা রাধার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি। তিনিই প্রেমের চূড়ান্ত আদর্শ। তিনিও কি শ্যামের জন্যে কুল ছেড়েছিলেন? সেকালের শ্রীমতী যা পারলেন না একালের শ্রীমতী কি তা পারবেন? সেইজন্যে বলছিলুম আমার বোনটির সংসারজ্ঞান নেই।'

'ভাই প্রভাত, তুমি তা হলে আমাদের কী করতে বল? ওকে আর আমাকে?' রত্ন সুধাল অন্তরঙ্গ ভাবে।

'ভালোবাসতে। কিন্তু কামনা না করতে। কামনা থাকলে পূরণ না করতে।' প্রভাত বলল আরো অন্তরঙ্গ ভাবে।

রত্ন ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর প্রশ্ন করল, 'এটা কি তুমি সংস্কারবদ্ধ বলে বলছ? না তুমি ভুক্তভোগী বলে বলছ?'

'না, ভাই। আমি সংস্কারবদ্ধ নয়। আমি বিশ্বাস করিনে যে একটি মেয়ে একটি পুরুষের সঙ্গে নারায়ণশিলা সাক্ষী করে মন্ত্র পড়েছে বলে সেই সুবাদে চিরকালের মতো তারই হয়ে গেল। এমন কি পরকালেও। মানুষের ইহকাল পরকাল একরাত্রের একটি অনুষ্ঠানে নির্ধারিত হয়ে যায় না। স্বয়ং নারায়ণই ষোল হাজার গোপবধূর সঙ্গে বিহার করে অন্য রকম সাক্ষ্য দিয়েছেন।' প্রভাত রঙ্গ করে বলল।

রত্ন আবার রঙীন হয়ে উঠছে লক্ষ করে প্রভাত তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরিয়ে দিল। বলল, 'হৃদয়ের ভালোবাসা ও অঙ্গের কামনা দুই এক নয়। হৃদয়ের টান নাড়ীর টানের মতো আজীবন থাকে। যদি তাই নিয়ে তোমরা তুষ্ট হও তবে তোমাদের সুখ চিরন্তন হবে। আর যদি অঙ্গের কামনাকে তার সঙ্গে জড়াও তা হলে অঙ্গ যত দিন না জুড়ায় তত দিন জ্বলতে থাকবে। জল যেমন এক দিকে যেতে না পেলে আরেক দিকে গড়ায় আগুন তেমনি এক ইন্ধন না পেলে আরেক ইন্ধন পোড়ায়। কামনা থাকলে তাকে পাত্রান্তরিত করতেই হবে একদিন না একদিন। তোমাকেও, তাকেও। তা বলে প্রেম কেন পাত্রান্তরিত হবে?'

রত্ন স্তম্ভিত হলো। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল, 'তোমার যুক্তি যদি যথার্থ হয় তবে প্রত্যেক পুরুষের দুটি করে নারী চাই আর প্রত্যেক নারীর দুটি করে পুরুষ। একটি হৃদয় ভরাতে। একটি অঙ্গ জুড়াতে। তা হলে তুমি একবিবাহ প্রচার কর কেন?'

প্রভাত অসংকোচে বলল, 'হৃদয় ভরাতেও নয়। অঙ্গ জুড়োতেও নয়। ঘরসংসার করতে। মা হতে। ছেলে মানুষ করতে। পরিবারের বাঁধুনি ঠিক রাখতে।'

'তা হলে এক একটি পুরুষের তিন তিনটি নারী? এক একটি নারীর তিন তিনটি পুরুষ? বহুবিবাহ না বহুবিহার—কোনটা তোমার লক্ষ্য?

রত্ন বিমূঢ় হয়েছিল। তাকে আরো বিমূঢ় করল প্রভাতের এই উক্তি— 'আমার বক্তব্যের সারতত্ত্ব তুমি ধরতে পারনি, রতন। আমি একবিবাহেরই পক্ষপাতী। বহুবিবাহের নয়। বহুবিহারেরও নয়। আমার পরিকল্পনায় রামের গৃহিণী হবে শ্যামের প্রেমিকা আর হরির নায়িকা। শ্যামের গৃহিণী হবে হরির প্রেমিকা আর রামের নায়িকা। হরির গৃহিণী হবে রামের প্রেমিকা আর শ্যামের নায়িকা। তেমনি রাম হবে মালতীর স্বামী আর মাধবীর কামী আর মল্লিকার প্রেমী। শ্যাম হবে মাধবীর স্বামী আর মল্লিকার কামী আর মালতীর প্রেমী। হরি হবে মল্লিকার স্বামী আর মালতীর কামী আর মাধবীর প্রেমী। তা হলে সকলেই সুখী। সকলেই সমৃদ্ধ। এক সেট ব্যবস্থায় যেটা কদাচিৎ সম্ভব তিন সেট ব্যবস্থায় সেটা সাধারণত সম্ভব।'

রত্নর মুখে চোখে আতঙ্কের লক্ষণ দেখে প্রভাত তাকে অভয় দিল। 'অবশ্য আমি প্রস্তাব করব না যে তিন সেট ব্যবস্থা আমাদেরই দ্বারা প্রবর্তিত হবে। কালক্রমে আপনাআপনি বিবর্তিত হবে। সেকালে একই ব্যক্তি ছিল পুরোহিত ও বৈদ্য ও সৈনিক ও কৃষক। শ্রমবিভাগ ঘটে বৈদ্যকে করে দিল স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি। একালে বৈদ্য কত ভাগ হয়েছে, লক্ষ্য করেছ তো? দাঁতের ডাক্তার, চোখের ডাক্তার, কানের ডাক্তার, চামড়ার ডাক্তার ফুসফুসের ডাক্তার। প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্যে এক একটি ডাক্তার। একজন আরেক জনের কাজ করবে না। যে যার নিজের কাজ করবে। তেমনি—'

রত্ন ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল। এ শর্তে সে স্বামী হতে চায় না, কামী হতে চায় না, প্রেমী হতেও তার অরুচি। যে মেয়ে অন্যের গৃহিণী হবে রত্ন হবে তার প্রেমিক বা নায়ক। কক্ষনো না। যে মেয়ে অন্যের প্রেমিক হবে রত্ন হবে তার নায়ক বা স্বামী। কক্ষনো না। যে মেয়ে অন্যের কামিনী হবে রত্ন হবে তার স্বামী বা প্রেমিক। কক্ষনো না। স্বাধীন পুরুষ সে বহু নারীর সঙ্গে বহু প্রকার সম্পর্ক পাতাবে, যেমন বহু পুরুষের সঙ্গে। সেসব হলো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের। কিন্তু

নরনারী সম্পর্ক কেবল একজনের সঙ্গে একজনেরই। তেমন স্বাধীনতা নারীরও থাকবে। গোরীরও থাকবে।

প্রভাত তা শুনে বলল, 'সে কি কখনো হয়। মেয়েমানুষ প্রথমে মেয়ে, তার পরে মানুষ। নারীর মধ্যে নারীত্বই প্রধান ব্যক্তিত্ব অপ্রধান। তুমি যার সঙ্গে ব্যক্তি বলে বা মানুষ বলে সম্পর্ক পাতাবে সে-ই একদিন তোমাকে স্বামী বলে বা কামী বলে কল্পনা করবে। গোরী কি তা সহ্য করবে? করত, যদি গোড়া থেকে তুমি তিন সেট ব্যবস্থায় সায় দিতে। তার স্বামী অন্যজন, কামী অন্যজন, প্রেমিক শুধু তুমি। তা হলে তোমার কত বেশী স্বাধীনতা থাকত ভেবে দেখ। ঘর তো ওকে তুমি দেবে না। সংসারী হবে না তো। কেন তবে বেচারিকে ঘরসংসার ছেড়ে পথে বেরোতে বলা। স্বাধীনতার জন্যে? কী হবে তেমন স্বাধীনতা দিয়ে? নারীর কাছে তার ঘরের নিরাপত্তাই সব চেয়ে বড়। যেমন পুরুষের কাছে তার জীবিকা। তার কেরিয়ার।'

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। রত্ন সংসারী হবে না, অথচ গোরী স্বাধীনা হবে। কেমন করে তা হলে তাদের সামঞ্জস্য হবে? গোরীর অসংসারিত্বে না রত্নর সংসারিত্বে?

রত্ন ভাবছিল। প্রভাত তার পরীক্ষার পড়া সরিয়ে রেখে নিচু গলায় গল্প বলতে বসল। এমন সব গল্প যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। আরব্য রজনীর মতো অশ্লীল, অথচ ভারতীয় রজনীর ঘটনা। যাদের সঙ্গে যাদের যোজনা তারা সবাই প্রভাতের চেনা মহলের। তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে আপোসে বা গোপনে। তাতে কোনো পক্ষই বঞ্চিত হয়নি। স্বামীরাও বদলি পেয়েছে। প্রেমিকরাও সংসারী হয়েছে। বিয়ে ভেঙে যায়নি। আবার ছাঁদনাতলায় যেতে হয়নি। রক্ষিতা হতে হয়নি। বন্ধ্যা থাকতে হয়নি। অথচ সন্তানের অঙ্গে কলঙ্কও লাগেনি। সব দিক রক্ষা হয়েছে। সকলেই সুখী।

রত্ন কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই। আমি চাই অবিভক্ত সমগ্র নারী। সেও পাবে অবিভক্ত সমগ্র পুরুষ। এই ভিত্তির উপর দাঁড়াবে পরিপূর্ণ নরনারী সম্পর্ক। শ্রমবিভাগ এ ক্ষেত্রে খাটে না। ওটা মিথ্যা লজিক।'

'অমন করে কাঁপছ কেন? শীত করছে? নাও, নাও এই পশমিনাটা নাও। গায়ে জড়াও।' প্রভাত তার কাঁপুনির অন্য কারণ অনুসন্ধান করল না।

রত্ন জাকিয়ে বসল। সে জানত প্রভাতের মনের কোণে একটা কমপ্লেকস ছিল। সেটা এক কথায় এই যে, শ্রদ্ধার পাত্রীকে সম্ভোগ করা যায় না, সম্ভোগের পাত্রীকে শ্রদ্ধা করা যায় না। একবার সে বলেছিল, 'আমার

গুরুজন যদি আমার বিয়ে দিতেন আর আমার বৌ যদি হত সত্যিকারের দেবী তা হলে আমি তাকে সারা জীবন পূজা করে যেতুম, কিন্তু কোনো দিন তার গায়ে হাত দিতুম না। আমাকে দায়ে পড়ে আর কারো দিকে তাকাতে হতো যাকে আমি ভয় করতুম না, ভক্তি করতুম না, অসঙ্কোচে বিনা অনুমতিতে ভোজন করতুম।'

শুনতে কালাপাহাড়ের মতো, কিন্তু আসলে এটা মান্ধাতার আমলের সংস্কার। এবং এটারই উপরে দাঁড়িয়েছে তার নিঃশ্বাস উড়িয়ে দেওয়া পরিকল্পনা। আগে ছিল দ্বয়ী। এখন হয়েছে ত্রয়ী। এর নাম সংস্কারমুক্তি নয়। প্রকৃত সংস্কারমুক্তি হচ্ছে কামনার পাত্রীকে শ্রদ্ধা করতে শেখা, শ্রদ্ধার পাত্রীকে কামনা করতে কুণ্ঠিত না হওয়া।

প্রভাত বলল, 'আমি তোমার প্রেমে বাধা দিচ্ছিনে। আমার বক্তব্য হলো তুমি ওর সঙ্গে সীমা মেনে চলবে। ওর মধ্যে প্যাশন এত বেশী আর তোমার মধ্যে প্যাশন এত কম যে সমাজ যদি বাধা না দেয় আমরা তোমাদের বন্ধুরাই বাধা দেব।'

রত্ন চমকে উঠে সামলে নিয়ে বলল, 'আমার সাধনা হচ্ছে রসের সাধনা। সেই সঙ্গে রূপের সাধনা। রস থেকে আসবে রূপ। আমাকে রূপান্তরিত করবে। রূপান্বিত করবে। কায়া না থাকলে রূপ রাখব কোথায়? রূপ তো নিরাকার নয়। প্রতিমাপূজার পক্ষে সব চেয়ে জোরালো যুক্তি প্রতিমা না থাকলে রূপ রাখবার আধার থাকে না। কায়া থাকবে, তাতে রূপ থাকবে, এই পর্যন্ত যদি মেনে নাও তবে যার জীবন্যাস হয়েছে তেমন প্রতিমাকে তুমি লীলা করতেও দেবে। আমরা জীবন্ত প্রতিমা। তারই প্রতিমা।'

'প্রেমকে তুমি অত সীরিয়াস ভাবে নিচ্ছ কেন? আর কেউ কি কোনো দিন প্রেমে পড়েনি? আমরা প্রত্যেকেই এক আধ বার এর ভিতর দিয়ে গেছি। যাওয়া ভালো। কিন্তু মাথা হারানো ভালো নয়। তোমার বাস্তববোধ নেই।' প্রভাত সস্নেহে অনুযোগ করল।

'আমার কাছে', রত্ন বলল তন্ময় হয়ে, 'প্রেম হচ্ছে পূজা। এর চতুরঙ্গ উপচার দেহ মন হৃদয় আত্মা কোনো একটি অঙ্গ বাদ পড়লে অঙ্গহানি। বিভিন্ন উপচার বিভিন্ন দেবতার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় না। পূজা যেমন একটি দেবতাও তেমন একটিই। আমরা যে যার দেবতা পেয়ে গেছি। আর খুঁজতেও চাইনে, হারাতেও চাইনে। সমাজবন্ধ সম্পর্ক কেন? সমাজের বাইরে কি আর কেউ আছে? মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই। ভক্তি আর প্রেম আর কামনা আর ভোগ সব ওই একজনকে ঘিরে। মীরার বেলা সে ছিল পুরুষ। আমার বেলা সে নারী। সে যদি আমার হয় তো আর কোনো

নারী আমার নয়। আমার না হয় তো আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব। যা ছিল আমার পূর্বকল্পনা।'

প্রভাত খানিকটা মেনে নিয়ে বলল, 'তোমার হতে পারে, কিন্তু তোমারই হবে এটা দুরাশা। ওর স্বামীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়। একজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না হলে যদি আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না হয় তবে তুমি যা করতে চেয়েছিলে তাই কর। আরো পশ্চিমে চলে যাও। ওর মুক্তির দায় আমরা অন্যান্য বন্ধুরা নেব। বিবাহের কাঠামো ঠিক রেখে তার ভিতরে যতটা মুক্তি আঁটে ততটা মুক্তি ও আদায় করে নেবেই। ও কি সামান্য মেয়ে! ও রাধা কি দ্রৌপদী, এ যুগে জন্মান্তর নিয়েছে।'

রত্নর মাথায় ঘুরছিল, 'ওর মধ্যে প্যাশন এত বেশী আর তোমার মধ্যে প্যাশন এত কম যে সমাজ যদি বাধা না দেয় আমরা তোমাদের বন্ধুরাই বাধা দেব।' এর একটা জুৎসই উত্তর হাতের কাছে খুঁজে না পেয়ে সে ভারি অসহায় বোধ করছিল। তথ্যের সঙ্গে তো তর্ক করা চলে না। নাকাল হলে তথ্যকে যারা উড়িয়ে দেয় রত্ন তাদের একজন নয়।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় প্রভাত তার আপন কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছিল। রত্নর হুঁশ হলো যখন তখন শুনতে পেল প্রভাত বলছে, 'সন্ন্যাসিনীকে ভগিনী বলে ডাকতে হয়। আমিও ডাকি। কী যন্ত্রণা বল দেখি! যদি ওকে বিয়ে করি—ওদের সঙ্ঘে তার নজির আছে—বিয়ের পরে ও আমার ঘরে আসবে না, ওকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না। সঙ্ঘের মেয়ে সঙ্ঘেই থাকবে। ওটাই ওদের সঙ্ঘের নিয়ম। দেবজন্ম হবে, অথচ তার জন্যে হরপার্বতীকে মিলতে দেওয়া হবে।'

রত্ন গরম হয়ে বলল, 'তা তুমি মরতে ওখানে প্রেমে পড়তে গেলে কেন?'

প্রভাত মুচকি হেসে বলল, 'তার আগে তুমিই বল মেয়েরা সাধুসন্ন্যাসী দেখলে পতঙ্গের মতো ছুটে যায় কেন? গুরু গুরু করে পাগল হয় কেন?'

রত্ন কী যেন বলতে যাচ্ছিল, প্রভাত তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'সেদিন চোখে পড়ল টলস্টয় বলেছিলেন গোর্কীকে—'Not that a woman is dangerous who holds a man by his·· but she who holds him by the soul' মাঝখানের ডটগুলো আমার নয়।'

শরমে কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছিল না। দু'জনেরই মুখ শিমুল ফুলের মতো লাল। প্রভাত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। বলল, 'যোগিনীর প্রেমে পড়ে আমাকে সারা জীবন যোগী হতে হবে দেখছি। নয়তো একজনকে ভালোবেসে আরেকজনকে বিয়ে করতে হবে। যা সকলে করে। রতন, তুমি হলে কী করতে? গৌরী যদি যোগিনী হতো তুমি কী হতে?'

ওটা একটা চ্যালেঞ্জ। রত্ন ঘেমে উঠে বলল, 'আমিও যোগী হতুম।'

'দূর মিথ্যুক! যার মধ্যে প্যাশন অত কম সে যোগী হতে পারে না। তার জন্যেও প্যাশন লাগে। গোরী ইচ্ছা করলে যোগিনী হতে পারে, ভোগিনী হতেও পারে। তুমি পার না। ও মেয়ে তোমাকে ভোগেও হারাবে, যোগেও হারাবে। ও যদি আর্টিস্ট বা ইনটেলেকচুয়াল হয় তা হলেও তুমি ওর কাছে হারো। রতন কেবল একটি বিষয়ে তুমি জিততে পার। হৃদয়ভরা ভালোবাসায়। তোমার হৃদয়টি সোনা দিয়ে তৈরি। সোনালী হৃদয়। গোরী তোমার কাছে হারে তো ওইখানেই হারবে।'

রত্ন অভিভূত হয়েছিল। আবেগের সঙ্গে বলল, 'আমি ওর কাছে সব বিষয়ে হারতে রাজী। ও আমাকে সর্বতোভাবে জিতে নিক। ওর নামেই আমার নাম হোক। চাঁদের মতো আমি হই সূর্যের আলোয় আলোময়। কান্তার রূপে কান্তিমান।'

প্রভাত তার কানে টান দিয়ে বলল, 'এসব কথা পুরুষের মুখে মানায় না। পুরুষের মতো পুরুষ হতে হবে তোমাকে। নয়তো মেয়েরা তোমাকে নামঞ্জুর করবে। গোরীও।'

॥ পাঁচ ॥

যূথিকার এক চোখ ছিল জুলির উপরে, আরেক চোখ মিলির উপরে। মিলির মুখে একটুখানি গোলাপী আভা। জুলির মুখ টকটকে লাল।

"এই মেয়ে!" জুলি বলে মিলিকে, "বিপ্লবের দিন তুমি থাকবে বিলেতে। শত্রুপক্ষের খাস তালুকে। এর নাম কী, জানো? বিশ্বাসঘাতকতা। এর সাজা কী, জানো? ফায়ারিং স্কোয়াড।"

মিলি শিউরে ওঠে। "জুলি! তুমি দেখছি এখন থেকেই মারমুখো। লেনিন যখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা করতেন তখন তুমি থাকলে তাঁকেও ভয় দেখাতে। আমিও যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা করব না তা নয়। বিপ্লবীরা বরাবরই ইংলণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে ও পেয়েছে। মনে করো আমিও যাচ্ছি আশ্রয় নিতে। এদেশে থাকলে তো নির্ঘাত জেল।"

"জেল!" জুলি অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, "জেল! তুচ্ছ জেল! তাকেই এত ভয় যে তুমি জাহাজে চড়ে পালাবে। কেন, আমি কি বলিনি যে জনতা এসে জেল ভেঙে উদ্ধার করবে? চারদিকে রব উঠবে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আর তখন কিনা তুমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পুঁথি পড়ছ।"

"ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দিন লেনিনও তো পেট্রোগ্রাডে ছিলেন না। তখন তিনি সুইজারলণ্ডে। জার্মান শত্রুরাই ওঁকে ওদের স্পেশাল ট্রেনে করে রাশিয়ায় পেঁছে দেয়। এ রকম যে হবে তা কি তুমি সেদিন থাকলে জানতে? জানলে ক্ষমা করতে? তুমি বলতে লেনিন জার্মানদের চর। ফায়ারিং স্কোয়াড ডাকতে। বিপ্লব যেদিন হবে সেদিন যদি আমি বিদেশে থাকি তবে ওরাই আমাকে ওদের স্পেশাল প্লেনে করে ভারতে পেঁছে দেবে! চর বলবে কতক লোক, কিন্তু পরে দেখবে আমারই জিৎ। কার সাধ্য আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করায়!" মিলি জ্বলে ওঠে।

"সব বিশ্বাসঘাতকেরই ওই একই যুক্তি। সবাই যেন এক একটি লেনিন। তার চেয়ে সোজাসুজি স্বীকার করলেই পারো যে তুমি বিপ্লবের ভয়ে পলাতক। ভয় পাবারই কথা। ওই যে একজন পাতি বুর্জোয়া উনি দশ বছর আগে থেকেই পলাতক হয়ে লণ্ডনে বসে আছেন।" জুলি দত্তবিশ্বাসের উপর কোপদৃষ্টি হানে।

"দশবছর কেন বলছ, জুলি? বারো বছর।" দত্তবিশ্বাস শুধরে দেয়।

"একই কথা। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। তবে তোমাকে আমরা বিশ্বাসঘাতক বলব না। তুমি বিপ্লবীদের একজন ছিলে না। নিতান্ত এক

সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী পুরুষ। তোমার স্বপ্ন নিচের শ্রেণীতে নামা নয়, উপরের শ্রেণীতে ওঠা। ইংলণ্ডই তোমার উপযুক্ত দেশ। জাতকে জাত ওরা তোমারই মতো স্নব। তোমার তো গার্ল ফ্রেণ্ডের অভাব নেই। মিলিকে নিয়ে তুমি করবে কী? বিয়ে?" জুলি রাগতভাবে বলে।

"বিয়ে!" দত্তবিশ্বাস গদগদভাবে বলে, "আমার মতো অভাগার তেমন সৌভাগ্য কি হবে! আমি চাইলে কী হবে, উনি রাজী হলে তো!"

"ওটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার, জুলি। এখন থেকে আমি আমার হাতের তাস দেখাব না। খেলবার সময় হলে খেলব। মিস্টার দত্তবিশ্বাস, এখন থেকেই ধরে নেবেন না যে আমি আপনাকে বা আর কাউকে বিয়ে করব। বা আদৌ বিয়ে করব। কিন্তু করতে চাইলে আমাকে রুখবে কে? বিপ্লবী নায়িকারা কি বিয়ে করেন না? রোজা লুকসেমবুর্গ কি বিয়ে করেননি? তাঁর স্বামীটি যে বিপ্লবী ছিলেন তা নয়। বিশ্বস্ত হলেই যথেষ্ট। সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী পুরুষও কি বিশ্বস্ত হতে পারে না? আমার কাছে একজন বিশ্বস্ত পুরুষের মূল্য অসীম। জুলির প্রতি দশ বারো বছর বিশ্বস্ত রয়েছেন দেখেই আমি চিনতে পেরেছি যে এটি একটি দুর্লভ রত্ন।" মিলি প্রকারান্তরে স্বীকার করে যে এমন রত্ন পেলে সে আঁচলে বেঁধে রাখবে।

যূথিকা বলে, "সৌম্যদা, আপনার কী মনে হয়? আমার তো মনে হচ্ছে জুলি মনঃস্থির করতে পারছে না সুকুমারদাকে ছাড়বে, না ধরে রাখবে।"

"মনঃস্থির করা শক্ত। সুকুমারকে প্রত্যাখ্যান করলে সুকুমার মধুমালতীকে বিয়ে করবে। তখন লোকে বলবে সুকুমারই মঞ্জুলিকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কী অপমান! অথচ সুকুমারের কী দোষ!" সৌম্য অভিমত দেয়।

"না, সৌম্যদা, তা নয়। সুকুমারদাকে আমি কি কোনোদিন আশা দিয়েছি যে আজ নতুন করে প্রত্যাখ্যান করলুম? উনি অন্য কাউকে বিয়ে করুন, আমি দারুণ খুশি হব। কিন্তু মিলি! ও যে আমার প্রিয় বান্ধবী। ও যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত তা হলে আমি পরম আনন্দিত হতুম। কিন্তু সুকুমারদাকে! না, না, এটা ভাবা যায় না, এ বিয়ে যদি হয় তবে আমি জানব যে মিলি বা সুকুমারদা কেউ আমার বন্ধু নয়। ওরা আমার সঙ্গে বন্ধুতার সুযোগ নিয়েছে।" জুলি বিষণ্ন সুরে বলে।

"অপূর্ব মনস্তত্ত্ব।" মানস মন্তব্য করে। "এ না হলে নারী! তুমি নিজে বিয়ে করবে না। দশবছর কেন, এগারো বছর ধরে চলেছে সাধ্য সাধনা। তবু মন গলছে না। যেই তৃতীয় এক ব্যক্তি মাঝখানে এল অমনি দেখা দিল চিরন্তন ত্রিভুজ। মিলি আর সুকুমার, তোমরা তাড়াতাড়ি মনঃস্থির করে ফ্যালো। মিলির যা রেকর্ড, জুলির আগেই মিলি বন্দী হবে। জুলি হয়তো ফেরার হয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাবে। কিন্তু মিলির কি সে সামর্থ্য

আছে! শরীর শক্ত নয়। দত্তবিশ্বাস, তুমি কালকেই ওর মা-বাবার সামনে বিয়ের প্রস্তাব পেশ কোরো। ও'রা যদি রাজী হন তা হলে শুভকর্মটা সমুদ্র যাত্রার পূর্বেই সমাধা হবে। তার পর লম্বা হানিমুন।"

"আহা, অত তাড়াহুড়ো কেন? আমাকেও একটু মনঃস্থির করতে সময় দিন। জুলিকে বঞ্চিত করে তার বরকে কেড়ে নিয়েছি বলে যে অপবাদ রটবে তার প্রতিকার না করেই যদি বিলেত চলে যাই তবে ওটা পলায়নের মতোই দেখাবে। জুলি, ভাই, তুমি আশ্বস্ত হও। বিয়ে আমি রাতারাতি করব না। পাত্রটিকে চিনলুম কবে যে চোখ বুজে বিয়ে করব? চিনতেও সময় লাগবে। না সমুদ্রযাত্রার পূর্বে শুভকর্ম নয়। সমুদ্রযাত্রা আমি আত্মরক্ষার জন্যেই করব। মিস্টার দত্তবিশ্বাসকে সাথী পাওয়া যাবে বলে নয়। বিয়ের কথাবার্তা চলবে, কিন্তু বিয়েটা কোথায় ও কবে হবে, আদৌ হবে কি না, সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। জুলিকেও পুনর্ভাবনার জন্যে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হবে। সে যদি চিঠি লিখে জানায় যে সে তার সুকুমারদাকে বিয়ে করতে রাজী তা হলে আমি তক্ষুনি সরে দাঁড়াব। বন্ধুর বরকে চুরি করার অপবাদ আমি সহ্য করব না। আমি তো আশা করছি জুলি নিজেই একদিন আমাদের বিয়েতে মত দেবে। যখন বুঝবে যে আমরা ওর সুখের অন্তরায় নই।" মধুমালতী ধীর গম্ভীরভাবে বলে।

মানস হেসে বলে, "তবে সমুদ্রবক্ষে লম্বা হানিমুন নয়, দীর্ঘ কোর্টশিপ। দত্তবিশ্বাস, আই এনভি ইউ।"

একথা শুনে যূথিকা পালটা দেয়, "মিস মুস্তাফী, আই এনভি ইউ।"

জুলির অবস্থা তখন ফুটো বেলুনের মতো। সৌম্যদার দিকে হেলে ওর কানে কানে বলে, "বিধবার বিয়ে কি পাপ?"

"কে বলে পাপ? মহাত্মাজী তো আজকাল বালবিধবা দেখলেই তার বিয়ের সম্বন্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তো ছেলের বিয়ে দিয়েছেন বালবিধবার সঙ্গে। ব্রাহ্মসমাজে তো এটা বহুদিন থেকেই চলতি। তুমি ব্রাহ্মসমাজেই জন্মেছ। হিন্দুমতে যদিও তোমার বিয়ে। বিদ্যাসাগর মশায় তো বিধান দিয়ে গেছেন যে হিন্দুর মেয়েরও আবার বিয়ে হতে পারে। তিনি নিজের ছেলের বিয়ে দেন এক বিধবা কন্যার সঙ্গে। না, জুলি পাপ নয়। তোমার ওই মিথ্যে পাপবোধ কাটিয়ে ওঠ। মিলি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তবে কোর্টশিপ যদি বেশীদিন গড়ায় সুকুমার আর পিছু হটবে না। হটলে সেটা অনারেবল হবে না।" সৌম্য পরামর্শ দেয়।

"অনারেবল যদি বল, আমার পক্ষেও কি অনারেবল হবে আমি যদি দশ বছর বিধবার মতো থেকে হঠাৎ সধবা সাজি? এয়োরা কেউ নেবে আমাকে তাদের দলে? লোকে মুখ ফুটে না বলুক মনে মনে বলবে না অসতী?

বিপ্লবী দাদারাও আমার সতীত্বে সন্দেহ করবেন। রানী কমলিনীর মতো আমাকেও আত্মগোপন করতে হবে বিলেতে।" জুলি বলে।

"বিলেতে আমরা তো তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতুম।" সৌম্য বলে।

"বিলেতের আবহাওয়ার গুণে। এদেশে থাকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে কি না অপ্রমাণিত। এদেশে সধবারা বিধবা হয়, কিন্তু বিধবারা সধবা হয় না। হলে আড়ালে আবডালে থাকে। প্রকাশ্য সভাসমিতিতে নামে না। আমাকে তা হলে দেশের কাজ ছাড়তে হয়। বিপ্লবের দিন আমারও কি কোনো ভূমিকা থাকবে না?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"থাকবে না কেন? নিশ্চয় থাকবে।" সৌম্য আশ্বাস দেয়। "লোকে শ্রদ্ধাও করবে। বীরত্বের পরিচয় যদি পায়। সধবা কি বিধবা এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন যাঁরা তাঁরা সমাজপতি শ্রেণীর লোক। তাঁদের বিরুদ্ধেই তো বিপ্লব।"

"কী আশ্চর্য! তুমিও বিপ্লবে বিশ্বাস করো!" জুলি উৎফুল্ল হয়।

"কেন করব না? আমরাও তো বিপ্লবের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি। আমাদেরও ভরসা জনগণ। কিন্তু তারা প্রাণ বিসর্জন করবে, প্রাণ নাশ করবে না। তোমরা মেরে মরবে, আমরা মারব না, মরব। আমাদের সাধনা আরো কঠোর। যদি সিদ্ধিলাভ করি আমাদের সিদ্ধিও হবে আরো গৌরবময়। তোমাদের বীরত্বের আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু আমাদের বীরত্ব আরো উচ্চ স্তরের।" সৌম্য বিনম্রভাবে বলে।

"তোমাদের পথ সময়সাপেক্ষ। আমাদের হাতে অত সময় নেই, সৌম্যদা। সুযোগ হাতছাড়া হলে আর ফিরবে না। অবশ্যই কিছু রক্তপাত হবে। সেটা দু'তরফা। তার জন্যে আমরা দুঃখিত। ইংরেজদের মহত্ত্বের পরিচয়ও তো আমি পেয়েছি। তা বলে কি ওদের দাসত্ব আর সহ্য হয়?" জুলি আবার তেজস্বিনী।

ডিনারের পর যূথিকা বলে, দশবছর পরে চারজন একত্র হয়েছ তোমরা। আবার কবে হবে কে জানে। এস, চারজনে মিলে তাস খেলো।"

সৌম্য বলে, "আমি তাস খেলিনে। আমাকে বাদ দাও।"

জুলি বলে, "আমি তাস খেলি, কিন্তু আজ আমার সে মুড নেই। কেন, বুঝতেই পারছ।"

তখন দত্তবিশ্বাসের পার্টনার হয় যূথিকা, আর মানসের পার্টনার মধুমালতী। ব্রিজ খেলায় দত্তবিশ্বাসের ওস্তাদি আছে। চড়া স্টেকে খেলে। হারে যত তার চেয়ে জেতে ঢের বেশী। ওর আয়ের একটা প্রধান উৎস হলো ব্রিজ। আজ কিন্তু স্টেক রাখতে মানা।

"মানা! মানা! সব কিছুতেই মানা। স্টেক রাখতে মানা। বিষ

খেতে মানা। তবে আমি খেলা দেখাব কী করে?" দত্তবিশ্বাস অনুযোগ করে।

"আমরা খেলা দেখতে চাইনে। খেলা করতে চাই।" মধুমালতী উত্তর দেয়।

"নইলে আজ দুই পরিবারের সঞ্চয় লুট হয়ে যায়।" যূথিকা হুঁশিয়ারি দেয়।

"এক পরিবারের লুটের মাল অর্ধেকটা ফিরে আসবে। কিন্তু অপর পরিবারের অর্ধেকটা ফিরবে কি না কে বলতে পারে। সব নির্ভর করছে সেই পরিবারের গুরুজনের সম্মতির উপর।" মানস এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত।

মধুমালতী আরক্ত হয়। "ওটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার।"

জুলির ভালো লাগছিল না। সে বলে, "চলো, সৌম্যদা, বাইরে গিয়ে বসা যাক। তোমার সঙ্গে একরাশ কথা আছে। কবে আবার দেখা হবে কে জানে।"

বিশাল বারান্দার একপ্রান্তে ওরা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। আকাশের দিকে মুখ। আকাশে তখন চাঁদ নেই, নক্ষত্রের মেলা। তারাগুলো এত স্পষ্ট আর এত কাছে যে হাত বাড়ালে গাছ থেকে পেড়ে আনা যায়।

"রোজ রাত্রে আমি আকাশের তলায় শুই। নক্ষত্রলোকের সঙ্গ পাই। ভুলে যাই পৃথিবীর দুশ্চিন্তা। যুদ্ধ বলো, বিপ্লব বলো, সবই তো সাময়িক।' সৌম্য বলে।

"ইতিহাসের সমস্তটাই তো সাময়িক, সৌম্যদা। মহাকালের তুলনায় তিন হাজার বছরের ভারত ইতিহাস তো কালকের দিনের খবরের কাগজ। তা বলে কি তার গুরুত্ব কিছু কম? আমরাও ইতিহাস তৈরি করে যাচ্ছি। কালকের দিনের জন্যে। নইলে আমার জীবনের মূল্য কী?" জুলি জানতে চায়।

"আমারও সেই এক জীবনজিজ্ঞাসা। কিন্তু তোমার মতো আমি ইতিহাসের জীবনই। আমি টাইম-স্পেসের ভিতরেও আছি, তার বাইরেও আছি, আমি অমৃতের সন্তান। একদিন তোমারও এই উপলব্ধি হবে।" সৌম্য আশ্বাস দেয়।

"তোমার সঙ্গে দেখা হলে জীবনজিজ্ঞাসার কথা ওঠে। কথা ওঠে নীতিজিজ্ঞাসার। আমিও কত বড়ো হয়ে যাই। কিন্তু তোমাকে তো সব দিন পাইনে। পাবও না। যাদের সঙ্গে মেলামেশা তারা কেউ সময়ের ঊর্ধ্বে উঠতে চায় না। পারেও না। আমিও তাদেরই একজন। তোমার কাছে প্রথম ও শেষ বস্তু অমৃত ও অমৃতের সন্ধান। যাতে তোমাকে অমৃত না করবে তা নিয়ে তুমি কী করবে? আমার কাছে ওসব নিছক তত্ত্বকথা।

মানুষের দুঃখ দুর্দশাই আমাকে বিচলিত করে। আমি চাই এমন কিছু ঘটুক যাতে মানুষের সব দুঃখদুর্দশা এক রাত্রের প্লাবনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।" জুলি কাতরভাবে বলে।

"দুলালেরও সেই ধ্যান ছিল। দুলাল দেখছি তোমার মধ্যে বেঁচে আছে। ওর কথা কি তোমার মনে পড়ে?" সৌম্য অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করে।

"পড়বে না? ওঁর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়েছিল। যদিও সেটা ওঁর মতে একরকম শিকল পরানো। সোনার শিকল। উনি যেন ইচ্ছে করেই শিকল কাটিয়ে গেলেন। সব মনে আছে, সৌম্যদা! কিন্তু সব ভুলে যেতে চাই। তাই তো কাজের মধ্যে ডুবে থাকি। জানি সাময়িক। তবু মূল্যবান।" জুলি তার মনের ঢাকা খোলে।

"দুলাল বিয়ে না করেই বিলেত যেতে চেয়েছিল, ওর বাবা তাতে নারাজ। তিনি আর সব বিষয়ে একেলে হলেও ওই একটি বিষয়ে সেকেলে। তাঁর ধারণা বিয়ে না করে বিলেত গেলে ছেলে মেম বিয়ে করে ঘরে ফিরবে। দুলাল বিলেত যাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল, চাপে পড়ে বিয়ে করল। কিন্তু ওর বিবেক ওকে একমুহূর্তও সোয়াস্তি দিল না। তোমার উপরে ওর বিরাগ ছিল না, ছিল বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাব। বিবাহটা ও মেনে নিতে নারাজ। বাপ-বেটার গৃহযুদ্ধে তুমি হলে উলুখড়।" সৌম্য দরদের সঙ্গে বলে।

"আমি কেমন করে জানব বিয়েতে ওঁর অনিচ্ছা ছিল? জানলে কি আমি বিয়ে করতে রাজী হতুম? যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। ওঁর বাবারও তো অনুশোচনার অন্ত নেই। আমাকে মোটা মাসোহারা পাঠান। ফিরিয়ে দিতে চাই, কোন সুবাদে নেব? কিন্তু না নিলে তাঁর জীবন দুর্বহ হবে। কাজ কী ওঁকে আরো কষ্ট দিয়ে? নিই, কিন্তু নিজের জন্যে নয়। কমরেডদের প্রয়োজন মেটাই।" জুলি সাফাই দেয়। তার বিবেকের সাফাই।

"দুলাল চেয়েছিল স্বামীস্ত্রীর মিথ্যা অভিনয় থেকে মুক্তি পেতে ও মুক্তি দিতে। তোমাকে ও মুক্ত করে দিয়ে গেছে, জুলি। তুমি সমাজের চোখে বিবাহিতা, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে অবিবাহিতা। কেন তবে সম্পর্কটার জের টেনে যাচ্ছ? মাসোহারা নেওয়াটাও জের টেনে চলা। তোমার শ্বশুর অবশ্য তাঁর পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কের জের টেনে চলেছেন। সেটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার পক্ষে মিথ্যার অভিনয়। ওঁর মনে যাতে আঘাত না লাগে সেকথা ভেবে তুমি ওঁর টাকা নিচ্ছ, কিন্তু নিজেও বাঁধা থাকছ। দ্বিতীয়বার বিবাহে আমি তো কোনো নীতিগত বাধাই দেখছিনে। তুমি যদি সুকুমারের প্রস্তাবে রাজী থাক তবে এখনো সময় আছে। কাল কিন্তু থাকবে না। কালকেই মিলির জন্যে বাস রিজার্ভ করা হবে। অবশ্য ওর মা বাবা

যদি সম্মতি দেন।" সৌম্য অনুভব করে জুলির জন্যে কত বড়ো শক অপেক্ষা করছে।

"সৌম্যদা, তোমার কাছে আমার গোপন কিছু নেই। তোমাকেই আমি সব চেয়ে বিশ্বাস করি।" বলতে বলতে জুলির গলা ধরে আসে। "সুকুমারদা আমাকে আজ যে শক দিয়েছেন তা আমাকে থ করে দিয়েছে। আমি যদি ওঁকে বিয়ে না করি উনি মিলিকে বিয়ে করবেন। মিলি যদিও ঝট করে কথা দিচ্ছে না তবু আমি বেশ বুঝতে পারছি ও ভিতরে ভিতরে উল্লসিত। তুমি দেখবে কালকেই ও বাগ্দান করবে। বিয়েটা হয়তো এদেশে হবে না, কিন্তু ওদেশে হতে কতক্ষণ? তার মানে সুকুমারদাকে আমি চিরকালের মতো হারাচ্ছি। ওঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নয়, কিন্তু বিয়ে তো করেননি আর কোনো মেয়েকে। অপেক্ষা তো করে এসেছেন আমার সম্মতির জন্যে। এগারো বছর তো একটা যুগ বললেও চলে। প্রস্তাবও তো করলেন এই নিয়ে তিনবার। একবার বিলেতে, একবার বন্দীশালা থেকে মুক্তির পর, একবার এই সম্প্রতি পদ্মার স্টীমারে। জানি উনি আমার অশেষ উপকার করেছেন ও করবেন। প্রতিদানে আমারও তো কিছু করণীয় আছে। কিন্তু সে কি বিয়ে? না, দাদা, আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। বিয়ে আমি কাউকেই করব না। আমি ঘরপোড়া গোরু। সিঁদুর হচ্ছে সিঁদুরে মেঘ। সিঁদুর পরতে আমি ডরাই।"

"তা হলে তুমি মিলির জন্যে সকুমারকে ছেড়ে দাও। মিলির হাতে সুকুমারকে তুলে দাও। সুকুমারের প্রতি সেটাই তোমার করণীয়। সেটাই সব চেয়ে বড় উপকার। জানি তোমার মন এর জন্যে তৈরি ছিল না। হঠাৎ মিলির সঙ্গে সুকুমারের সংযোগ তোমাকে চমকে দিয়েছে। তুমিই তো একজনকে নিয়ে এলে আরেকজনের বাড়ী। তুমিই তো ওদের আলাপ করিয়ে দিলে। তোমারই তো এ ঘটকালি। তোমারই তো খুশি হওয়া উচিত যে মিলির মতো বান্ধবীর একটি বর জুটল। আর সুকুমারের মতো বন্ধুর একটি বৌ জুটল। তার পর ওদের ভাগ্য ওদের হাতে। মিলি ওদেশে না যেতেও পারে, সুকুমার এদেশে থেকে যেতেও পারে, মুস্তাফীদের একজন ঘরজামাই হলে ভালো হয়, যার হাতে ওঁরা রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব সঁপে দেবেন। হ্যাঁ, বলেছেন আমাকে একথা। অনেকদিন আগে। তখন আমিই বোধ হয় ছিলুম তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু এ-মহাদেবের তপোভঙ্গ ও-পার্বতীর অসাধ্য। মিলি যদিও হিংসার পথ থেকে বেশ কিছুদূর সরে এসেছে।" সৌম্য মুখ টিপে হাসে।

"তবে তুমিই ওকে বিয়ে করে পুরোপুরি অহিংসাবাদী করো না কেন? গান্ধীজীর যেমন কস্তুরবা তোমার তেমনি মধুমালতী দেবী।" জুলি সীরিয়াসভাবে বলে। "তা হলে তো আমার কোনো খেদই থাকে না।"

"কেন, খেদ তোমার কিসের? চির অনুগত জনকে হারাচ্ছ বলে? এগারো বছরের সম্পর্ক কাটিয়ে উঠতে পারছ না বলে?" সৌম্য সহানুভূতির সঙ্গে বলে।

"না, মিলির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। তুমি আর মিলি রাজযোটক। মিলি আর সুকুমারদা সম্পূর্ণ বিপরীত ধাতু দিয়ে গড়া।" জুলি সুনিশ্চিত।

"মুস্তাফীরা ভালো করেই জানেন যে জেলে যাবার জন্যে আমি সদলবলে প্রস্তুত হচ্ছি। মিলি যদি আমার কস্তুরবা হয় তাকেও জেলে যেতে হবে। ওর মা-বাবা সেটাকে ভয় করেন। আর তাঁদের ওই অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে করবই বা কী? আমার পৈতৃক সম্পত্তির মতো আরো একটা ট্রাস্ট? গান্ধীজীর ট্রাস্টীশিপ থিওরির অনুসরণ?" সৌম্য ব্যাখ্যা করে।

"সেও মিলির পক্ষে ভালো। কিন্তু বিলেত ফেরৎ জামাই নিয়ে ওঁরা করবেন কী? যদি এদেশে ওর মন না বসে। ও একদিন উড়ে যাবেই। মিলি যদি ওর সঙ্গে উড়ে যেতে না চায় বা না পারে তা হলে বিচ্ছেদ অবধারিত। আর সে মিলনই বা কোন্ সুখের হবে? সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে বিপ্লববাদীর গরমিল অনিবার্য।" জুলি লিখে দিতে পারে।

"আচ্ছা, জুলি, তোমরা কেউ যদি ওকে বিয়ে না করো তবে ও বেচারি যাবে কোথায়? ওদেশেই বিয়ে থা করে দেশকে ভুলে যাবে। চিরকাল তো অপেক্ষা করতে পারবে না। ওর তো তেমন কোনো ব্রত নেই, যেমন আছে আমার। ফিরে গিয়ে এবার ও বিয়ে করবেই। মিলিকে না হোক আর কাউকে।" সৌম্য অনুমান করে।

জুলি একটু গুছিয়ে নিয়ে বলে, "মা আমাকে জানতেই দেননি যে তিনি খবর পেয়েছেন যুদ্ধ বাধার মাসখানেকের মধ্যেই শতখানেক পুরনো রাজবন্দীকে আবার ধরে নিয়ে জেলে পোরা হবে ও তাদের তালিকায় আমারও নাম থাকবে। তিনি হন্তদন্ত হয়ে বিদেশে সুকুমারদাকে চিঠি লেখেন। সে যেন ওদেশের কলেজে আমার ভর্তির ব্যবস্থা করে ও অবিলম্বে দেশে ফিরে এসে ভর্তির প্রমাণ দেখিয়ে আমাকে ওদেশে নিয়ে যায়। চিঠিতে অবশ্য এমন কোনো কথা ছিল না যে যাবার আগে বা পরে আমার সঙ্গে বিয়ে হবে। তার জন্যে চাই আমার মতামত। আমি তো আরেক পরিবারের বৌ। মা আমাকে না বলে ও কথা লিখতে পারতেন না। তাঁর লক্ষ্য আমার নিরাপত্তা। সেটুকু সম্ভব হলে বাকীটা সুকুমারদার উদ্যোগিতা আর আমার ইচ্ছা।"

সৌম্য হেসে বলে, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মী। গৃহলক্ষ্মী।"

"সংস্কৃত বুঝিনে। মানে কী ওর?" জুলি শুধায়।

"উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ হয়। এক্ষেত্রে গৃহলক্ষ্মী।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"সুকুমারদার বোধ হয় সেই ধারণাই ছিল। সে সত্যি সত্যি ভর্তির কাগজপত্র নিয়ে এসে হাজির। টাকাও আগাম দিয়ে এসেছে। জাহাজও বুক করা হয়েছে। মা তো মহা খুশি। জানো তো মেজদির বর স্ট্যান্ডিং কাউনসেল। তিনি সরকারের পেয়ারের লোক। সুকুমারদাকে নিয়ে যান পুলিশ কর্তার দফতরে। তালিকা থেকে ওরা আমার নাম কাটতে রাজী হয়। সেটা কিন্তু দেশ ছেড়ে রওনা হবার পরে। কিন্তু আমি তো তেমন কোনো অঙ্গীকার করিনি যে বিপ্লব হলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব না। ঝাঁপ দেবার জন্যেই আমি তৈরি। ওরা যদি পারে তো আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। জনতা যদি পারে তো আমাকে জেল ভেঙে খালাস করে নিয়ে আসবে। বিলেত গিয়ে নিরাপদ হওয়ার আমি কোনো তাৎপর্য বুঝিনে। আর তার মাশুল যদি হয় বিয়ে সেটা তো আরো অর্থহীন।" জুলি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

"কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে তোমাদের বিপ্লবে তোমরা ছাড়া আর কেউ সাড়া দিল না। জনতা অসাড়। মাঝখান থেকে তোমাদেরই কারাদণ্ড। প্রাণদণ্ডও হতে পারে। যুদ্ধকালে বিপ্লব তো চরম রাজদ্রোহ। তোমাদের বাঁচাতে পারে একমাত্র কংগ্রেস। যদি কেন্দ্রে ক্ষমতা পায়। কিন্তু কংগ্রেসকেও তো তোমরা অমান্য করছ। গান্ধীজীর বিরুদ্ধেও তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ। যাতে তাঁর প্রভাব কমে আর তোমাদের নেতাদের বাড়ে। কিন্তু আপৎকালে সেই গান্ধীই তোমাদের ভরসা। না, জুলি, ওসব অবাস্তব পরিকল্পনা ত্যাগ করো। তা যদি করো তবে তোমাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে না, সুকুমারকে বিয়ে করতেও হবে না। ও তোমার প্যাসেজটা মিলিকে দেবে, তোমার নামের অ্যাডমিশনটা মিলির নামে করিয়ে নেবে। মিলি ওকে বিয়ে করবে কি করবে না সেটা পরে স্থির করবে। সেটা তোমার ভাবনা নয়। তোমার ভাবনা তুমি কী করে বাঁচবে, যদি বিপ্লব ব্যর্থ হয় বা কংগ্রেস অসমর্থ হয়। কংগ্রেস মন্ত্রীরা হয়তো অবিলম্বে গদী ছাড়বেন।" সৌম্য যতদূর জানে।

"আমরা কংগ্রেসের কল্যাণে মুক্ত হতে চাইনে। জনতার অভ্যুত্থানে মুক্তি পেতে চাই। তেমন সৌভাগ্য যদি আমাদের না হয় আমরা জেলের ভিতর থেকে লড়ব। প্রাণের ভয় এখনো আমার আছে, কিন্তু সেটাও ক্রমে ক্রমে যাবে।" জুলি বলে যায়, "তবে সব চাল বেচাল হয়ে যেতে পারে। নাৎসীদের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি। তারপরে জার্মানে ইংরেজে একজোট হয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধ। তখন আর ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ নয়। রাশিয়ার

দুর্যোগই ভারতের দুর্যোগ। তেমন দিন যদি আসে আমি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ব। মীরার মতো বৃন্দাবনেই আশ্রয় নেব আমি। কোনো এক কুঞ্জে গাইব। 'বৃন্দাবনকে কুঞ্জ গলিনমে তেরি লীলা গাঁসু।' বিপ্লব এগিয়ে আসবে না, পেছিয়ে যাবে কতকাল!" জুলি হতাশভাবে বলে।

সৌম্য অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "জুলি, তুমি তো একবার বৈষ্ণবী হয়ে বৃন্দাবনে আশ্রয় নিয়েছিলে। সে অভিজ্ঞতা প্রীতিকর হয়নি। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও যদি আশ্রয় নিতে চাও তো আমাকে একটা খবর দিয়ো। যদি জেলের বাইরে থাকি আমিই তোমার ভার নেব।"

"তা হলে তো আমি বর্তে যাই, সৌম্যদা! তোমার মতো নির্ভরযোগ্য আর কে আছে আমার!" জুলির কণ্ঠস্বরে ভাবাবেগের আভাস।

"কই, তুমি তো আমার খোঁজখবর রাখো না।" সৌম্য ক্ষোভ জানায়।

"আর তুমি। তুমি যেন আমার কত খোঁজখবর রাখো!" জুলি পালটা দেয়।

"কলকাতা হয়ে যাওয়া আসা করতে হয়। কিন্তু সেখানে থামিনে। সেইজন্যে কারো খোঁজ নেওয়া হয় না, শুধু কি তোমার!" সৌম্য কৈফিয়ৎ দেয়।

"ওঃ তোমার বান্ধবীদের কথা বলছ। হায়, তাঁদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ওই যে তোমার অলকনন্দা, যে তোমাকে বিয়ে করবে বলে ব্যাকুল হয়েছিল, ওর এখন তিনটি ছেলেমেয়ে। খাচ্ছে, দাচ্ছে, পরচর্চা করছে। তোমার বিরহে দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে। হবে না কেন? স্বামীর মোটা আয়। সলিড বুর্জোয়া। তবে এখনো গান নিয়ে পাগল। গানের আসরে ওকে প্রায়ই দেখতে পাই।" জুলি বলে।

সৌম্যর মনে পড়ে যায়। সেসব দিনের জন্যে মন কেমন করে। অলকনন্দা ওকে সত্যি ভালোবাসত। কিন্তু ওর দাবী ছিল সৌম্যকে ব্যারিস্টার হতে হবে। কলকাতায় বসতে হবে। শ্বশুরের প্র্যাকটিস তিনি তাকে দিয়ে যাবেন। এদিকে সৌম্য মুক্ত থাকতে চায় দেশকে মুক্ত করতে। প্রয়োজন হলে আজীবন। কে জানে হয়তো আমরণ। সত্যাগ্রহীকে মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হয়।

"অলকনন্দার সঙ্গে দেখা হলে বোলো আমি ওর ছেলেমেয়েদের দেখতে যাব একদিন। কিন্তু কবে তা আমার হাতে নয়। হঠাৎ সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে যেতে পারে। আমার এখানকার কাজের ভার কার উপর দিয়ে যাই সে এক সমস্যা। মিলির যদি খাদি ও কুটিরশিল্পে মতি থাকত ওকেই বলতুম দেখতে ওকে আশ্রমবাস করতে হতো না। আমরা মেয়েদের দিনের বেলায় কাজ করতে

দিই, কিন্তু রাতের বেলা থাকতে দিইনে। যদি না স্বামী স্ত্রী দু'জনেই আমাদের কর্মী হয়।" সৌম্য বুঝিয়ে বলে।

"তা মিলি তো তোমার দিকে এক পা বাড়িয়েই রেখেছে। একটু একটু করে এগোচ্ছে। সুকুমারদা হঠাৎ কোন্ দিক থেকে এসে দিগ্‌ভ্রম ঘটিয়ে না দিলে ও হয়তো মূর্তিমতী কস্তুরবা হতে পারত। মহাত্মাটি কে তা আমি উচ্চারণ করব না। হ্যাঁ, সৌম্যদা, এটাও একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তুমি তো দেশের স্বাধীনতা না দেখে নারীর পাণিগ্রহণ করবে না। ততদিন অপেক্ষা করবে কোন্ নারীর রূপ-যৌবন। এমনিতেই ও মেয়ের চেহারা যা হয়েছে তা সুকুমারদার মতো রাতকানার চোখেই চলনসই। তোমার জন্যে অপেক্ষা করলে ও চেহারা হতো নন্দলাল বসুর 'শবরীর প্রতীক্ষা'র বৃদ্ধা শবরীর মতো।" জুলি উপহাস করে।

"মিলিকে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে না, জুলি। তুমি যা ভেবেছ তা নয়। মিলির দিক থেকে যা আছে তা শ্রদ্ধা, তা প্রেম নয়। আর আমার দিক থেকে যা আছে তা বিশুদ্ধ কল্যাণকামনা। কিসে ওর কল্যাণ হয় সেই ভাবনা। বিপ্লব ওর মতো মেয়ের জন্যে নয়। ওর মতো মেয়েও বিপ্লবের জন্যে নয়। সন্ত্রাসকেই ও বিপ্লব বলে ভুল করেছিল। সে ভুল ভেঙেছে। এখন যাকে বিপ্লব বলে বোঝানো হচ্ছে সেও একপ্রকার অ্যাডভেঞ্চার। তাতেও যে ওর অন্তরের সায় আছে তা নয়। মুসলিম জনতার মারমূর্তিকে ওর প্রাণে ভয়। আছে তো এখানে দুটিমাত্র সাহেব। দুটিকে মেরেই কি ওদের উন্মাদনা থামবে? বর্ধিষ্ণু হিন্দুদেরও ওরা মেরে খতম করবে। মিলি তাই ও পথ থেকে সরে আসছে, কিন্তু গান্ধীজীর উপরেও ওর পুরোপুরি বিশ্বাস জাগেনি।" সৌম্য বলে।

"কী এতক্ষণ ধরে গুজগুজ ফিসফিস করছ তোমরা?" যূথিকা বারান্দায় বেরিয়ে এসে শুধায়। আমাকে ডামি করে সুকুমারদা যা খেলছে দেখবার মতো। কাউকে একটা হাতও নিতে দিচ্ছে না। তাসগুলো যেন ওর বোল মানে। যাকে যা করতে বলে তাই করে।"

তৃতীয়জনের আবির্ভাবে কথাবার্তায় ছেদ পড়ে যায়। সৌম্য জিজ্ঞাসা করে বাচ্চাদের কথা। যূথিকা আশ্বাস দেয় যে ওরা অকাতরে ঘুমচ্ছে। তা হলেও বার বার গিয়ে দেখে আসতে হচ্ছে মণিকে। মাকে ছাড়া ও শুতে পারে না।

জুলি লক্ষ করছিল যে দাদা ও বৌদির দুই ঘরে দুই বিছানা। মণি শোয় মায়ের সঙ্গে আর দীপক আলাদা খাটে। এ রকম ব্যবস্থা ও আর কোথাও দেখেনি। ওটাও কি একপ্রকার অসিধার ব্রত? সৌম্যদা না থাকলে প্রশ্ন করত বৌদিকে।

"আমি জানতে এলুম তোমাদের কালকের প্ল্যান কী। ডিনারে আসবে তো? আমাদের এখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।" যূথিকা বলে।

"আমাকে কাল আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। রাত্রে ফিরব না। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ো, বোন।" সৌম্য ক্ষমা চায়।

"তুমি নিশ্চয়ই থাকছ, জুলি।" যূথিকা ধরে নেয়।

"আমি ভাবছি সুকুমারদাকে এস্কর্ট না করে আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে কালকেই ফিরে যাব। ওর যতদিন ইচ্ছে, ততদিন এখানে থাকতে পারে। যে খেলাটাও খেলছে তা দেখবার মতো। সেটা কিন্তু তাস নয়, বৌদি। সেটা মন দেওয়া নেওয়া। কবি রবীন্দ্রনাথ কাকে লক্ষ করে ওসব লিখেছিলেন জানিনে, কিন্তু ওর বেলা অক্ষরে অক্ষরে খাটে। 'মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে। নূপুরের মতো ফিরেছি চরণে চরণে।' এখন ও যতদিন ইচ্ছে ফিরবে চরণে চরণে। তুমি আমাকেও বাদ দিয়ো, বৌদি। কালকের ডিনারটা জমবে আরো ভালো।" জুলি ক্ষমা চায়।

"আমি সত্যিই দুঃখিত, সৌম্যদা ও জুলি। ব্যাপার কী আমি ঠিক ঠাওরাতে পারছিনে। কেন তোমরা দু'জনেই এখান থেকে যাবে? জুলির বৈঠক তো আরো কয়েক দিন চলবে। আর তোমার গ্রাম পরিক্রমা কি এতই জরুরি যে তুমি মানসের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা না করেই বিদায় নেবে, সৌম্যদা? তা হলে, চল ওঘরে, তাস খেলা বন্ধ করে দিই।" যূথিকা বলে।

তাস খেলা বন্ধ হয়। সৌম্য আর মানস বসবার ঘরে গম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করে। জুলি আর যূথিকা শোবার ঘরে চটুল বিষয়ে আর সুকুমারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মধুমালতীর সঙ্গে বারান্দায়। সেখানে বসে ওরা সুখদুঃখের কথা বলে। আর কেউ শুনতে যায় না।

সুকুমার মধুমালতীর মুখোমুখি আসন নিয়ে মন খোলে। "আপনাকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব যেমন আমার, ফিরিয়ে দিয়ে যাবার দায়িত্বও তেমনি আমারই। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই যদি আপনি হোমসিক বোধ করেন তা হলে যুদ্ধকালে কেমন করে সেটা সম্ভব? যুদ্ধ হয়তো আর দু'বছর গড়াবে। আপনি আরো হোমসিক হবেন। কিন্তু টর্পেডোর ভয়ে যাত্রী-জাহাজ এ মুখো হবেই না। কী সাংঘাতিক বিপদ!"

"আবার দেখছি সেই বন্দীশিবিরের মতোই হলো। সেবার স্বদেশে। এবার বিদেশে। তফাতের মধ্যে আপনাকে কাছে পাব।" মধুমালতী বলে।

"কিন্তু আমাকে কন্‌স্ক্রিপ্ট করে কোথায় নিয়ে যায় কে জানে! তবে ওরা খুবই বিবেচক। বুঝিয়ে বললে বুঝবে। আমার চেনাজানা প্রভাব-শালী ব্যক্তির অভাব নেই। তবু আপনাকে সব রকম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত

থাকতে হবে। ওয়ার ইজ ওয়ার। ইংরেজরা নিজেরাই বিপন্ন।" সুকুমার হুঁশিয়ারি দেয়।

"বিয়ে যদি হয় তো স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর বিপদের ভাগী হওয়া, স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে আসা নয়। হোম্‌সিক তো আমি বন্দীশিবিরেও ছিলুম।" মধুমালতী বলে।

সাঁঝের অতিথি

ওরা দুই বন্ধু সান্যাল আর নন্দী ক্যাম্পটেবিলের দু'ধারে ক্যাম্পচেয়ার পেতে টুং টাং আওয়াজ করে ডিনার খাচ্ছে। শীতের সন্ধ্যা। তাঁবুর খুঁটিতে বাঁধা পেট্রোমাক্সের আলো রাতকে দিন করে দিয়েছে।

হঠাৎ আঁধারের এলাকা থেকে আলোর এলাকায় সবেগে পদপাত করলেন যিনি তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই খানসামা বেয়ারার দল তটস্থ ও স্তব্ধ। সান্যাল সবে পুডিংটা মুখে তুলেছে, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

"ও কে! তুমি। মুক্তা!" নন্দী শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়ায় ও চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "আমরা তো কবে তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছি। এরই নাম কি পাঁচটা?"

"না, ভাই, বসব না। আমাকে এখনি ট্রেন ধরতে হবে। কলকাতার লাস্ট ট্রেন। অনেক, অনেক ক্ষমা প্রার্থনা। শুধু তোমার কাছে নয়, তোমার বন্ধুর কাছেও। মিস্টার সান্যাল আই প্রিজিউম।"

সান্যাল ইতিমধ্যেই আসন ছেড়ে উঠেছে। বাউ করে বলে, "ঠিক যেন ডক্টর লিভিংস্টোন, আই প্রিজিউম। এই তেপান্তরের মাঠে আপনার আবির্ভাব যেন আফ্রিকার অরণ্যে স্ট্যানলীর উদয়! দেখছেন তো কোথাও জনমানব নেই। আটটা বাজতে না বাজতেই সব নিঝুম। কিন্তু নন্দী, তুমি তো কই ইনট্রোডিউস করে দিলে না?"

"আমার বন্ধু ত্রিদিব সান্যাল। অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আমার – বোন মুক্তাপ্রভা দেবী। কংগ্রেস নেত্রী, আর বছর মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। এই সেদিন মুক্তি পেয়ে দিকে দিকে সভা করে বেড়াচ্ছেন। যেন দিগ্বিজয় করছেন।" নন্দী পরিচয় দেয়।

"যতসব বাজে কথা।" মুক্তা সহাস্যে প্রতিবাদ করেন, "কিন্তু আর এক মিনিটও দাঁড়াতে পারব না। যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও তো চল ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। মিষ্টার সান্যাল আশা করি কিছু মনে করবেন না।"

"মনে করব, যদি আপনি কিছু মুখে না দিয়ে যান।" সান্যাল ট্রে বাড়িয়ে দেয়।

একমুঠো আখরোট বাদাম খদ্দরের ঝোলায় পুরে মুক্তা দেবী অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে নিষ্ক্রান্ত হন। সঙ্গে টর্চ হাতে করে নন্দী। ডাকবাংলার সীমানা ছাড়িয়েই স্টেশনের রাস্তা। সেখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। আরোহী দুজন গান্ধী টুপিধারী।

"তোমরা ফিরে যাও। আমি এইটুকু পথ হেঁটে যেতে পারব।" মুক্তা আদেশ দেন।

ট্রেনের সত্যি সময় ছিল না। দূর থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। জোরে জোরে পা চালিয়ে দেয় ওরা। চলতে চলতে কথা বলে যায়।

"চার বছর দেখা হয়নি। এই প্রথম ও এই বোধ হয় শেষ। ফের হয়তো জেলে ফিরে যেতে হবে। দিগ্বিজয় না ছাই। ইংরেজ কি অত সহজে মরবে। তোমরা আবার সেই ইংরেজেরই গোলামি করছ। ধিক তোমাদের!" মুক্তা এক নিঃশ্বাসে বলে।

"আমি কি তোমার সভাজন যে লেকচার শুনব। সারাটা দিন সভাজনকে দিয়ে দুটি মিনিট অভাজনকে দিতে পারো না?" নন্দী নালিশ করে।

"কেন দেব, শুনি। তুমি আমার কে? জেল থেকে বেরিয়েই বন্ধুদের মুখে বার্তা পেলুম তুমি নাকি বিয়ে করেছ। চমৎকার খবর। আমার তো আনন্দে জয়ধ্বনি করতে সাধ গেল। কিন্তু বৌদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। হলে কত খুশি হতুম।" মুক্তা ছুটতে ছুটতে বলে।

দেখতে দেখতে ট্রেন এসে পড়ে। ওরা দৌড়তে দৌড়তে টিকিট উইন্ডোতে যায়। তারপর অন্ধকারে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে ইন্টারক্লাস উইমেন খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে ছেড়ে দেয় তারকেশ্বর লোকাল।

মুক্তা তো প্রায় ভেঙে পড়ে আর কী! একটার পর একটা মিটিং করে অবসন্ন। ইটিং যদি হয়ে থাকে তবে অকিঞ্চিৎকর। চোখের উপর দিয়ে চলে গেল লাস্ট ট্রেন!

অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "কাল ভোরেই আপনাকে রওনা করে দেব, দিদি। রাতটা কোনো মতে ধৈর্য ধরুন।"

ওদিকে যে নিরুপমা দেবীর বাড়ি থেকে হাওড়ায় মোটর আসবে ওকে নিতে। জেল থেকে ফিরে ও তাঁরই অতিথি হয়ে সর্বত্র সভাসমিতি করে যুদ্ধবিরতির সময়টুকু কাটাচ্ছে। ওর বিশ্বাস গান্ধীর সঙ্গে আরউইনের কথাবার্তা ব্যর্থ হবে। সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পরতে হবে। ওর স্বামী এসে কলকাতায় ওর সঙ্গে দেখা করে গেছেন, সঙ্গে শিশুপুত্র। আবার যখন যেতেই হবে জেলে তখন মায়া বাড়িয়ে কী হবে?

"অসম্ভব। এ হতেই পারে না!" মুক্তা মেনে নিতে পারে না যে ওকে

আজ কলকাতার বাইরে এক পাড়াগাঁয়ের স্টেশনে রাত কাটাতে হবে। কিন্তু আরো বড়ো বিস্ময় ছিল ওর কপালে। ওয়েটিং রুম বলতে এতটুকু একটা শেড। সেখানে রাত কাটায় না কোনো যাত্রিণী।

"কী সর্বনাশ! তা হলে আজ আমি থাকব কোন চুলোয়! স্টেশন মাস্টারকে ডেকে পাঠায়। সে ভদ্রলোক হাত জোড় করে মাফ চান রেলওয়ের তরফ থেকে।

সে গোসা করে স্টেশন মাস্টারের কামরাতেই প্রায়োপবেশন করতে যাচ্ছিল। অনশন ধর্মঘট। কিন্তু কেউ ওকে সংগ দিতে রাজী নয় শুনে ওর কাণ্ডজ্ঞান ফেরে। ও নরম হয়ে বলে, "তা বলে রেল কোম্পানীর এ অন্যায় সহ্য করব! ওয়েটিং রুম কেন বানায় না ওরা? কোটি কোটি টাকা শোষণ করছে—"

"চুপ, চুপ। সভা নয় এটা।" নন্দী ওর কানে কানে বলে। "একজন অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট যদি এসব কথা শোনে তো তার অ্যারেস্ট করার পাওয়ার আছে।"

তখন প্রকৃতিস্থ হয় মুক্তা। বলে "কী ভুল! কী ভুল! কেন ওই ঘোড়ার গাড়িতে করে স্টেশনে এলুম না? তা হলে তো পায়ে হেঁটে সময় নষ্ট হতো না।"

ওরা দু'জনে স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটেই ফেরে। পথে পড়ে ডাকবাংলা। নন্দী বলে, "ওয়েটিং রুমের চেয়ে ডাকবাংলা এমন কী মন্দ? আমাদের দু'জনের অতিথিদের জন্যে দু'খানা ঘরই রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে। দু'খানাই তোমার জন্যে খুলে দেওয়া হবে। কেমন, রাজী? না কংগ্রেস আপিসে খবর পাঠাব যে মুক্তা দেবী ট্রেন ফেল করেছেন, আপনারাই তাঁর জন্যে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করুন।"

"ওরা তো সাধাসাধি করছিলই আরো একদিন থাকতে। কিন্তু আমার নিয়ম হলো আমি কোথাও রাত কাটাইনে। কলকাতার কথা আলাদা।" মুক্তা আর ওমুখো হতে চায় না।

"তা হলে চল সান্যালকে বলি। একখানা ঘর ওর নামে যখন।" নন্দী ওকে বোঝায়। ওদিকে সান্যাল আপন মনে গান ধরেছিল—

"মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
এলো ফাগুনদিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে যাই যাই যাই।"

অন্ধকারে দু'জনের গলা শুনে ওই গান থেমে গেল। "ও কে! তোমরা! পরমেশ আর মুক্তা। আরে, এস এস। তারপর কী ব্যাপার! ট্রেন ফেল!"

তারপর চৌকিদারকে ডেকে ডাকবাংলার ঘর খোলানো হলো, জল তোলানো হলো, বাতি জ্বালানো হলো। জমাদারকে ডেকে বাথরুম সাফ করানো হলো। বেয়ারাকে ডেকে বিছানা পাতা হলো। বাবুর্চিকে ডেকে খানা পাকানোর হুকুম দিতেই মুক্তা মিনতি করে বলল, "আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না আজ। ভীষণ মন খারাপ।"

সত্যি ওর অবস্থা দেখে মায়া হয়। শ্রান্ত ক্লান্ত বিপদগ্রস্ত। তবে গরম জলে স্নান করে ও কিছু আরাম পেলো। এক পেয়ালা গরম চা চেয়ে নিয়ে খেলো। আর ডাকবাংলার বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে গা মেলে দিয়ে শান্ত হলো।

"তা হলে সেই কথাই রইল। কাল ভোরে উঠে তোমাকে আমরা ট্রেন ধরিয়ে দেব। তুমি একটু পরে তোমার ঘরে গিয়ে ভিতর থেকে ভাল করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুতে যাবে। হাতের কাছে এই টর্চ। দরকার হলেই বেয়ারাকে ডাকবে। ও আজ বারান্দায় শোবে।" এই বলে পরমেশ বিদায় নিতে যায়।

"ও কী, তুমি চললে কোথায়। তোমার জন্যে আমি কতদূর থেকে এলুম, নিরিবিলিতে কথা বলব ভেবে ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে দিলুম, ট্রেনটা যে ফেল করলুম সেটাও তো বলতে গেলে তোমারি জন্যে। তোমার সঙ্গে না গিয়ে ওদের সঙ্গে গেলে ওরা আমাকে ট্রেন ধরিয়ে দিত নির্ঘাত। এখন তুমিই আমাকে পাথি নারী বিবর্জিতা করে চললে।" মুক্তা এমন সুরে বলে যে, শুনলে মায়া হয়।

অগত্যা আর একটা ইজিচেয়ার টেনে বসতেই হলো পরমেশকে।

মুক্তা বলে, "বিশ্বাস করো, আমার আজ এখানে রাত কাটাবার লেশমাত্র পরিকল্পনা ছিল না। আমি আসতে চেয়েছিলুম পাঁচটায়। হাতে আধঘণ্টা সময় নিয়ে। তারপর যে ট্রেনটা ধরতুম সেটা লাস্ট ট্রেনের আগের ট্রেন। সে ট্রেনেও মোটর আসত। কিন্তু মিটিং করতে করতে সাতটা বেজে গেল। তোমার এখানে আসতে আসতে পৌনে আটটা। আমার তো মনে হয় এটা আমার নিয়তি। তোমাকে এত কথা বলার ছিল যে আধ ঘণ্টায় কিছুতেই বলা যেত না। আর না বললে তুমি আমাকে ঠিক বুঝতে কী করে? একজনকে বিয়ে করেছ বলে কি আরেকজনকে একটুও ভালোবাসবে না?"

পরমেশ অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বলে, "আর ওসব নতুন করে শুনিয়ে ও শুনে কার কী সুখ, মুক্তা। তুমি মুক্ত হতে চেয়েছিলে। মুক্ত হয়েছ। আমি বাঁধা পড়তে চেয়েছিলুম। বাঁধা পড়েছি। এটাও ভালবাসার বাঁধন। ও আমাকে ভালোবাসে বলেই বিয়ে করেছে। আর আমি ওকে। আমরা কেউ মুক্তি চাইনি। তুমিই চেয়েছিলে। তুমি পেয়েছ।

দ্বিতীয় এক বন্ধন তোমার কাম্য ছিল না। আমার সঙ্গে বন্ধন তো তুমি সত্যি সত্যি চাওনি। তিন বছর অপেক্ষা করার পর একদিন এলো সত্যের মুহূর্ত। আমি সেই মুহূর্তের উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলুম যে তুমি আমাকে ভালোবাসলেও কোনদিনই আমার হবে না, আমার সঙ্গে মিলে নীড় রচনা করবে না। তুমি হবে বনের পাখী। আর আমাকেও তোমার জন্যে বনের পাখী হতে হবে সারাজীবন। যা আমার অন্তর চায় না। সেইজন্যেই তো আমি আমার আপনারে জোর করে ছাড়িয়ে নিলুম। ওটা তোমার উপর অপ্রেম বা অশ্রদ্ধা থেকে নয়। আমার অপূর্ণতার উপলব্ধি থেকে।"

মুক্তা নীরবে চোখের জল ঝরায়। মাঝে মাঝে চোখ মোছে। অনেকক্ষণ পরে উত্তর দেয়। "তুমি যেমন সুন্দর করে বলতে পারো আমি কি তেমন পারি? তা বলে কি তোমার সত্যই একমাত্র সত্য, আমার সত্য কিছু নয়? মুক্তি চেয়েছি এটা ঠিক। এখনো চাই। কিন্তু বন্ধনও কি চাইনে? প্রেমের বন্ধন?"

"আমি বলতে চেয়েছিলুম বিবাহের বন্ধন—" পরমেশ কণ্ঠক্ষেপ করে।

"ওসব পরের কথা। কেন যে তুমি ওই নিয়ে অত ভাবতে তা আজো আমার বোধগম্য হয়নি। কেন যে অত কম বয়সে—পুরুষের পক্ষে কম বয়স বই কি—বিয়ে করে পর হয়ে গেলে তাও কি আমি বুঝি?" মুক্তা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে।

"অতি সহজ প্রশ্ন। দাবা খেলতে বসে যে-কোনো ভালো খেলোয়াড় দু'তিনটে চালের পরেই বুঝতে পারে যে খেলায় হার হবে। কী দরকার সময় নষ্ট করে? তার চেয়ে নতুন করে আসর সাজানো যাক। ট্রাই ট্রাই এগেন।" পরমেশ সংক্ষেপে বোঝায়।

"ওঃ এই তোমার প্রেমের ফিলজফি!" মুক্তা আহত হয়ে বলে, "না, না, তুমি তো এমন ছিলে না। কেন যে তোমার মন বদলে গেল তা কোনদিন স্পষ্ট করে বলনি। শুধু তোমার সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়েছ যে এর পর থেকে আমরা ভাই বোন।"

মুক্তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে পরমেশের অভিরুচি ছিল না। সে পরিচ্ছেদ সে ইচ্ছে করেই শেষ করে দিয়েছে।

"খেলার উপমা যখন দিয়েছ তখন বলি, খেলার মধ্যিখানে তুমি হঠাৎ উঠে পালিয়ে গেলে। সবুর করলে দেখতে তুমিই খেলায় জিতেছ। তোমার হেরে যাবার সম্ভাবনা তখনো ছিল না, এখনো নেই, কিন্তু এখন তো আর ও কথা ওঠেই না। তুমি এখন বিবাহিত পুরুষ।" মুক্তা উদাসভাবে বলে।

"যদি শুনতে চাও তো বলি আমি অবিবাহিত থাকব বলেই পণ করেছিলুম, যতদিন না তার দেখা পাই যে আমার ও আমি যার। আকস্মিকভাবে দেখা

পাওয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। তুমি যদি তখন বাইরে থাকতে তোমাকে জানাতুম। কিন্তু তুমি তখন জেলে আর আমি একজন সরকারী কর্মচারী। তোমার সঙ্গে মেশা জেলের বাইরেও দুঃসাহসের কাজ। এই যে আজ তোমাকে এখানে তুলেছি এর জন্যেও জবাবদিহি করতে হতে পারে। হবে না, কারণ সরকার এখন তোমাদের সঙ্গে মিটমাট করতে চান। তোমরা গোল টেবিলে গেলে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

"তোমার সঙ্গে মেশা আমার পক্ষেও কম দুঃসাহসের কাজ নয়, কংগ্রেসও জবাবদিহি তলব করতে পারে।" মন্তার আত্মসম্মান উদ্দীপ্ত হয়।

লাস্ট ট্রেনের পর এ পথে লোক চলাচল থেমে আসে। গ্রাম এখান থেকে বেশ দূরে। চারদিক নিস্তব্ধ নিশ্চল। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। অন্ধকারে গা ছম ছম করে। ইতিমধ্যে পেট্রোমাক্স নিয়ে গেছে। আলো বলতে একটা লণ্ঠন।

"রাত কত হয়েছে, খবর রাখো? মন্তার হাত থেকে টর্চ চেয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখে পরমেশ। "বাই জোভ, এগারোটা পঁচিশ। কোন্‌খান দিয়ে সময় কেটে গেল। বেশী কথাতো হয়নি. এখন, লক্ষ্মীটি, তোমার ঘরে গিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করো।"

"কেন, তোমার ঘুম পেয়েছে বুঝি? জীবনে একটা রাত। তুমি ঘুমিয়ে কাবার করবে? আর আমার চোখে ঘুম আসবে মনে করো? এই তেপান্তরের মাঠে চোর যদি আমার ঘরে ঢোকে আমার প্রোটেকশন কী?" মন্তা ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

পরমেশ বলতে যাচ্ছিল, কেন, বেয়ারা শুয়েছে বারান্দায়? কিন্তু কোথায় বেয়ারা? শীতের ভয়ে সে তার কাবলীপাল তাঁবুতে ঢুকেছে। বারান্দা তো ফাঁকা। মানুষটিও বুড়ো। আর ডাকবাংলার চৌকিদার —যার এ ডিউটি—সে তার গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে।

"চোর কখনো এ তল্লাটে আসবে না। দু'দু'জন হাকিম ও তাদের লোকলস্কর রয়েছে না? তাদের কাছে হাতিয়ার নেই ভেবেছে?" পরমেশ বলে।

"তা হলে তোমার রিভলভারটা আমাকে ধার দাও।" আবদার ধরে মন্তা।

রিভলভার তো সত্যি পরমেশের ছিল না। তবু এমন ভাব দেখাতে হয় যেন আছে। সে মাথা নেড়ে বলে, "ও জিনিস দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিতে নেই। কড়া নিষেধ। চোর এসে হয়তো ওটিকেই আগে সরাবে। এই সন্ত্রাসবাদের দিনে আমিও যে নিরাপদ নই, মন্তা। আমাকেই বা রক্ষা করবে কে?"

"হুঁ। বুঝেছি। আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না। তোমার ধারণা আমি তলে তলে সন্ত্রাসবাদী। অবশ্য ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই তা নয়, কিন্তু নিরুদিকে আমি কথা দিয়েছি যে যতদিন আমি ওঁর সঙ্গে আছি ততদিন ওঁকে বিট্রে করব না। কত ভালোবাসেন আমাকে। আর কত বিশ্বাস করেন। উনিই তো আমাকে বলেন যে, মুক্তা, তোমার মুক্তি আর ভারতের মুক্তি একই সমস্যা। না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না। সেই-জন্যেই তো আমি আজ রাত জাগছি।" সে হেসে ওঠে।

"তা হলে আমি নিদ্রার জন্য ছুটি পাব না?" পরমেশ নিবেদন করে।

"কেন পাবে না? কে বলছে তোমাকে জেগে থাকতে? যাও, তোমার তাঁবুতে যাও। রইলুম আমি এই বারান্দায় বসে। একটু পরে চাঁদ উঠবে, তখন আমার আর ভয় থাকবে না। তা হলেও আমি ঘরে ঢুকছিনে। কে জানে, বাবা, কবেকার ডাকবাংলা! এসব পুরোনো বাড়িতে জনমানব না থাকলে যারা এসে আশ্রয় নেয় তাদের বাইরে থেকে দেখতে টিকটিকি গিরগিটির মতো। আসলে কিন্তু ওরা অশরীরী।" এই বলে সে বার কয়েক রাম রাম করে।

পরমেশ তো অবাক। একজন শিক্ষিতা মহিলার এ কুসংস্কার।

"পম, তুমি হ্যামলেট নাটকের হোরেশিও। তাই তোমার দর্শন-বিজ্ঞানকেই মনে করেছ সবজানতা।" এতক্ষণ বাদে মুক্তা ওর প্রিয় নামে সম্বোধন করে।

"দু'মাসের উপর ডাকবাংলার মাঠে শিবির করে আছি, কেউ একদিনও বলেননি যে এটা ভূতুড়ে।" পরমেশ বিস্ময় প্রকাশ করে।

"চুপ, চুপ। নাম করতে নেই। দেখছ না, শুনতে পেয়েছে। ওই দেখ, টিকটিকিটা কেমন ল্যাজ নেড়ে এগিয়ে আসছে। মা গো। রাম রাম রাম।" মুক্তা শিউরে ওঠে। টর্চটা পরমেশের হাত থেকে খপ করে কেড়ে নিয়ে দেয়ালের উপর আলো ফেলে।

"কোথায় টিকটিকি? ওটা তোমার বিভ্রম।" পরমেশ মন্তব্য করে।

"টিকটিকি নয়, কিন্তু বিভ্রমও নয়। ওটা একটা মথ। তার মানে ওই যারা শ্যাওড়াগাছে থাকে।" মুক্তা সন্ত্রস্তভাবে বলে।

হারিকেনের আলো-আঁধারিতে মথকেও টিকটিকি বলে ভ্রম করা সম্ভব। কিন্তু ও যে শ্যাওড়াগাছ থেকে নেমে এসেছে এটা একটা সংবাদ।

"ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। হলে তো অশরীরীর আতঙ্কে তুমি নিজেও ঘুমতে না, আমাকেও ঘুমতে দিতে না।" পরমেশ টিপ্পনী কাটে।

"তুমি পাশে থাকলে আমি অঘোরে ঘুমোতুম। তবে তুমি বোধ হয় সশরীরীর ভয়ে বিছানায় আসতে না। শরীর বলে তোমার কোনো পদার্থ ছিল না। সবটাই মন। তবে ইদানীং দেখছি হাড়ে মাস লেগেছে। বিলেতের গুণে না বিয়ের গুণে কে বলতে পারে। আচ্ছা, আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়। আরো মোটা হয়ে গেছি, না জেলখানার খোরাক খেয়ে ছিপ ছিপে ফুরফুরে।" মুক্তা প্রশ্ন করে।

"মোটা আর পাতলা মিলে যা হয়। মোতলা।" পরমেশ ওকে ক্ষ্যাপায়।

"কী যে বল, মোতলা বলে কিছু আছে নাকি! ওটা কি প্রশংসার কথা? না নিন্দার? তুমি কি সীরিয়াসলি বলছ, না ঠাট্টা করছ?" মুক্তা গালে হাত দিয়ে বসে।

"প্রশংসার কথা। তোমার গড়নটা এতদিন পরে চলনসই হয়েছে। রূপ তোমার চিরদিন সুন্দর। কিন্তু গড়ন সম্বন্ধে সে কথা বলা চলত না। এখন চলে। কিন্তু তার জন্যে চাই বিশ্রাম আর নিদ্রা। রাত জাগলে বিচ্ছিরি দেখাবে। তুমি ভিতরে যাও। আমিও যাই আমার শিবিরে।" পরমেশ গা তোলে।

রাত সাড়ে বারোটায় তাঁবুতে ফিরে পরমেশ দেখে তার বন্ধু ত্রিদিব অকাতরে ঘুমচ্ছে। অন্ধকারে পা টিপে টিপে সে বাথরুমে যায়। টর্চটাও তো বেহাত। এখন ত্রিদিব যদি হঠাৎ জেগে উঠে "চোর, চোর" বলে শোর তুলত তা হলে কী লজ্জায়ই না পড়ত পরমেশ! এখনো ওর কাপড় ছাড়া হয়নি। আঁটসাট ট্রাউজার্স পরে আড়ষ্ট বোধ করছে।

এবার ঢিলে পায়জামা পরতে যাবে এমন সময় শোনে মুক্তা যেন চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠছে, "বাঁচাও।"

যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ছুটতে হলো ওকে। গিয়ে দেখে মুক্তা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে আর বলছে, "ওটা কী। কালপ্যাঁচা না বাদুড়।"

কিছু নয়। একটা চামচিকে। কিন্তু অন্ধকারে মনে হচ্ছে আরো বড়ো।

"হাস্যকর ব্যাপার। তুমি দেখছি চামচিকে দেখলেও ভয় পাও। এই মানুষ ইংরেজের সঙ্গে রিভলবার হাতে নিয়ে লড়বে। বিকল্পে চরকা হাতে নিয়ে।" পরমেশ রঙ্গ করে।

"বসো। কখনো কি আমি পোড়ো বাড়ীতে নির্জনে রাত কাটিয়েছি? এই প্রথম ও এই শেষ। তোমারি জন্যে আমার আজ দুর্ভোগ। আর তুমি কিনা ওদিকে লেপকম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যাসুখ উপভোগ করছ। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছ একজনকে। যে আমি নয়।" মুক্তা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে কাল প্যাঁচার ভয়।

"বিছানায় গেলুম কখন যে স্বপ্ন দেখব ? লক্ষ করোনি এখনো আমার পরনে সান্ধ্য পোশাক ? আমার পোশাক থেকে মনে হবে এটা সন্ধ্যাবেলা।" পরমেশ আবার আসন নেয়। তখন চাঁদ উঠি উঠি করছে।

"ক্ষমা কোরো, তোমাকে তোমার সুখশয্যা থেকে টেনে আনলুম। কিন্তু কী করি, আমি যে একেবারে নিঃসঙ্গ। আর নিঃসহায়। জেলখানাও এর চেয়ে নিরাপদ। সেখানেও রাতে পাহারা থাকে। এখানেও তোমরা আমার জন্যে স্পেশাল প্রহরী মোতায়েন করলে পারতে। আমি যখন তোমাদের রাজ অতিথি।" মুক্তা হাসির ভান করে।

"হাঁ, সেটা পারতুম। থানায় একটা চিঠি লিখে পাঠালেই জনা দুই কনস্টেবল পাওয়া যেত। কিন্তু পরে তা নিয়ে চারদিকে সাড়া পড়ে যেত আর কতরকম কথা উঠত। ক্ষমতা আছে বলেই কি তা ব্যবহার করতে হবে ?" পরমেশ চাঁদের দিকে তাকায়।

"তা হলেও আমি তোমাদের প্রশংসা করতে পারিনে। তোমরা এতগুলো লোক আশেপাশে থাকতে আমি এতবড়ো একটা বাংলায় একাকী ও অসহায়। ওটা চামচিকে না হয়ে শিকারী পাখীও তো হতে পারত।" চাঁদের আলো মুক্তার মুখে এসে পড়ে।

পরমেশ বলে "কাজ কী তোমার বারান্দায় বসে থেকে ? ভিতরে যাও, শিকারী পাখির সাধ্য থাকবে না যে তোমাকে শিকার করে।"

"তুমি বোধহয় ভিতরটা দেখনি। যাও, দেখে এস।" মুক্তা নির্দেশ দেয়।

পরমেশ গিয়ে দেখে নেয়ারের খাট বিছানার ভারে নুয়ে পড়েছে। মাঝখানটা একটা গর্তের মতো। সেখানে একবার শুলে আর উঠতে হবে না। টেনে তোলার জন্যে আরেকজনের দরকার হবে। সেই আরেকজনটি কে হবে ?

"হুঁ। এখন বুঝতে পারছি কী ভুল করেছি। আরেকজন স্ত্রীলোকের খোঁজ করা উচিত ছিল। সেই এসে ঘরের মেঝেতে শুতো।" পরমেশ ভাবনায় পড়ে। এত রাতে সে ভুল শোধরানো যায় না।

"ওঃ তোমার অভিপ্রায় একজন স্পাই লাগানো ? ম্যাজিস্ট্রেট কিনা তাই মাথায় জিলিপির প্যাঁচ।" মুক্তার মেজাজ চড়া।

"দূর, পাগলী! তোমারি স্বার্থের জন্যে বলছি। আমার কী! তবে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছ তাতে আমার ঘুমের আশা ফেরার। আচ্ছা, তুমি মেজের উপর ঢালা বিছানায় শুতে পারবে ?" পরমেশ জানতে চায়।

"কী যে বল! আমার বুঝি প্রাণের মায়া নেই। তেঁতুলে বিছে, কাঁকড়া বিছে, লতাপাতা এরা কি আমাকে ছেড়ে কথা কইবে ?" মুক্তা চাঁদের আলোর ঝিলমিল করে।

"কই, ওসব তো আমরা এতদিন এখানে থেকেও দেখিনি। থাকলে বারান্দাতেও উটত। লক্ষ্মীটি, যাও। শুয়ে পড়ো। রাত এখন দুটো।" পরমেশ সাধে।

"অমন করে সাধতে হয় যাকে সে এখন তার বাপের বাড়িতে আরাম করে ঘুমিয়ে। সে এমন বোকা মেয়ে নয় যে মান্ধাতার আমলের একটা ডাকবাংলোয় তোমার অতিথি হবে। তুমি তো শুধু শোবার ঘরখানাই দেখলে। আরো ভিতরে গিয়ে যদি বাথরুমের দৃশ্য দেখতে? হাতীর মত প্রাণীরই উপযুক্ত কমোড ওটা। তেমনি হাতী ধরার ফাঁদ। আর ওই ড্রেসিং টেবিলটা দেখেছ? বিরাট আয়না, কিন্তু মুখ দেখা যায় না।" ঠেস দিয়ে ছড়ার মতো আওড়ায় মুক্তা।

পরমেশ তো ডাকবাংলায় ওঠেনি। জানবে কী করে কোথায় কী আছে? শুনে দুঃখিত হয়। কিন্তু ওই ডাকবাংলাই সফরের সময় কত বড়ো একটা সম্বল।

"আচ্ছা, আমি তোমাকে ঘরে শুতে বলব না। তুমি এইখানেই চাঁদের আলোয় একটু ঘুমিয়ে নাও। আমিও এইখানেই একটু চোখ বুঁজি। ও ঘর থেকে বালিশ আর কম্বল আনিয়ে নাও। আমি তাঁবু থেকে নিয়ে আসি।" পরমেশ প্রস্তাব করে।

মুক্তা সায় দেয়।

যে যার আরামকেদারায় আরামে শয়ান। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে। দুজনের মুখে আলোর লহর। ঝিল্লী প্রহর গুনছে।

আধঘণ্টা পরে মুক্তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর। "পম কি ঘুমিয়ে পড়লে?"

পরমেশের তন্দ্রা এসেছিল। সে চমকে উঠে বলে, "কে? রিনি?"

মুক্তা খিল খিল করে হেসে ওঠে। পম, ও কার নাম করলে? তোমার বৌয়ের? রিনি বুঝি ওর নাম? বেশ নামটি তো। কিন্তু মানুষটিকে এখন পাচ্ছ কোথায়? এ যে নেহাৎ নীরস নিরেট মুক্তা।"

"ওঃ! মুক্তা। হাঁ, মনে পড়ছে। তোমাকে আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। কিন্তু তুমি কেন এখনো জেগে?" পরমেশ ধীরে ধীরে সজাগ হয়।

"পাহারা যারা দেয় তারা বুঝি পড়ে পড়ে নাক ডাকায়? কার ভরসায় আমি ঘুমোব? চোর যদি এসে হার খুলে নিয়ে যায় কে টের পাবে?" মুক্তা সুধায়।

"আর লজ্জা দিয়ো না। তোমার যদি কিছু চুরি যায় আমি আমার পকেট থেকে দেব। শুধু লক্ষ্মীটি, বাকী রাতটুকু ঘুমোতে দাও। তুমিও আর জেগে থেকো না। আমি তো রয়েছি। ভয় কিসের?" পরমেশ আশ্বাস দেয়।

"ভরসাই বা কিসের ? এমন ধন আছে যা একবার গেলে ফিরে আসে না। যে নেয় সেও ফিরিয়ে দিতে পারে না। আমি যদি রিনি হতুম তুমি যক্ষের মতো জেগে থাকতে। রিনি হবার ভাগ্য তো করিনি! তাই তুমি অমন উদাসীন।" খোঁচা দেয় মুক্তা।

পরমেশ নিদ্রার জন্যে সব কিছু দিতে পারত। কিন্তু সব পেলেও কি মুক্তা ওকে ঘুমোতে দেবে? তার দৃঢ় সংকল্প সে নিজে ঘুমোবে না, আর কাউকেও ঘুমোতে দেবে না।

"বল, দেবী, কী আদেশ দাসে?" পরমেশ একটু নাটকীয়ভাবে বলে।

"কিছু নহে, রহ তুমি জাগি। অতন্দ্র প্রহরী।" মুক্তাও তেমনি।

"তুমি যদি নিদ্রা যাও আমি রব জাগি। নতুবা নিদ্রিব।" পরমেশ বিদ্রোহ করে।

"ও কী! রাগ করলে নাকি!" মুক্তা ব্যস্ত হয়ে বলে, "আচ্ছা, তুমি একজন বিদ্বান মনীষী, তুমি কেন বুঝতে পারো না যে পুরুষবেষ্টিত পুরীতে একাকিনী নারীর একমাত্র রক্ষাকবচ জাগরণ। নারীর পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেইটেই আমি করছি।" মুক্তা খোলাখুলি বলে।

"আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে আমি সারারাত পায়চারি করব। যেমন করে টহল দেয় সান্ত্রী। তুমি নির্ভয়ে ঘুমোও।" এই বলে পরমেশ উঠে দাঁড়ায়।

"আচ্ছা!" বলে মুক্তা চোখ বোজে।

বেচারা পরমেশ! বারান্দাটার একধার থেকে আরেকধার রোঁদ দেয়। আধঘণ্টা কি তিন কোয়ার্টার পরে মুক্তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর "পম"।

"জেগে আছো তো! শুধু শুধু কসরৎ করালে।" পরমেশ গজগজ করে।

"এস। কাছে এসে বসো। বুঝতেই পারছ আজ আমার চোখে ঘুম আসবে না। আর তোমাকেও আমি চোখের আড়াল করব না। জীবনে একটা রাত!' মুক্তা মৃদু স্বরে বলে।

পরমেশ আবার স্বস্থানে ফিরে এসে বসল। চাঁদের আলোর বান ডেকেছে। রাত বটে একখানা। এমন রাতে সত্যি চোখ বোজা যায় না।

"তোমাকে যেকথা বলতে এতদূর আসা সেটা কিন্তু আমার মনে চেপে আছে। নামছে না। কে জানে তুমি কী অর্থে নেবে। চার বছর বাদে তুমি তো আর সেই ছেলেটি নও। তোমাকে দেখলে ভয় করে এখন।" মুক্তা গৌরচন্দ্রিকা করে।

"ভয় কেন? আমি কি খুব বেশী বদলে গেছি?" পরমেশ বিস্মিত হয়।

"তুমি বিবাহিত পুরুষ। বিবাহজীবনে সুখী। আমার মতো বিবাহে

অসুখী নও। তেমোর সঙ্গে আমার মিলবে কী করে? আর আমিই বা মেলাব কী করে? যদি ইতিমধ্যে বিয়ে না করতে তাহলে হয়তো মেলাতে পারতুম। এখন তো ওটা প্রশ্নের অতীত। জেল থেকে বেরোবার পর খবরটা পেয়ে অবধি আমি ভাবছি এখন থেকে আমাদের কী ভাবে অ্যাডজাস্ট-মেন্ট হবে।" মুক্তাকে ভাবুকের মতো দেখায়। তেমনি চিবুকে হাত।

"আমি কি কোনদিন তোমার কাছে গোপন করেছি যে, বিয়ে না করে আমি থাকতে পারব না? একজনকে না একজনকে। তোমাকে না হোক আর কাউকে। তুমি যদি কেবলি ঝুলিয়ে রাখ তাহলে আমি করি কী? মুক্তা, সময় আর জোয়ার কারো তরে অপেক্ষা করে না। প্রেমও তেমনি। প্রেমেরও একটা প্রচ্ছন্ন টাইম লিমিট আছে। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। তুমি বোঝ না। আমি বুঝি।" পরমেশ মুক্তার দিকে অনিমেষ তাকায়।

"কিন্তু তোমার সৌম্যদা তো এখনো কুমার। বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড়ো। যাঁর জন্যে অপেক্ষা তিনিও তো বিবাহিতা।" মুক্তা তর্ক করে।

"সৌম্যদাকে কেউ অপেক্ষা করতে বলেননি। বৃথা অপেক্ষা। ও বিবাহ ভাঙবার নয়। প্রেমের বিবাহ।" পরমেশ দুঃখ প্রকাশ করে। "সৌম্যদা হলেন রোমান্টিক বিরহী। বিরহেই তাঁর গৌরব। মিলনের চিন্তা তাঁর মনে ঠাঁই পায় না। সেইজন্যে তাঁর কাছে টাইম লিমিট নেই। ইংরেজদের মধ্যে যেমন চার্লস ল্যাম্ব। ড্রীম চিলড্রেন পড়েছ?

"হাঁ। কী করুণ। উনিও কি সন্তানের স্বপ্ন দেখেন?" মুক্তা কৌতূহলী হয়।

"দেখেন বইকি। ওর অ্যালিসের সন্তান।" পরমেশ বলে।

মুক্তা অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবে। তারপর বলে, "তোমার ড্রীম চিলড্রেনের কথা তুমিও আমাকে জানিয়েছিলে। আমাকে দিয়ে পড়িয়েছিলে। কিন্তু তখনো আশা দিইনি, এখনো আশা দিতে পারতুম; না, যদি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে বসে থাকতে। না, তোমাকে মিথ্যে ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হতো না। তোমার ড্রীম চিলড্রেন রিনির কোলেই আসবে।"

পরমেশ পূব আকাশের দিকে তাকায়। সেদিকে রঙের আমেজ।

"তোমাকে আমি দোষ দিতে চাইনে, পম।" মুক্তা নরম হয়ে বলে, "কিন্তু তুমি যে মনে করতে তুমি একজন মহান প্রেমিক সেটা কিন্তু পরীক্ষায় টিকল না। তুমিও ঠিক আর পাঁচজনের মতো বাস্তববাদী। অসম্ভবের পেছনে না ছুটে সম্ভবপরের দিকেই হাত বাড়াও। তোমার সিদ্ধিও তেমনি সহজ সিদ্ধি। কোন বাহাদুরি নেই তাতে।"

পরমেশ মাথা পেতে নেয় সে রায়। তার অন্তরাত্মাই জানেন সিদ্ধি

সহজ না কঠিন। সাধনাটাই আসল। সাধনাতেই তার অধিকার। সিদ্ধিতে নয়।

"আমি যে ফেল সে আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু তুমিও পাশ নও। পাশ ওই সৌম্যদা। সত্যিকার আদর্শ প্রেমিক।" মুক্তা ওঁর প্রশংসায় গদগদ হয়।

দুটো একটা পাখী ডাকতে শুরু করেছে। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। এইবার লোকজন একে একে জাগবে ও এদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে কী যে মনে করবে!

মুক্তা ত্বরিৎগতিতে বলে যায়, "কতজন আমাকে ভালোবাসে। আমি কি প্রেমের কাঙাল! কিন্তু আমি চাই রস। যাতে আমার প্রাণ জুড়োবে। বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।"

"একটিও না!" পরমেশ কথাটা গায়ে পেতে নেয়। তার মনে লাগে।

"কী করে বলি একটি, যখন দেখি সে আর আমার চোখে চোখ রাখে না, আমার হাতে হাত মেলায় না, আমার ছোঁয়ার ভয়ে দশ ফুট দূরে চেয়ার পাতে। সমস্তক্ষণ আনমনা হয়ে বৌয়ের কথাই ভাবে যেজন সেজন আদর্শ পতি হতে পারে, হয়তো আদর্শ যতি। কিন্তু রস কাকে বলে জানে না।" বলতে বলতে মুক্তার চোখে জল ভরে আসে। সে আবেগে আকুল হয়ে কাঁদে।

সন্ধ্যাবেলা যে সন্ধ্যাতারার মতো উদয় হয়েছিল ভোরবেলা সে শুকতারার মতো অস্তপ্রায়। তার মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থাকে পরমেশ। সে যেন পূর্বজন্মের একটি স্মৃতি। এখনি সে মিলিয়ে যাবে।

যুগজিজ্ঞাসা

খুকুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "খুকু, তুমি কাকে বেশী ভালোবাসো? মাকে, না বাবাকে?"

খুকু কী উত্তর দিল জানেন? "মাকেও, বাবাকেও।"

তেমনি আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "কাকে বেশী ভালোবাসো? দেশকে, না যুগকে?" আমি উত্তর দেব, "যুগকেও। দেশকেও।"

দেশ এত দিন পরাধীন ছিল বলে আমরা দিন রাত দেশের কথাই ভেবেছি, যুগের প্রতি মনোযোগ দিইনি, যখনি কেউ মনে করিয়ে দিয়েছে তখনি আধুনিককে পাশ্চাত্ত্য বলে এক খোঁচায় নস্যাৎ করে দিয়েছি। এখন তো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করা দরকার। ঐ কাজটি বকেয়া পড়ে রয়েছে।

গত শতাব্দীর নায়কদের মধ্যে যুগজিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যুগকে অনাদর করেননি। কিন্তু ঐ শতাব্দীরই শেষ ভাগে উল্টো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে। দেশানুরাগ হয়ে দাঁড়াল দেশের অতীতানুরাগ, যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক বিশ্ব এর একটাকে বরণ করতে গেলে অপরটাকে উপেক্ষা করতে হবেই, মাঝখানে সেতুবন্ধনের আশা দুরাশা। অথচ এমনি আমাদের পরাধীনতার জ্বালা যে আমরা ইংরেজ মনে করে ইউরোপকে বর্জন করব, ইউরোপ মনে করে আধুনিক যুগটাকে অগ্রাহ্য করব, থাকব কাকে নিয়ে? না, ভারতের অতীতকে।

ভূতকে নিয়ে ঘর করা যায় না। তার থেকে এল সেতুবন্ধনের কথা। প্রাচীন ভারতও থাকুক, আধুনিক বিশ্বও থাকুক, মাঝখানে একটা সেতু নির্মাণ করা হোক। সমন্বয়। তার মানে গোঁজামিল। অতীত সম্বন্ধে কারই বা সম্যক ধারণা আছে যে দৃঢ় ভূমির উপর পা রেখে বলতে পারবে এই হলো সেতুর এক প্রান্ত। প্রাচীন ভারতে যেমন দেবতা ছিল তেমনি দানব ছিল, যেমন মানুষ ছিল তেমনি রাক্ষস ছিল, যেমন পাণ্ডব ছিল তেমনি কৌরব ছিল, যেমন অহিংসা ছিল তেমনি অতি ভয়ংকর ভয়ংকর মারণাস্ত্র ছিল, যেমন

আস্তিক দর্শন ছিল তেমনি নাস্তিক দর্শন ছিল। প্রাচীন ভারতের স্বরূপ অনেকটা আধুনিক ইউরোপের মতো। সেখানে বহু বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি ক্রিয়া করছে। তাকে এক কথায় আধিভৌতিক বলে পাতালে নামিয়ে দেওয়া যায় না, প্রাচীন ভারতকেও এক কথায় আধ্যাত্মিক বলে আকাশে তুলে দেওয়া যায় না, আকাশের সঙ্গে পাতালকে একসূত্রে গাঁথা যায় না।

এই পণ্ডশ্রমের পশ্চাতে ছিল পরাধীনতাবোধ। এখন তো সে বোধ নেই। এখন পণ্ডিতদের বলা উচিত, আর পণ্ডশ্রম করতে হবে না, পুরোপুরি আধুনিক যুগের সঙ্গে অভিন্ন হও। অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা অপরের মধ্যে যতটা দেখছ তোমাদের মধ্যেও ততটা থাকবে। প্রাচীন ভারত তার আয়ু নিঃশেষে ভোগ করেছে, তোমাদেরটাও যেন গ্রাস না করে।

আর এই যে আধুনিক যুগ, ইউরোপ বা আমেরিকা এর একমাত্র শরিক নয়। তোমরাও শরিকান। তোমরা এক হাতে নেবে, আর-এক হাতে দেবে, তোমাদেরও একটা ভূমিকা আছে, তোমরা তাতে অভিনয় করবে, কিন্তু খবরদার, সেটা হ্যামলেটের ভূতের পার্ট নয়। তোমরা প্রাচীন ভারতের ভূত নও। তোমরা আধুনিক ভারতের জীবন্ত মানুষ। তোমাদের ভূমিকা পূর্বনির্দিষ্ট নয়, তা সৃষ্টিশীল, তা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে চলবে। থাকবে তার মধ্যে তোমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, কেউ সাধছে না তোমাদের মার্কিন বা রুশ হতে। কিন্তু আধুনিক যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও থাকা চাই।

এ যুগ যে বিজ্ঞানের যুগ এ কথা সকলে জানে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, মানবিকতার যুগ। যাকে বলে হিউমানিজম তার লক্ষণ হলো সমাজের চেয়ে মানুষ বড়ো, সম্প্রদায়ের চেয়ে মানুষ বড়ো, শ্রেণীর চেয়ে মানুষ বড়ো, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো। আগেকার দিনে মানুষের চেয়ে মানুষের সমাজ ইত্যাদিকে বড়ো করে দেখা হয়েছে। নারীকে, শূদ্রকে, ক্রীতদাসকে নির্মমভাবে ছোট করে রাখা হয়েছে, যেন সেটা তাদের দৈবলিখন। দৈবলিখন বলে চালানো হয়েছে যা প্রতিকারযোগ্য, যা প্রতিকার করা সম্ভব, তাকে। সনাতন বলে চালানো হয়েছে যা তৎকালীন তাকে। প্রাকৃতিক বলে চালনো হয়েছে যা কৃত্রিম তাকে। নৈতিক বলে চালানো হয়েছে যা বদ্ধমূল সংস্কার তাকে। সত্য বলে চালানো হয়েছে যা স্বার্থদুষ্ট তাকে।

বিদ্রোহ শুরু হয় ইউরোপের রেনেসাঁসের সময় থেকে। তা বলে বিদ্রোহটা শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। ওটা সর্বমানবের। যেমন ভারতীয়দের অহিংস সত্যাগ্রহ সর্বমানবের। বিদ্রোহের ঢেউ এক বন্দর থেকে আর-এক বন্দরে পেঁছিলেও সেটা বন্দরের ঢেউ নয়, সমুদ্রের ঢেউ। বিদ্রোহের হাওয়া এক দেশ থেকে আর-এক দেশে পেঁছিলেও সেটা মাটির হাওয়া নয়,

আকাশের হাওয়া। বিদ্রোহ ক্রমে ক্রমে আধুনিকতম রূপ নিয়েছে। কেউ পড়ে থাকতে চায় না, জাতের দরুন না, রঙের দরুন না, লিঙ্গের দরুন না। অনেক যুগের জমে থাকা পাপ এই যুগেই সাফ করতে হবে। তা সে যুদ্ধ করেই হোক বা বিপ্লব করেই হোক বা আপোসেই হোক বা বন্ধুভাবেই হোক। শ্রেষ্ঠ উপায় অবশ্য বন্ধুভাব বা অহিংসা। নিকৃষ্ট উপায় যুদ্ধ। একটা উপায় ব্যর্থ হলে মানুষ আর একটা উপায় পরীক্ষা করবেই। উদ্দেশ্য হলো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

অবশ্য কেবল এই নিয়ে আয়ু শেষ করা সকলের কর্তব্য নয়। সৃষ্টির কাজ করে যেতে হবে আমাদের অনেককে। গায়ক গাইবে, বাদক বাজাবে, নর্তক নাচবে, ছবিকার ছবি আঁকবে, কবি কবিতা লিখবে। এসব কাজ এক দিনও ফেলে রাখা যায় না। ফেলে রাখলে পরম্পরা কেটে যাবে। সাধনার ধারা শুকিয়ে যাবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো এসব প্রক্রিয়া নিত্য বহমান। কেউ যদি বলে, এসব কিছু কালের জন্যে বন্ধ রাখলে ক্ষতি কী, তা হলে বুঝতে হবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মূল্য সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই। মানুষের দুর্ভাগ্য বর্তমান শতাব্দীতে এ ধরনের লোক সব দেশেই দলপতি হয়ে বসেছে। কোথাও কম কোথাও বেশী।

বন্ধ রাখলে সাধারণের দিক থেকেই আপত্তি ওঠে। তখন এরা বলে এদের ফরমাস মতো লিখতে, আঁকতে, গাইতে, বাজাতে, নাচতে। আর-এক আপদ। এর চেয়ে বন্ধ করা কম খারাপ। শিল্পীদের পক্ষে আধুনিক যুগে বেঁচে থাকা শক্ত। বাঁচা অবশ্য কায়িক অর্থে নয়। সৃষ্টি করতে করতে বাঁচা। এর একটা নিষ্পত্তি চাই, নইলে আর সব হবে, রস হবে না, রূপ হবে না, সৌন্দর্য হবে না। এ যুগ যখন অতীত হয়ে যাবে তখন এর কোনো শিল্পসম্পদ রেখে যাবে না। পরবর্তী যুগের ওরা বলবে এ যুগ নিষ্ফলা বন্ধ্যা।

সুতরাং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যা করতে চাও, করো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রেখ শিল্পীদের বেঁচে থাকা দরকার। শুধু কায়িক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থে। তারা যদি মনের মতো করে লিখতে না পারল, আঁকতে না পারল, গাইতে না পারল, নাচতে না পারল তা হলে তেমন বাঁচার কী তাৎপর্য! তারা যদি তোমাদের ফরমাসই খাটবে তা হলে তারা শিল্পী হতে যাবে কোন দুঃখে। তারা যুগের ভিতর দিয়ে কাজ করছে বটে, কিন্তু তারা নিত্য কালের রাখাল। অমৃতের সন্তান। যুগ যদি তাদের বিকৃতি ঘটায় সেটা যুগেরই মুখবিকৃতি। ভাবীকাল তা দেখে হাসবে।

এ যুগের ভিতর দিয়ে যেতে হবে সকলকেই। শিল্পীকেও। কিন্তু শিল্পীর পরমায়ু যুগের চেয়েও দীর্ঘ। সেইজন্যে তার সাধনাও যুগকে

অতিক্রম করবার মতো দুরূহ। এই দুরূহ নিয়ে যারা আছে তাদের সহজ দিয়ে ভোলানো যায় না। যারা নগদ বিদায় চায় তাদের ধারা আলাদা। তারা আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু যারা আজ আছে, কাল আছে, চিরকাল আছে তাদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে চুপ করে দেখ তারা কী লিখছে, কী আঁকছে, কী দিচ্ছে। তারা যদি বাঁচে তাদের মধ্যে, তাদের সৃষ্টির মধ্যে, তোমরাও বাঁচবে।

শিল্পীর দুর্দিন সব দেশেই লক্ষ করছি। সেইজন্যে যুগকেই তার জন্যে দায়ী করি। এ যুগ যদি শিল্পীদের সহ্য না হয় তা হলে আফসোসের সীমা থাকবে না, কারণ এমন বিষয়বস্তু, এত ঘাত প্রতিঘাত, এত রকম চরিত্র, এ পরিমাণ সংস্কারমুক্তি আর কোনো যুগে সম্ভব হয়নি।

(১৯৫৪)

'দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ'

রবীন্দ্রনাথের উপর বই বাংলাভাষায় রাশি রাশি লেখা হয়েছে। গ্যেটের উপর বই কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব লিখেছেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি দান্তের উপর তোমার এই বইখানিই প্রথম। সেদিক থেকে তুমি একজন অগ্রণী। সুতরাং অভিনন্দনযোগ্য।

রেনেসাঁসের পরে ইউরোপের যাবতীয় সাহিত্যের মোড় ঘুরে গেছে। দান্তের ত্রিতত্ত্ব আর কাব্যের বিষয় নয়। কিন্তু বিয়াত্রিসের সঙ্গে অপার্থিব যাত্রা মানুষের অন্তর জয় করেছে! বিয়াত্রিস তাঁকে অমরলোকে উপনীত করে দিয়েছেন। তেমনি তিনিও বিয়াত্রিসের জন্যে একটি তাজমহল সৃষ্টি করে প্রেমের ঋণ শোধ করেছেন। প্রেমাস্পদার জন্যে এত বড়ো কীর্তি সাহিত্যের ইতিহাসে বোধহয় আর নেই। কী আশ্চর্য প্রেম বল দেখি। সেই ন'দশ বছর বয়স থেকে ছাপান্ন বছর বয়স অবধি অনির্বাণ। অথচ তার মধ্যে জ্বালা নেই। সে শুধু একটি নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা। জীবনের ঝড় ঝাপটা তাকে স্পর্শ করেনি। নরনারীর দিব্য প্রেম বলতে আমরা বিয়াত্রিসের প্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। কামগন্ধ নাহি তায়। চরিতার্থতার জন্যে বিয়ে করা বৌ ছিলেন।

রেনেসাঁস কিন্তু প্রেমের আদর্শ বদলে দিয়েছে। সেইজন্যে আর কেউ দান্তের অনুসরণ করেননি। লরার প্রতি পেত্রার্কার প্রেম অচরিতার্থ হলেও অতীন্দ্রিয় নয়। পরকীয়া প্রেম মধ্যযুগের ইউরোপীয় তথা ভারতীয় সাহিত্য জুড়ে আছে। সেকালের লোক বিশ্বাস করত না যে পরকীয়া হলেই তা অশরীরী হতে বাধ্য। না হয় পরকালে কিছুদিন সাজা পাওয়া যাবে। তা বলে ইহকালে আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হতে কে চায়! অবশ্য সমাজ যেখানে বিরূপ সেখানে বঞ্চিত না হয়ে উপায় নেই। সেই যে বেদনা তাই নিয়েই যত রোমান্টিক কাব্য। যত হিউম্যান ট্র্যাজেডী। লেখকরা বরং হিউম্যান ট্র্যাজেডী লিখবেন, তবু ডিভাইন কমেডী নয়।

রেনেসাঁসের পর এন্তার ট্র্যাজেডী লেখা হয়েছে। এসব প্রেম চরিতার্থ হলেও ট্রাজেডী, না হলেও ট্র্যাজেডী। ক'টা ক্ষেত্রেই বা বিবাহ সম্ভব হয়। রূপকথায় যেমন বলে, 'ওদের বিয়ে হলো, ওরা সারাজীবন সুখে বাস করল', তেমন বললে হয়তো গঙ্গাপ্রাপ্তি উপন্যাস হয়। কিন্তু সত্যিকার সাহিত্য হয় না।

গ্যেটের ফাউস্টও গোড়ায় ছিল ট্র্যাজেডী। প্রথম খণ্ডই ছিল একমাত্র খণ্ড। গ্যেটে যদি সেইখানেই থামতেন তা হলেও বইখানি পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য হতো। দ্বিতীয় খণ্ড লেখার কোনো দরকারই ছিল না। তাড়াও ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা যেমন রাধাকৃষ্ণের ভাবসম্মেলন ঘটিয়ে বিয়োগান্তকে মিলনান্ত করেছেন গ্যেটেও তেমনি ফাউস্টের আত্মাকে নিয়ে গেছেন স্বর্গের রাণী কুমারী মেরীর সকাশে। গ্রেচেন সেখানে পূর্বেই তার পুণ্যফলে উপনীত হয়েছে। তারই প্রার্থনায় ফাউস্টও তার পাপভার থেকে মুক্ত হয়ে নবকলেবর ধারণ করে। মেফিস্টোফেলিস তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। পুণ্যকর্মও সে করেছে বিস্তর।

হাঁ, দরকার ছিল। দরকার ছিল এই কথাগুলি বলবার যে,

"All things corruptible
Are but reflection.
Earth's insufficiency
Here finds perfection.
Here the ineffable
Wrought is with love.
The Eternal-Womanly
Draws us above."

গ্যেটের জীবনদর্শন যদিও দান্তের সঙ্গে মেলে না তবু নারীর উপরেই তাঁর শেষ ভরসা। ইহলোকে যা কিছু অপূর্ণ পরলোকে তা পূর্ণ। প্রেমই অবর্ণনীয় পরিবর্তন আনে। এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে ইউরোপীয় মনীষার বহু শতাব্দী লেগেছে। দান্তে তার একটি স্টেশন। গ্যেটে আরেকটি। মাঝখানে পাঁচ শতাব্দী ব্যবধান।

কিন্তু গ্রেচেন কোন্ পুণ্যফলে কুমারী মেরীর আশ্রয় লাভ করে? প্রথম খণ্ডের শেষে এর ইঙ্গিত আছে। মেফিস্টোফেলিস যখন বলে, "ওর দণ্ড হবে", তখন দৈববাণী হয়, "ওর পাপমোচন হলো।"

কেন? পাপমোচন কেন? কারণ ও ভালোবেসেছে। বিশ্বাস করেছে। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করছে। সমাজ ওকে সাজা দিতে পারে, কিন্তু যার প্রেম এত উচ্চাঙ্গের স্বর্গই তো তার পাওনা। গ্যেটে এখানে দান্তের চেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে। তবে গ্রেচেনকে তিনি অনুতাপমুক্ত করেননি। সে আন্তরিক অনুতপ্ত বলেই সর্বকলুষমুক্ত।

গোঁড়া খ্রীস্টানরা এদের দুজনকেই নরকে পাঠাতেন। বিশেষ করে ফাউস্টকে। দান্তেও যে এদের স্বর্গে যেতে দিতেন তা নয়। এর থেকেই বোঝা যাবে পাঁচশো বছরের মধ্যে কবিমনীষীরা কী পরিমাণ সংস্কারমুক্ত

হয়েছিলেন। গোটে যে যুগে বাস করতেন তাকে বলা হতো এন্‌লাইটেনমেন্টের যুগ। সে যুগের মানুষ সব রকম জুজুর ভয় কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল। নরকের ভয়ও তেমনি এক জুজুর ভয়। কিন্তু তখনো স্বর্গনরক বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়নি। ইতিমধ্যে সে বিশ্বাস গেছে। এখন এই মর্ত্যভূমিই সব।

দান্তের যুগ সম্বন্ধে একটি ভুলে যাওয়া সত্য মনে রাখতে হবে। সে যুগের নাম ছিল শিভালরির যুগ। নাইটরা লেডীদের জন্যে জীবনপাত করতেন। কবিরা লেডীদের জন্যে আত্মোৎসর্গ করতেন। লেডীরা ছিলেন রূপে গুণে আদর্শ। তথা পরম প্রেমাস্পদা। সে প্রেম তারকার প্রতি পতঙ্গের প্রেম! লেডীরা সকলেই বিবাহিতা, সুতরাং মিলন বড়ো একটা ঘটত না। ঘটলে অধর্ম হতো। ইহলোকে সেটাকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। দান্তে এ নিয়ম মানতেন। কিন্তু রেনেসাঁসের পরে এ নিয়মে শিথিলতা আসে। যুগটাও বদলে যায়। নাইট ও লেডীদের সে মহিমা আর থাকে না। গ্যেটের যুগ যখন এল তখন প্রেমের ক্ষেত্রে বাছবিচার রইল না। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে রইল। এতদিনে সেটাও প্রায় ঘুচে গেছে। একালের মানুষ বুঝতে পারে না কেন মার্গারেটের সঙ্গে ফাউস্টের বিয়ে হলো না। অথবা তাঁর আদি প্রেমিকাদের একজনের সঙ্গে গ্যেটের। ট্র্যাজেডীর অবশ্যম্ভাবিতার পক্ষে সুযুক্তি নেই। আছে সমকালীন সংস্কার।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের সন্তান। সে যুগ রেনেসাঁসকেও ছাড়িয়ে এসেছে। কিন্তু যে দেশে তাঁর জন্ম সে দেশে রেনেসাঁস বহু বিলম্বে আবির্ভূত হয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ দান্তের মতো নিয়মশৃঙ্খলায় বন্ধ। গ্যেটের মতো শিথিলশৃঙ্খল নন। তবে তাঁর জীবনের শেষের পর্যায়ে বেশ কিছুটা সংস্কার-মুক্তি ঘটেছে। সেইজন্যে তিনি প্রায় গ্যেটের কাছাকাছি। কিছু রবীন্দ্র-বিচারে ঠিক দান্তে গ্যেটের নাম মনে আসে না। তিনজনেই মহান, তিনজনেই প্রথম সারিভুক্ত। তা বলে তিনজনেই কি একবৃন্তের বা একই ঐতিহ্যের বা একই পরম্পরার? রবীন্দ্রনাথের পেছনে ইহুদী-খ্রীস্টান জীবনদর্শন ছিল না, যেমন ছিল দান্তের পেছনে। অথবা ছিল না গ্রীক ক্লাসিকাল জীবনদর্শন, যেমন ছিল গ্যেটের পেছনে। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে মহর্ষির কাছ থেকে ও পরোক্ষভাবে উপনিষদের কাছ থেকে জীবনের পাথেয় পেয়েছিলেন। শেষের দিকে টলমল করলেও তাঁর পদতলভূমি ছিল পর্বতের মতো অটল।

অথচ তাঁর প্রকৃতি ছিল শেলী কীটসের মতো রোমান্টিক। রোমান্টিক থেকে তিনি ক্লাসিকালে যেতে পারতেন গ্যেটের মতো, কিন্তু ক্লাসিকাল বলতে তো সেই কালিদাস। সেই রূপলোকে কিছুদিন বাস করে তাঁর জীবনেও স্বর্গ হইতে বিদায় ঘটে। তিনি হয়ে ওঠেন বাউল বৈষ্ণবদের মতো মরমী বা মিস্টিক। এ ধারা তাঁরই স্বদেশের। কতকটা হয়তো পারস্যের। পাশ্চাত্য

মিস্টিকদের সঙ্গে মিল থাকলেও ধারা অভিন্ন নয়। তাঁর শেষবয়সের 'মানুষের ধর্ম'ও ঠিক পাশ্চাত্য হিউমানিজম নয়।

তা হলেও বলতে হবে যে রবীন্দ্রনাথই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের উদারতম সমন্বয় বা সেতু। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনে তিনি আজীবন বিশ্বাস করেছেন। বিরোধকে তিনি অনিবার্য মনে করেননি। বিরোধ যখন বেধেছে তখন তিনি দুঃখবোধ করেছেন। শেষের দিকে তাঁর পীড়া অসহ্য হয়েছে। কিন্তু সব সময়েই তাঁর দৃষ্টি বিরোধের ঊর্ধ্বে। গ্যেটের দৃষ্টিও ছিল তেমনি ফরাসী জার্মান বিরোধের ঊর্ধ্বে। নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের মর্ম তাঁর দেশের জাতীয়তাবাদীরা ভুল বুঝেছে। এখনো তার জের মেটেনি।

গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করার আরো একটা জবরদস্ত কারণ হচ্ছে দুজনের সর্বতোমুখী জীবনদর্শন। জীবনের কোনো অংশকেই বাদ দেওয়া চলবে না, কোনো প্রকাশকেই। রবীন্দ্রনাথকেও তাই বিজ্ঞানচর্চা করতে হয়েছিল। ছবি আঁকতে হয়েছিল। নাটক প্রযোজনা করতে হয়েছিল। তাঁর হোমিওপ্যাথি আর বায়োকেমিস্ট্রির কথা সকলে জানেন। কিন্তু জানেন না শিলাইদার জমিতে একরাশ মাছ পুঁতে রেখে মাছের সার তৈরি করার কৌতুক। কবিত্বের মতো তাঁর কবিরাজীর শখ ছিল, একথা না বললেও চলে। কিন্তু নিত্য নতুন টনিক কেনার খবর বলতে হয়। এক একবার সে যা মজা হতো বলবার নয়। তেমনি কতরকম নতুন নতুন রান্নার প্রণালী ছিল তাঁর মাথায়। তা নিয়ে ট্র্যাজেডীও ঘটত। বন্ধুরা বাঁচাতেন।

এসব লক্ষণ মিলে যায় পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের নায়কদের বহুমুখী জীবনের সঙ্গে। যেমন লেওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবন। রবীন্দ্রনাথকেও সেইজন্যে আমরা একজন রেনেসাঁস নায়ক বলতে পারি। রামমোহন ভিন্ন তাঁর তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।

দান্তের জীবন এরকম বহুমুখী ছিল না। যদিও যুদ্ধবিগ্রহ তিনি হাতে কলমে করেছিলেন আর রাজনীতি করতে গিয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জীবনে আর ফ্লোরেন্সে ফেরা হলো না। কিন্তু যশের জন্যে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি। জীবদ্দশাতেই তিনি নবজাত ইতালীয় সাহিত্যের মুকুটমণি হয়েছিলেন। এখনো তাই রয়েছেন। এমন ভাগ্য ক'জনের হয়! আদিকবিই শ্রেষ্ঠ কবি ছয় শতাব্দীর উপর।

(১৯৬৮) [শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র]

শেষ

শেষ নয়, অশেষ। তবু এখনকার মতো শেষ।

বিনু, তোমার কথা তো সারা হলো, এবার আমার কথা বলি। তোমার মনে রাখার জন্যেই বলা। তোমার মতো আরো অনেকের।

বিশ্ব তার আনন্দ বেদনা নিঃশব্দে বয়, তার মুখে ভাষা নেই। মানুষের মুখে ভাষা আছে বলে মানুষ বড়ো গোলযোগ করে। সে যদি মাঝে মাঝে নীরব হতো শ্রোতাদের প্রাণ শীতল হতো। যাঁদের লেখনীর মুখে ভাষা আছে তাঁরাও যদি নীরব হতে জানতেন তবে সাহিত্য আজ মেছোহাটা হয়ে উঠত না।

"যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা" তেমনি বলার অঙ্গ বলা ও না-বলা। যত বলতে হয় তত হাতে রাখতে হয়। নিঃশেষে বলার মতো ভুল আর নেই। তোমরা আধুনিক সাহিত্যিকরা বকতে জান, চুপ করতে জান না। এত উঁচু গলায় কথা কও যে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না। তাতে তোমাদেরও গলা ফাটে, বিশ্বেরও তাল কাটে, শান্তিভঙ্গ হয়।

ভুলে যেয়ো না, চার দিকে অন্তহীন নৈঃশব্দ্য। বিরাট জগৎ মহামুনির মতো মৌন। যদি কিছু জানাতে চায় তো ইশারায় জানায়। মানুষকে শব্দ দেওয়া হয়েছে শব্দ করবার জন্য নয়। নিঃশব্দতাকে আরো নিঃশব্দ করবার জন্যে নয়। শব্দ দেওয়া হয়েছে নিঃশব্দতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবার জন্যে নয়, ছন্দ মেলাবার জন্যে। যেমন চলার ছন্দ পা ফেলা ও পা তোলা তেমনি বলার ছন্দ বলা ও না-বলা।

বিনু, তুমি কথা বলার আর্ট শিখেছ। না-বলার আর্ট শেখো।

(১৯৫৪)

ভ্রমণকাহিনী

পথে প্রবাসে

৩

নতুন দেশে এলে মানুষের সব ক'টা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মিষ্টান্নের দোকানে শিশুর মতো মানুষ কেবলি উতলা হয়ে ভাবে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা শুনি, কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নিই। একান্ত তুচ্ছ যে, সেও নবীনত্বের রসে ডুব দিয়ে রূপকথার দাসী-কন্যার মতো রাণীর যৌবন নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। বলে, দেখ দেখ আমাকে দেখ, আমি ভালো নই মন্দ নই, সুন্দর নই কুৎসিত নই, আমি রূপবান আমি নতুন। তখন মানুষের ভিতরকার রসিকটি দেহ-দুর্গের চার দেয়ালের দশ জানলা খুলে দিয়ে জানলার ধারে বসে। সে নীতিনিপুণ নয়, সে ভালো-মন্দ ভাগ করে ওজন করে বিচার করতে পারে না, সে কেবল দেখতে শুনতে চাখতে ছুঁতে চায়; কিন্তু কত দেখবে কত শুনবে কত চাখবে কত ছোঁবে। হায়, আমার যদি সহস্রটা চোখ সহস্রটা কান থাকত, আর থাকত সহস্রটা—না, না, পাঁচ-শোটা—মন, তাহলে জগতের আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ এমন ব্যর্থ যেত না। তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে বাতির নিচে আগুনের দিকে পিঠ করে বসে 'বিচিত্রা'র জন্য ভ্রমণকাহিনী লিখতুম না, আমি আরেক বিচিত্রার দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী অফুরন্ত লীলা উপভোগ করতে পথে বেরিয়ে পড়তুম। কিন্তু দ্যুলোকব্যাপী? —হায়, লণ্ডনের কি দ্যুলোক আছে। লণ্ডনের লঙ্কাপুরীতে ভুবনের ঐশ্বর্য আহৃত, কিন্তু আকাশ নেই, সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, তারা নেই। দিনের পর দিন যায়, সূর্য ওঠে না, আকাশ মানিনীর মতো মুখ আঁধার করে রাখে, আর আমরা নিরীহ লণ্ডনবাসীরা পিতামাতার দ্বন্দ্বে অবোধ শিশুর মতো অবহেলিত হয়ে আলোর ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হই। আমাদের জ্যেষ্ঠরা যাঁরা লণ্ডনের কোলে দীর্ঘকাল আছেন তাঁরা হিন্দু বিধবার মতো উপবাস সইতে অভ্যস্ত কিন্তু আমরা কনিষ্ঠরা আলোর দেশ থেকে সদ্য আগন্তুক, ডাল ভাতের বদলে মাংস রুটি খেয়ে দেহ ধারণ করতে যদিচ পারি, তবু সূর্যের আলোর অভাবে গ্যাসের আলো ছুঁইয়ে মনের বৃন্তে ফুল ধরাতে পারিনে। আলোর দেশে মানুষের দেহ আলোর সঙ্গে ছন্দ রেখে

গড়া, তার লোমকূপে-কূপে আলোর আকাঙ্ক্ষা জঠরজ্বালার মতোই সত্য। সেই দেহের ওপরে যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনবচ্ছিন্ন অন্ধকারের চাপ পড়ে তখন মন বেশিদিন অস্বস্তির ছোঁয়াচ এড়াতে পারে না, সূর্যাস্তের পরে তরুর মতো মাথা যেন নিস্তেজ হয়ে নুয়ে পড়ে।

এক একদিন কালো কুয়াশায় দিনের ভিতর রাতের জের চলে, রাতের দুঃস্বপ্ন যেন বুকের ওপর বসে ক্ষান্ত হয় না, দিনের বেলা মনেরও ওপরে চাপে। এক একদিন শাদা কুয়াশায় সামনের মানুষ দেখা যায় না, পদাতিকের দল "চলি-চলি-পা-পা" ক'রে শিশুর মতো হাঁটে, মোটর গাড়িতে ঘোড়ার গাড়িতে মন্থরতার প্রতিযোগিতা বাধে, তবু তো শুনি গাড়িতে গাড়িতে মাথা ফাটাফাটি হয়, পথের মানুষ গাড়ি চাপা পড়ে মরে। হঠাৎ এক একদিন মেঘ-ধোঁয়া-কুয়াশার পর্দা তুলে আকাশের অন্তঃপুরে সূর্যের পদপাত হয়, আমাদের মুখের ওপরে খুশির হাসির লহর খেলে যায়। দু'তিন সপ্তাহে একদিন করে আলোর জোয়ার আসে, দু'এক ঘণ্টায় তার ভাঁটা পড়ে, তবু সেই দুটি একটি ঘণ্টার জন্যে আমরা সমরখন্দ ও বোখারা দান করতে রাজি আছি। এক সহস্র ক্যাণ্ডেল্-পাওয়ার-বিশিষ্ট বিজলির আলোর চেয়ে এক কণা সূর্যের আলোর দাম যে কত বেশি তা যেদিন নয়নঙ্গম হয়, সেদিন

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ"

সে মহাদানের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করে লণ্ডনের বিভবসম্ভোগ তুচ্ছ মনে হয়। দৈবাৎ এক আধবার চাঁদ দেখা দেয়। আমার বিরহী বন্ধুটি খবর দিয়ে যায় —চাঁদ উঠেছে। সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে আসা চাঁদ, কোন বিরহিণীর পাঠিয়ে দেওয়া চাঁদ। আমাদের কাছে চাঁদের মতো আশ্চর্য আর নেই, সে তো কেবল আলো দেয় না, সে দেয় সুধা। বিজলীর আলোর সঙ্গে তার তফাৎ ঐখানে। সভ্যতা আমাদের কেরোসিনের আলোর পরে গ্যাসের ও গ্যাসের আলোর পরে বিজলীর আলো দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের দয়া করে যে সুধাটুকু দিয়েছে সভ্যতা আর পরিমাণ বাড়াতে পারেনি।

কথা হচ্ছিল নতুন দেশে এলে মানুষের সব কটা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মানুষের দশা হয় সেই ভদ্রলোকের মতো যে ভদ্রলোক একপাল আত্মীয় পরিবৃত হয়ে কাশীতে বা পুরীতে ট্রেন থেকে নামেন। দশটা পাণ্ডা যখন দশটি আত্মীয়কে ছিনিয়ে নিয়ে দশদিকে রওনা হয় এবং আরো দশটা এসে কর্তার দশ অঙ্গে টান মারে, তখন তাঁর যে অবস্থা হয় আমার মনেরও এখন সেই অবস্থা। ঘর ছেড়ে একবার যদি বা'র হই তো লণ্ডন শহরের সব ক'টা রাস্তা একসঙ্গে আহ্বান করতে থাকবে, "এদিকে বন্ধু, এদিকে",

সব ক'টা মাঠ উদ্যান, সব ক'টা মিউজিয়াম আর্ট গ্যালারি থিয়েটার কন্সার্ট সমবেতস্বরে গান করে উঠবে, "এখানে বন্ধু, এখানে।" তাদের আহ্বান যদি নাই শুনি, যদি কোনো একটা রাস্তা ধরে ক্ষ্যাপার মতো যেদিকে খুশি পা চালাই, তবে মানব-মানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক কত ভঙ্গির সাজ কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ আমার চোখ দু'টিকে এমন ইঙ্গিতে ডাকবে যে, মনটা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাববে, এর চেয়ে চুপ করে ঘরে বসে ভ্রমণকাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দুটি চক্ষু বিদ্ধ করে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।

আমি ঘরে বসে লিখছি, আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। প্রথমে যেখানে গেল সেটা আমাদের বাড়ির পাশের টেনিসকোর্ট, সেখানে যুবকযুবতীরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে হেসে হেসে খেলছে। যে দুটো জাতির পরস্পর থেকে শত হস্ত ব্যবধানে থাকা উচিত, সেই দুটো জাতি যে বয়সে মানুষের শিরায় শিরায় ভোগবতীর বন্যা ছোটে সেই বয়সে কেবল যে স্বাস্থ্যের জন্যে শীতবাতাসের মধ্যে আঁধার আকাশের তলে খেলা করছে তা নয়, সেই সঙ্গে এত প্রচুর হাসছে যে ভারতবর্ষের লোক মোহমুদ্গরের আমল থেকে আজ অবধি সব মিলিয়ে এত হাসেনি। আমার চোখ ঘরের জানলা ছেড়ে রাস্তায় নামল। আমাদের পাড়ার বাড়িগুলো এক-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত বকের মতো নিস্তব্ধ। এটা একটা শহরতলী। সামনের বাড়ির ঝি মাটিতে হাঁটু গেড়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সিঁড়ির ওপর ন্যাতা বুলোচ্ছে, তার হাত প্রতি দেশের কল্যাণী নারীর হাত, ধুলো যার স্পর্শ পেয়ে প্রত্যহ শুচি হয়। আমার চোখ এগিয়ে চলল। এর পরের রাস্তাটা পাহাড় থেকে নেমেছে, তার নামবার মুখে খাস লণ্ডন। নামতে নামতে দেখছি ছেলের দল পায়ে চাকা বেঁধে ফুটপাথের ওপর দিয়ে সোঁ করে নেমে চলেছে, চলতে চলতে বাধালো হয়তো কোনো বুড়ো ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা, বার্ধক্যের চোখ তারুণ্যের দিকে কোমল ভাবে চাইল। ছোট মেয়েরা দোকানের কাঁচের বাইরে থেকে ভিতরের কেক্ চকোলেটের দিকে লুব্ধ নিরাশ দৃষ্টি ফেলছে, হয়তো দার্শনিকের মতো ভাবছে, কমল যদি এত সুন্দর তো কমলে কণ্টক কেন? চকোলেট যদি এত সুস্বাদু তো চকোলেটের চারপাশে কাঁচের বেড়া কেন? আমার চোখ পথে চলতে চলতে দেখছে মদের দোকানের ওপর বিজ্ঞাপনের নামাবলী, গির্জার দ্বারদেশে মুদ্রিত ধর্মানুশাসন, কসাইয়ের দোকানে দোদুল্যমান হৃতচর্ম পশুর শব, কেমিস্টের দোকানে নানা রোগের দাওয়াই, পোশাকের দোকানের কাঁচের এক পারে হঠাৎ-থামা নারীর কৌতূহল দৃষ্টি, অন্য পারে চোখ-ভুলানো পোশাকের নমুনা ও দাম। ফলের

দোকানের কর্মচারিণী বাইরের কাঁচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে। "এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সী"-র কর্ত্রী ঝিদের জন্যে গিন্নী ও গিন্নীদের জন্যে ঝি ঠিক করে দিচ্ছেন। সরকারী ইস্কুলের এক প্রান্তে ছেলেরা ও অপর প্রান্তে মেয়েরা সমান বিক্রমে মাতামাতি করছে; তাদের ভাগ্য ভালো, ভারতবর্ষে জন্মায়নি; সে দেশে জন্মালে এতদিনে ছেলেরা গোপাল হয়ে উঠতো, মেয়েরা মেয়ের মা হতো।

আণ্ডারগ্রাউন্ড রেলস্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোটানায় পড়েছে—ট্রেনে চড়বে, না বাসে উঠবে? বাসেই উঠল, দোতলার এককোণে আসন নিল। দুপাশে দোকান বাজার, দোকানে ক্রেতা ক্রেত্রীর ভিড়, কর্মচারিণীর ব্যস্ততা, উভয়পক্ষে শিষ্টাচার রেস্তোরাঁ—দলে দলে নরনারী আহারে রত, পরিবেশনকারিণীদের মরবার ফুরসৎ নেই ছুরি কাঁটা প্লেটের ঝনৎকার, সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া। রেস্তোরাঁর বাইরে অন্ধ ভিক্ষুক চীরধারিণী পত্নীর হাত ধরে দেশলাই বেচছে বা বাজনা বাজাচ্ছে বা ফুটপাথে ছবি আঁকছে; রাস্তা মেরামত করছে কুলিরা; তাদের পরিধান কাদামাখা ও জীর্ণ, মুখে প্রতি দেশের কুলী-মজুরের মতো সরলতাব্যঞ্জক প্রাণখোলা হাসি। জমকালো পোশাক পরা অশ্বারোহী সৈনিক চলেছে, বুড়ীরা হাই তুলতে তুলতে নির্নিমেষে দেখছে। গত যুদ্ধে তাদের এমনি সব ছেলেরা তো মরেছে! তরুণীরা গৃহবাতায়ন থেকে উল্লাসধ্বনি করছে, যৌবন যে ঠেকেও শেখে না, হারিয়েও হারায় না। থিয়েটারের ম্যাটিনীর সময় হলো, টিকিট কেনবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ "কিউ" (queue) করে দাঁড়িয়েছে, দুজনের পেছনে, দুজন, পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি। সর্বত্র পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি, সভাসমিতিতে স্কুলে কলেজে থিয়েটারে কন্সার্টে দোকানে আপিসে সর্বত্র নারীর আক্রমণে পুরুষ পলাতক, কেরানী মানে নারী, স্কুল-শিক্ষক মানে নারী, গৃহভৃত্য মানে নারী। রাস্তার মোড়ে বাস থামল, শালপ্রাংশু বলিষ্ঠকায় পুলিসের তর্জনী-সংকেতে শত শত বাষ্পীয় যান থেমেছে, শত শত নরনারী রাস্তা পারাপার করছে, মেয়েরা ধাক্কা দিতে দিতে ধাক্কা খেতে খেতে ভিড়ের মধ্যে ছুটে মিলিয়ে যাচ্ছে, ছিটকে বেরিয়ে পড়ছে, শিশু কাঁধে নিয়ে শিশুর বাবা তার মা'র পশ্চাদবর্তী হচ্ছেন, বুড়ীকে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে বুড়ীর ছেলেমেয়েরা মাঠে হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছে, প্রেমিক যুগল হাতে হাত জড়িয়ে বাজার করে ফিরছেন। বাস চলতে আরম্ভ করল, একটা পার্কের কাছ দিয়ে যাচ্ছে, পার্কের বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দরিদ্ররা রুটি কামড়ে খাচ্ছে, তাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনটা দু'একখানা রুটিতেই সমাপ্ত হচ্ছে।

বাস কলেজের কাছে থামতেই আমার চোখজোড়া তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে দৌড় দিলে কলেজের অভিমুখে; কোনো অগ্রগামিনী হয়তো দয়া করে দরজাটা

খুলে রাখলেন, প্রবেশ করে ধন্যবাদ দিয়ে কপাটটা খুলে ধরা গেল পশ্চাদাগতের জন্যে। তারপর ক্লাসে গিয়ে আসন অধিকার করা, অধ্যাপকের আগমনের আগে মেয়েদের তুমুল ফিস ফাস, কে কী সাজ করে এসেছে অন্যমনস্কতার ভান করে দেখা ও দেখানো, লাফ দিয়ে পেছনের চেয়ার থেকে সামনের চেয়ারে যাওয়া। অধ্যাপকের প্রবেশ, অধ্যাপকোবাচ, সুবোধ বালিকাদের কর্তৃক একান্ত তন্ময়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথার শ্রুতিলিখন, পলাতকমতি উন্মনা বালক কর্তৃক উপন্যাসপাঠ বা কবিতাসংরচন, বার বার ঘড়ির দিকে চাতক দৃষ্টিক্ষেপ, অবশেষে ছাত্রছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ, ধাক্কাধাক্কিপূর্বক ক্লাস থেকে বহির্গম।

নতুন দেশে এলে কেবল যে সব ক'টা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে তা নয়, সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট্ করে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না। মানুষ খাদ্য পেয় সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু রক্ষণশীল, দেশী রান্নার স্বাদ পেলে রসনা আর কিছু চায় না। কাঁচা বাঁধাকপি চিবিয়ে খেতে যতখানি উৎসাহ দরকার, বাঁধাকপির ডালনাচাখা রসনা কোনো জন্মে ততখানি উৎসাহ সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মানুষের এতটা রক্ষণশীলতা নেই। দেশে যখন এক-আধ দিন কোট ট্রাউজার্স পরা যেত সে কী অস্বস্তি! আর সে কী সাহেবমানসিকতা! ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বাঙালীগুলোর ওপরে তখন কী অকারণ করুণা! জাহাজে থাকবার সময় জাহাজী কানুনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে ধুতি পাঞ্জাবি পরার স্মৃতি মনে পড়ে গেলে হাসি পায়। এতদিনে ইউরোপীয় ধড়াচূড়া গায়ে বসে গেছে, চব্বিশ ঘণ্টা এই বেশে থাকতে একটুও বেখাপ্পা বোধ হয় না; এখন মনে হয় এইটেই স্বাভাবিক, যেন এই পোশাক পরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি, ট্রাউজার্স জোড়াটার হাঁ-দুটোতে পা জোড়াটা গলিয়ে দিই, মণখানেক ভারি ওভারকোটটার বাহন হয়ে চলি। দৈবাৎ কোনোদিন ধুতি পাঞ্জাবি চাদর বার করে পরি তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনে, আমোদের অন্ত থাকে না, জগৎকে দেখিয়ে আসতে ইচ্ছে করে আমাদেরও জাতীয় পরিচ্ছদ আছে! কিন্তু আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কি একটা? মাদ্রাজী ভায়াদের সঙ্গে পাঞ্জাবি ভায়াদের আপাদমস্তক অমিল, বাঙালী মুসলমান পেশোয়ারী পাঠানের যমজ ভ্রাতা নন! আমার সফেদ ধুতি আর সবুজ পাঞ্জাবিটার ওপরে নীলকৃষ্ণ উত্তরীয়খানা জড়িয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াই তো রাস্তায় ভিড় জমে যাবে। পুলিস যদি বা আমাকে মানুষ বলে চিনতে পেরে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষদের হাতে

সমর্পণ না করে তো ট্রাফিক বন্ধ করার অজুহাতে সার্বজনীন শ্বশুরালয়ে চালান দেবে।

নতুন দেশে এলে নতুন আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে গোটা মানুষটারই একটা অন্তঃপরিবর্তন ঘটে যায়। যাঁরা বলেন তাঁদের পরিবর্তন হয়নি তাঁরা খুব সম্ভব জানেন না কোথায় কী ঘটে গেছে। দেশে ফেরবার সময় তাঁরা সর্বাংশে—এমন কি মতবাদেও—ঠিক সেই মানুষটি থেকেই ফিরতে পারেন, কিন্তু মনেরও অগোচরে মানুষের কোন্‌খানে কোন্‌ প্যাঁচটি আলগা হয়ে যায় তা মানুষ কোনোদিন না জানতে পারলেও সত্যের নিয়ম অমোঘ। নিজেকে জেরা করলে বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে আমার যেন সেই অবস্থা হবে যে অবস্থা হয় দীঘিতে ফিরে গেলে স্রোতের মাছের। ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোট করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের একস্রোতে ভাসা। নারী সম্বন্ধে এদেশের পুরুষ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে মুমূর্ষুর মতো বাঁচে না, নারীর মাধুর্য তার দেহকে ও মনকে তুল্যরূপে সক্রিয় করে তোলে। কেবল চোখে দেখারও একটা সুফল আছে, মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্যান্বিত করে দেয়! নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের জ্যোতিকে নিজের হাতে নিভিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোনো বার লিখব। যা আমার কাছে তর্ক নয়, রহস্য নয়, সহজ অনুভূতি তাই আমাদের দেশের লোকের কাছে বাক্যের সাহায্যে বোঝাতে হবে··· দুর্ভাগ্য! বেশ বুঝতে পারি, দেশে ফিরে গেলে দেশটা পার্টিশন দেওয়া ঘরের মতো ঠেকবে—একপাশে পুরুষ একপাশে নারী, মাঝখানে সহস্র বৎসরের অন্ধ সংস্কার।

আর একটা সহজ অনুভূতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্কন্ধের মতো মেশা, কোনো ব্রাহ্মণের কাছে নতশির থাকতে হয় না, কোনো দারোগার কাছে বুকের স্পন্দন গুণে চলতে হয় না, কোনো মনিবের কাছে মাটিতে মিশিয়ে যেতে হয় না, মনুষ্য মর্যাদাগর্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্বিত। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলে এই মুক্ত মানসিকতার অভাব সমস্ত মন দিয়ে বোধ করব। ভারতবর্ষ যে প্রভুমানসিকতার দেশ, দাস-মানসিকতার দেশ, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ একজনের দাস, অন্যজনের প্রভু।

জাপানে

অভ্যন্তরে বিশ্রাম করছিলেন রানী অফ আগ্রা। কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয় তেমনি প্রবেশ করলুম রানীর নিভৃত দরবারে। এয়ার হস্টেসরা আদর করে নিয়ে বসিয়ে দিলেন যার যার নির্দিষ্ট আসনে। বিমান উটপাখীর মতো কিছুক্ষণ দৌড়ল, তার পর দাঁড়াল, তার পর গরুড়ের মতো আকাশে উঠল. উঠতে উঠতে উঠতে উঠতে এক সময় বোঝা গেল যে উড়ছে। বিমান বন্দরের লাল নীল বাতিগুলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো, তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল। তোকিয়ো শহর তার আলোকমালা নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গ রেখেছিল, কিন্তু আর পারল না পাল্লা দিতে। পেছিয়ে পড়ল। অত যে আলোর বাহার তার চিহ্ন রইল না। তারপর সমুদ্র দেখা দিল। তার পর সমুদ্রই দৃষ্টি জুড়ল। জাপান এই একটু আগেও জাজ্বল্যমান সত্য ছিল। সে এখন স্মৃতি।

কমলাবোনকে একজন এসে খবর দিলেন অন্য সারির পিছনের দিকে পাশাপাশি তিনটে আসন খালি। ইচ্ছা করলে তিনি মাঝখানকার হাতগুলো নামিয়ে খাটের মতো করে গা মেলে দিয়ে আরাম করে শুতে পারেন। তিনি বেঁচে গেলেন। তখন আমিও ফাঁকতালে পাশাপাশি একজোড়া আসনের অধিকারী হয়ে মাঝখানের হাতটা নামিয়ে দিয়ে পা মুড়ে শুলুম। সেই যে ভোর পাঁচটায় হাকোনে হোটেলে বিছানা ছেড়েছি তার পর থেকে রাত এগারোটা অবধি কেবল চরকির মতো ঘুরেছি। দেহময় ক্লান্তি। এখন একটু ঘুমতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় ঘুম! ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘুম আসছে না। উত্তেজনায় নয়, আশঙ্কায় নয়, সেসব নেই। বরং আছে একটা উদ্দাম আনন্দ। মানবজাতির কত কালের সাধ পাখীর মতো আসমানে উড়বে। এই তো আমি পাখীর মতো উড়ছি। এ কি কম সৌভাগ্য! নিদ্রায় অচেতন হলে তো পাখীর মতো উড়ে চলার স্বাদ পাওয়া যায় না, তা দিয়ে চেতনা ভরে নেওয়া যায় না। তার পর ধরিত্রীর কোলে স্পেস কোথায় যে স্পেসের পরিপূর্ণ স্বাদ পাব! এক যদি সাহারা মরুভূমিতে উটের পিঠে চাপি বা প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজের বুকে ভাসি। তার চেয়েও অসীম অগাধ স্পেস মহাব্যোমে। যদি পাখীর মতো ডানা মেলি যদি গরুড়ের মতো ঊর্ধ্বে উঠি তা হলেই পাই অনন্ত অতল স্পেসের স্বাদ। চেতনা ভরে নিই।

ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘুম আসছে না। রাজ্যের কথা মনে পড়ছে। যে রাজ্য ছেড়ে চলেছি সেই রাজ্যের কথা। জাপানকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি। এই এক মাসে কত দেখলুম, কত শিখলুম। কত জনের সঙ্গে পরিচয় হলো। কারো কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। কে কে আমাকে ছাড়তে চায়নি। কাকে কাকে আমি ছাড়তে চাইনি। জাপানী, ভারতীয়, মার্কিন, রাশিয়ান, ফরাসী। স্বপ্নের মতো লাগছিল সত্যঘটনকেও। তাই তো আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলুম। যেন স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর স্বপ্নটাকে জোড়া দিয়ে টেনে দীর্ঘায়িত করছিলুম; করতে করতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। চোখ মেলে দেখি আলো হয়ে গেছে চারি দিক। দেয়াল-জোড়া কাচের শার্সি দিয়ে দিনের আলো ভিতরে এসে ছড়িয়ে গেছে। যাত্রী-যাত্রিণীদের কতক তখনো ঘুমিয়ে।

আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া দেখবার আর কী আছে? আছে মেঘ। মেঘনাদ নাকি মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করত। কিন্তু সে থাকত মেঘের কাছাকাছি। আমরা মেঘের চেয়ে অনেক উঁচুতে। অত উঁচু থেকে মেঘকে দেখায় নীল জলের উপর সাদা ফেনার মতো, শাদা ধোঁয়ার মতো, শাদা ভেলার মতো! নীল? না, ঠিক নীল নয়। গাঢ় সবুজ। ঘন শ্যাম। দিগন্তেও এক একটি মেঘ দেখছি। মনে হয় বিমানের সমান উচ্চ। রঙীন মেঘও চোখে পড়ে।

কমলাবোন অন্য ধারে ছিলেন। বললেন, "দেখুন, দেখুন! রামধনু।" এত বিশাল রামধনু জীবনে দেখিনি। দুই প্রান্ত সমুদ্রে নেমে গেছে। মাঝখানে কে জানে কভু শত ক্রোশ ব্যবধান। শীর্ষ বোধ হয় বিমানের সমোচ্চ। যেমন বিশাল তেমনি উজ্জ্বল। সব ক'টি রঙ ঝকঝক করছে। চোখ ঝলসে যায়। একটু পরে আবিষ্কার করি ওটা যুগল রামধনু। সেই সাতটি রঙ পিঠোপিঠি উলটো করে সাজানো। সাত নরী নয়, চোদ্দ নরী হার। হারদুটির মাঝখানে কে জানে কত যোজন ব্যবধান। রামধনু ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির অতীত হলো। তার পর কমলাবোন আবার ডাকলেন। ও কী! রামধনু না? দেখলুম সে এক আজব ব্যাপার। যে মেঘের উপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি সেই মেঘের উপর রামধনুর সাত রঙ। মেঘের পর মেঘ। সাতরঙার পর সাতরঙা। মেঘের বিরতি। সাতরঙার বিরতি। মেঘের পুনরাগতি। সাতরঙার পুনরাগতি। অনেকক্ষণ পরে হুঁশ হলো যে এটা আমাদের বিমানেরই দ্বারা সৃষ্ট বর্ণালী।

তার পর কমলাবোন বললেন, "ওটা কী জলের উপর ভাসছে? ভাসতে ভাসতে আমাদের সঙ্গে চলেছে?" প্রথমে মনে হলো কী একটা জলজন্তু। কিন্তু এমন কোন জলজন্তু আছে যে প্লেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাইলের পর

মাইল সমান দূরত্ব রক্ষা করতে পারে? ওটা জলজন্তু নয়। আমোদের বিমানেরই ছায়া। তাই ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। তার পরে দেখা গেল ক্ষুদে ক্ষুদে নৌকা। খেলনার মতো জাহাজ। দেখতে দেখতে আমরা হংকং বিমান বন্দরে পেঁছে গেলুম। এবার আড়াই ঘণ্টা বিরাম। বাইরে যেতে পারি। ছাড়পত্র জমা দিলুম। এয়ার ইণ্ডিয়ার লোক আমাদের নিয়ে গেল কাওলুন শহর দেখাতে, হোটেলে প্রাতরাশ খাওয়াতে। প্রদর্শিকা চৈনিক তরুণী বললেন, "আজকেই প্রথম সূর্যের মুখ দেখা গেল। এই ক'দিন চলছিল টাইফুনের উৎপাত।"

হংকং দিল চীনের একটুখানি আভাস। ক্রমে সেটুকু ক্ষীণ হয়ে এলো। আবার উড়ছি সাগরের উপর দিয়ে। উড়তে উড়তে এক সময় লক্ষ করছি পর্বতমালা, উপত্যকা, নদী। মানুষের বসতি অল্পই। কেমন এক ভয়াল সৌন্দর্য এই দেশের! যেন রূপকথার মায়ারাজ্য। অরুণ বরুণ কিরণমালার কাহিনীতে শোনা। এরই নাম ভিয়েৎনাম।

এর পর এলো বাংলার মতো সমতল সবুজ ভূমি। বড় বড় ক্যানাল গেছে বহুদূরে সরল রেখা টেনে। জমি যেন ছক-কাটা শতরঞ্চ। ছকগুলো সমচতুষ্কোণ। যেন কেউ পরিকল্পনাপূর্বক দিগন্তবিসারী উদ্যান রচনা করেছে। ধান্যের উদ্যান। শ্যামদেশ শ্যাম দেশই বটে। ব্যাংকক বিমানবন্দরে ঘণ্টাখানেকের জন্যে থামা। তারপর শহরের উপর দিয়ে ওড়া। ছোট ছোট খাল গেছে রাস্তার মতো নকশা কেটে। খালের পাড়ে বাড়ী। অগণিত প্যাগোডা।

সমুদ্রের উপর দিয়ে আবার উড়তে উড়তে চেয়ে দেখি অরণ্য। নদীনালা। শস্যক্ষেত্র। জনপদ। সহযাত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ বললেন, রেঙ্গুন এইমাত্র ছাড়িয়ে আসা গেল। আমার লক্ষ ছিল না। দৃষ্টি নিবদ্ধ বঙ্গোপসাগরে। বঙ্গকে মনে পড়ছে অনুষঙ্গ থেকে। দেশ আমাকে নিবিড় করে টানছে। বড় আশা ছিল পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে উড়ব। দশ বছর পরে অবলোকন করব তার রূপ। কিন্তু বিমান সুন্দরবনের পশ্চিম ঘেঁষে ভারত প্রবেশ করল। স্তব্ধ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করলুম সমুদ্র কেমন করে জলমগ্ন মৃত্তিকা হয়ে যায়, তার থেকে কেমন করে কাদামাটি পলিমাটি জেগে ওঠে, তার উপর কেমন করে ঝোপঝাড় গজায়, ঝোপঝাড় কেমন করে গাছপালা হয়, গাছপালা কেমন করে গহন বন, গহন বনে কেমন নদীনালার আঁকিবুঁকি। ধীরে ধীরে আসে বিরল বসতি, ধানক্ষেত, রাস্তা। বিমান ততক্ষণে নিচু হয়ে আস্তে আস্তে উড়ছে।

আর আমি ততক্ষণে চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর। এই প্রথম গৃহকাতর বোধ করছি। মিলন যতক্ষণ সুদূরে ছিল মিলনের কথা চেতনায় আনিনি। যেই

আসন্ন হলো অমনি চেতনা ছাইল। বিমান একটু একটু করে নামছে। দমদম দেখা যাচ্ছে। ঐ তো বন্দর। ওই যে কারা সব অপেক্ষা করছে। বিমান যেই ভূমিষ্ঠ হলো কমলাবোনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অবতরণ করলুম। তার পর তারের মতো সোজা চললুম মাঠ চিরে এক লক্ষ্যে। কিন্তু যে মেয়েটিকে আমার ছোট মেয়ে মনে করে একদৃষ্টে ছুটেছিলুম সে তৃপ্তি নয়। বাঁ দিকে তাকাতেই দেখি তৃপ্তি, আর তার মা, আর দুর্গাদাসবাবু।

আমার ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা। কলকাতার ঘড়িতে বিকেল সাড়ে তিনটে। মেয়ের মা বললেন, "এসেছ?" আর মেয়ে বলল, "বাবা, আমার জন্যে কী এনেছ?"

২২শে জুলাই ১৯৫৮ সমাপ্ত

আমার স্বধর্ম

প্রথম বয়সে আমার উচ্চাভিলাষ ছিল আমি হব শক্তিশালী ও সুচতুর লেখক। আমার লেখা হবে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো উজ্জ্বল। কিন্তু জীবনের মাঝপথে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অকস্মাৎ পুত্রশোক পেয়ে আমি থমকে দাঁড়াই। ভুল পথে চলিনি তো? আত্মপরীক্ষার পর ওপথ ছেড়ে দিই। তখন থেকে আমার ব্রত হল আমার লেখা হবে সহজ ও সরল, সপ্রেম ও সরস। তাতে থাকবে অমৃতের স্বাদ। তাতে থাকবে সৌন্দর্যের সারাৎসার।

নতুন করে বরণ করি সত্যকে আর সৌন্দর্যকে, যা না হলে লেখা আর্ট হয় না। বরণ করি প্রেমকে, যা না হলে আর্ট হয় প্রেমহীন। প্রেম কেবল নরনারীর প্রেম নয়, মানবপ্রেম, তার থেকে ঈশ্বরপ্রেম। তা না হলে প্রেমের সাধনা অপূর্ণ থেকে যায়। তা বলে আমি ধর্মাশ্রয়ী বা নীতিনিপুণ হতে চাইনি। আর্টকে করতে চাইনি আধ্যাত্মিকতার বা নৈতিকতার বাহন। আর্ট আবহমানকাল যা নিয়ে ব্যাপৃত থেকেছে তাই নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে। অন্তহীন জীবনরহস্য। আর তার অন্তহীন মর্মভেদ। এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে কী আছে তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হবে। আর বোধগম্য ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। বড়ো কঠিন কাজ। এ নিয়ে নিবিষ্ট থাকতে হয়। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

আজকের দিনের অশান্ত পরিবেশে নিবিষ্ট হয়ে কাজ করতে দিচ্ছে কে? গ্রামে গিয়েও যে শান্ত পরিবেশ পাব সে ভরসা কোথায়? দেশজুড়ে চলেছে শিল্পায়ন। অর্থনৈতিক সংকট অনিবার্য। তার থেকে নৈতিক সংকট। দেশে-বিদেশে সামরিক প্রস্তুতিও চলেছে। সমগ্র দেশের সমস্ত নরনারী একভাবে না একভাবে এই প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত। সিভিল ডিফেন্স বলে একটা নতুন তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। অন্তহীন সামরিকতা থেকেও আসছে অর্থনৈতিক সংকট। তার থেকে নৈতিক সংকট। শিল্পায়ন ও সামরিকতা যতই বাড়ছে অর্থনৈতিক তথা নৈতিক সংকট ততই ঘনাচ্ছে। একটার থেকে আরেকটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা দিন দিন অসম্ভব হচ্ছে।

গান্ধীজী চেয়েছিলেন নিবারণ করতে। বেঁচে থাকলে তিনিও কি সেটা

পারতেন ? অন্যান্য দেশ তাদের দৌড় না থামালে ভারতকেও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। নয়তো সে তাদের কাছে হেরে যাবে। একজন ব্যক্তি এককভাবে সাধুসন্ন্যাসী হতে পারে ত্যাগী গৃহস্থ হতে পারে। কিন্তু একটা দেশ তা হতে পারে না। কোথাও হয়নি। যদি হয় তবে সেটা একটা আশ্চর্য ঘটনা হবে। কোন দেশই তার জন্যে তৈরি নয়। তাকে তৈরি করিয়ে নেওয়া শিল্পীদের কর্ম নয়।

সংকটের যদি সমাধান না হয় তবে একে একে অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে। এতকাল ধরে যেসব মূল্য আমরা সযত্নে রক্ষা করে এসেছি তার অনেকগুলিই অবস্থার চাপে চাপা পড়বে। আমরা অসহায় হয়ে নিরীক্ষণ করব আর পারি তো আত্মরক্ষা করব। আত্মরক্ষা মানে আত্মাকে রক্ষা। স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয়, স্রোতের উজানে সাঁতার কাটা নয়, স্রোত থেকে সরে থেকে গা বাঁচানো নয়, জলে ডুবে থেকে স্রোতকে মাথার উপর দিয়ে বয়ে যেতে দেওয়া। আর কারো না হোক, আমার আত্মরক্ষার ধারণা হচ্ছে এই।

সব অবস্থায় গর্ভিণীকে গর্ভরক্ষা করতে হয়। তেমনি শিল্পীকে শিল্পরক্ষা। আজকের এই অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টির কাজে আপনাকে অতন্দ্র রাখাও গর্ভরক্ষার মতো আবশ্যক কৃত্য। কিন্তু আশেপাশের মানুষ ভুলে যাচ্ছে মনুষ্যত্বের প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা। দাঙ্গাহাঙ্গামায় অরাজকতায় তলিয়ে যাচ্ছে সহস্রবর্ষের সাধনার ধন। এক্ষেত্রে মানুষ হিসাবে কি মানুষের প্রতি শিল্পীরও প্রাথমিক কর্তব্য নয় প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনা ? আমি উপলব্ধি করি যে এটাও আমার করণীয় কাজ। আমি কি কেবলি শিল্পী ? তার চেয়ে বেশি কিছু নই ? আর্টের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে এ কাজটিও আমাকে করে যেতে হবে যতদিন দরকার। হয়তো সেসব লেখা আর্ট হিসাবে গণ্য হবে না বা হলে নিরেস হবে। কিন্তু তার জন্যেও জীবনে স্থান রাখতে হবে। অন্বেষণ করতে হবে ভগবানের রাজ্য। ভগবানে বিশ্বাস না থাকলে ন্যায়ের রাজ্য, কল্যাণের রাজ্য। সত্য ও সৌন্দর্য নিয়েই প্রধানত আমার আর্ট। কিন্তু শিবকেও আমি অবহেলা বা উপেক্ষা করতে পারিনে।

এমনভাবে বাঁচতে ও কাজ করে যেতে হবে যাতে শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে মানবিক আদর্শের অনুসরণ করা যায়। আমি মানবিকবাদী। ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে এর বিরোধ দেখিনে। প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে বিরোধ দেখলে আমি মানবিকবাদকেই শ্রেয় মনে করি। জনপ্রিয় হতেই হবে এমন কোন মাথায় দিব্যি নেই। হলে ভালোই, না হলেও ভালো। ক্ষুরধার পন্থা। জনপ্রিয়তার খাতিরে বা অর্থপ্রাপ্তির জন্য তার থেকে বিচ্যুত হওয়া আত্মরক্ষা নয়। আত্মাকে হারানো। সারা জগৎটাকে যদি আমি হাতের মুঠোর মধ্যে

পাই অথচ আপনার আত্মাকেই হারিয়ে ফেলি তা হলে আমার এমন কী লাভ হলো ? যীশুর এই প্রশ্নটি আমি তেমনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি যেমন করি মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন। যাতে আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব ? আমি আধুনিক মানুষ, ওঁরা কেউ আধুনিক ছিলেন না। কিন্তু ওঁরা যে সব প্রশ্ন রেখে গেছেন সেসব হলো চিরকালের প্রশ্ন। আর্টকেও সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একালের যতরকম সামাজিক ও তাত্ত্বিক প্রশ্নের মতো সব চিরন্তন প্রশ্নেরও উত্তর থাকবে একালের সাহিত্যে। একালের কাব্যে উপন্যাসে নাটকে। আমি পলায়নবাদী হতে চাইনে। কিন্তু চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়াও এক প্রকার পলায়নবাদ।

১৯৭৪

সনেট-২

আমি চলে গেলেও তো থাকিবে সংসার
পাখীরা গাহিবে গান আজিকার মতো
ফুল ফোটা ফুল ঝরা নিত্য লীলা যত
সবি রবে অনাহত প্রকৃতি মাতার।
শুধু আমি যাব চলে। আমারি মতন
কত আসিবে তরুণ। তরুণীর মুখে
চাহি ঝড় বহে যাবে তাহাদেরো বুকে।
তাহাদের পদধ্বনি করেছি শ্রবণ
তাহাদের প্রেমস্বপ্ন পেয়েছি অন্তরে।
হে তরুণ, হে তরুণী, তোমরা যখন
এ পথের এইখানে ফেলিবে চরণ
পূর্বগামী পথিকেরে স্মরো ক্ষণতরে।
এই ঝরা ফুলে তার রেখে গেছে স্মৃতি
পথের বাতাসে তার মিশে আছে গীতি।

(১৯২১-২২)

গ্যয়েটে

ঋষি, তব স্থিরদৃষ্টি উদ্বেগ কাতর।
সত্যের গোধনগুলি আসে নাই ঘর;
রজনী গভীরা হলো। ক্বচিৎ নিরাশ
হেরিতে লেগেছ যেন উষার আভাস।

অসমাপ্ত অন্বেষণ নিতে হবে তুলে
কাল প্রত্যুষেই। আসন্ন সুপ্তিরে ভুলে
যেতে হবে আজিকার মতো। দৃষ্টিশিখা
জ্বলে তাই খরতর। ধূম মসী লিখা
নয়ন প্রদীপতল স্ফীত হয়ে উঠে ;
সংকল্প প্রহর জাগে বন্ধ ওষ্ঠপুটে।
হে ঋষি, সত্যেরা তব অদূরেই আছে
তিমির বিভিন্ন, সুপ্ত। সাড়া দেবে কাছে
রজনী পোহালে কাল।—তাও তুমি জানো,
তবু তব শুভ্র মুখ চিন্তাজ্বরে ম্লান।

(কন্টিনেন্ট ১৯২৯)

জীবনদর্শন

সৌন্দর্য রচনা করি, একমনে থাকি গৃহকোণে
আমার কিসের দয়া? কেন যাই কুরুক্ষেত্র মাঝে
অর্জুনসারথি হতে? সে ভূমিকা আমায় না সাজে
জয় সেও পরাজয়, মন বলে, মতি নাহি শোনে।

বাইরে সঙ্কট, বুঝি। তার চেয়ে অন্তরে সঙ্কট।
মন চায় স্থির হয়ে সুষমার দীপখানি জ্বালা
যাতে কিছু লজ্জা পায় কুশ্রীতার অন্ধ মাতোয়ালা।
মতি চায় ছুটে যেতে জোয়ানে জোয়ানে যেথা জট।

এ সঙ্কটে আয়ু যায়। কোথায় হয়েছি উপনীত?
প্রশ্ন করি আপনারে। চেয়ে দেখি রচনার পানে।
কল্পনায় যা রয়েছে আজো ভূমি পায়নি সেখানে
অন্তঃসত্ত্ব বসে আছি দশ মাস কবে যে অতীত।
বাইরে সঙ্কট বাড়ে। শুনি কালচক্রের ঘর্ষণ
আমি আছি, তবু নেই। এই আজ জীবনদর্শন।

(১৯৫৪)

কুৎসায় সোনাটা

॥ ১ ॥

মধুর কেমনে হবে তিক্ত যদি হও
অফুরন্ত অহেতুক চরিত্রহননে ?
তিক্ততায় বিদ্ধ হয়ে অন্তরে মননে
মাধুরী কেমনে দেবে ? মধুর যে নও।

সখারা নির্বাক ভয়ে অথবা ভ্রান্তিতে
সাথীরাও বহুরূপী অথবা দুর্মুখ।
নিয়তি কেন যে করে এমন কৌতুক
কুৎসায় কাতর হও ব্যথায় ক্লান্তিতে।

বৃথা চেষ্টা আত্মরক্ষা বধির যেখানে
কানে তুলবে না কথা, খুলবে না চোখ
অন্ধবিশ্বাসের ঘোরে অযোধ্যার লোক।
কেন বাক্য বুনে যাও ? পৌঁছে না তো প্রাণে

মধুর না হতে পারো তিক্তও হবে না
রক্ষার ভাবনা থাক। কথাই কবে না।

॥ ২ ॥

সম্মান কে কারে দেয় ? কেড়ে নেয় কেবা ?
উভয়ই লৌকিক, জেনো। দু'দিনের হাট
হট্টগোল থেমে যাবে শূন্য হবে মাঠ।
করে যাও একমনে ভারতীর সেবা।

দিতে যদি এসে থাকো দাও পুষ্পাঞ্জলি
কী পেলে না পেলে তার রেখো না হিসাব।
শাপ বর যা-ই মেলে মেনো সমভাব
শাপও হয়ে ওঠে বর। সার্থক সকলি।

দান যার মান তার এই তো নিয়ম
কানাকড়ি মান নেই দান নেই যার

কিংবা যার মান আছে, নেই অন্তঃসার।
মান যাক দান থাক। হোক সারতম।

অপমান দোলায় না, ভোলায় না মান
নিবাত নিষ্কম্প শিখা অক্ষত অম্লান।

॥ ৩ ॥

সকলি সহায় তার—যশ অপযশ
পুরস্কার তিরস্কার সুনাম দুর্নাম।
সকলি সাহায্য করে—প্রহার প্রণাম
কণ্ঠরোধ কণ্ঠমাল্য নিন্দা ও প্রেয়স্।

কবি যদি হয়ে থাকো আছে তো লেখনী
ব্রহ্মাস্ত্র তোমারি তূণে তবে কেন ভয়?
অন্তিমে অবধারিত তোমারি তো জয়
রণ তো হবে না সারা আজ ও এখনি।

তুমি দিয়ে যাবে রস, তৃষ্ণার্ত ধরণী।
তুমি দিয়ে যাবে সুধা, বিষাক্ত বসুধা
তোমার অমৃত, তার প্রকাশ বহুধা
শক্তিশেলে সে-ই হবে বিশল্যকরণী।

উভয়ই সহায় তার—মঙ্গলামঙ্গল
রূপান্তর সাধনের যে জানে কৌশল।

॥ ৪ ॥

সাধনা জীবনভর অবসান তার
তিনটি বুলেটে! সেই রাতে ঘরে ঘরে
মিষ্টান্ন বিলানো হয় শহরে শহরে।
কারো হর্ষ কারো শোক এই তো সংসার।

মহতেরও ক্ষণে চাঁদ ক্ষণে হাতে দড়ি
কেন তুমি আশা করো জীবনে অন্যথা?

পিঠে ছোরা বসানো তো সনাতন প্রথা
একাকার হয়ে যায় বন্ধু আর অরি।

তা বলে তুমিও হবে হিংসায় জর্জর!
তা হলে যে উর্ধ্ব হতে তোমারি পতন
কেন তুমি হতে যাও ওদেরি মতন?
লক্ষ্যে স্থির থেকো, সে-ই তোমার উত্তর।

দুর্যোগের আলোতেই চেনা যায় মুখ
জেনো, জেনো, নিয়তির এটাও কৌতুক।

(১৯৭৭)

কবির প্রার্থনা

(১)

রহুক আমার কাব্যে বালার্কময়ূখচ্ছটা, শতবর্ণ মেঘ,
বিহঙ্গের গীতিমুক্তি, বনস্পতি পরমায়ু, মৃত্তিকার রস,
শিশিরের স্বচ্ছন্দতা, শিশুর শুচিতা, পশুদের নিরুদ্বেগ,
সর্ব্বশেষে শর্ব্বরীর প্রশান্ত অম্বরতলে নারীর পরশ।

(২)

সহজ সরল হোক বাণী মোর সূর্য্যালোকসম
কেহ না জানুক তার কত জ্বালা আদিতে অন্তরে।
অদৃশ্য ছায়ার মতো সাথে থাক কলাবিদ্যা মম
সকলের চিত্ত আমি আকর্ষিব যে যাদু মন্তরে।
সরস সবুজ হোক বাণী মোর দূর্বাদলসম
কেহ না জানুক তার কী আবেগ অঙ্কুরে শিখরে।
অদৃশ্য বীজের মতো কোষে থাক অমরত্ব মম
ভবিষ্যের চিত্তে আমি প্রস্ফুটিব যে কুহকভরে।

(১৯৩৪)

লিমেরিক

১

এক যে ছিল মানুষ
নিত্য ওড়ায় ফানুষ।
অবশেষে এক দিন
ব্যাপার হলো সংগীন —
ফানুষ ওড়ায় মানুষ ॥

২

এক যে ছিল অসুর
রাবণ তার শ্বশুর।
দু বেলা তার বাবার
সামান্য জলখাবার
তিরিশ হাজার পশু ॥

৩

একটি মেয়ে ছিল তার নাম মিনু
তার এক ভাই ছিল তার নাম চিনু।
আর তার পুতুল
তার নাম তুতুল।
গুণে দেখ—এক, দুই, তিন ॥

১৯৩৭

মুখে মুখে জবাব

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
লাফ দেয় গাছ থেকে গাছে ?
মনে হয় ল্যাজ দেখে তার
সাপ যেন ডালে ডালে নাচে।
শুনি তোদের অনুমান !
"হনুমান।" "হনুমান।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
দল বেঁধে ডাকাডাকি করে ?
কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া বলে
রাত্তিরে হাঁকাহাঁকি করে।
শুনি তোদের খেয়াল ?
"শেয়াল।" "শেয়াল।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
খেয়েদেয়ে মোটা হয় খালি।
বেড়া ভেঙে বাগানেতে ঢোকে
ধরে তাকে নিয়ে যায় মালী।
শুনি তোদের হাসি ?
"খাসী।" "খাসী।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
ধোপাদের বোঝা বয়ে আনে ?
থেকে থেকে বিষম চেঁচায়
যেন আর সয় নাকো প্রাণে।
শুনি তোদের কাঁদা ?
"গাধা।" "গাধা।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
জংগলে ঘোরে আড়ে আড়ে ?
হরিণকে পেলে ছাড়ে নাকো,
গোরুকেও বাগে পেলে মারে

দেখি তোদের রাগ ?
"বাঘ।" "বাঘ।"
বল্ দেখি কোন জানোয়ার
জলে থাকে, ডাঙাতেও ঘর
ভয় পেলে হাত পা ও মাথা
টেনে দেয় খোলার ভিতর।
দেখি তোদের মজ্জুব ?
"কচ্ছপ।" "কচ্ছপ।"

১৯৪৪

দাদু ও নাতনি

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
তোমরা তখন করছিলে কী
ভাঙল যখন বঙ্গ ?

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
ইংগ ছিল রাজা, সে কি
বাধতে দিত জঙ্গ ?

দিদি, আমরা তখন করতেছিলুম
ভা'য়ে ভা'য়ে দঙ্গ
আপন যদি পর হয়ে যায়
ঘর হয়ে যায় ভঙ্গ।

দিদি, রাজা ছেড়ে যাচ্ছে যে তার
অন্যরকম ঢঙ্গ।
দুই শরিকের খাঁই মেটাতে
রাজ্য হলো ভঙ্গ।

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
দঙ্গ কেন করতে গেলে
কাটতে দিলে অঙ্গ ?

দাদু এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
তাই-যদি হয় তবে কেন
লড়লে রাজার সঙ্গ ?

দিদি, আস্ত কেক খাবে বলে
পণ করেছে কঙ্গ
লীগ বলেছে, কাটতে হবে,
নইলে হবে জঙ্গ।

দিদি, স্বপ্ন ছিল আমরা পাব
সিন্ধু থেকে গঙ্গ
সিন্ধু গেছে গঙ্গা আছে
স্বপ্ন হলো ভঙ্গ।

১৯৮৬

সাত ভাই চম্পা

[শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে'র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক]

চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী
সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত
ঘোষ বোস আর বানরজী।

গবরমেণ্টো এঁরাই চালান রায় বাহাদুর রাও সাহেব
এঁরাই আবার কঙগরসে গর্জে ওঠেন, "যাও সাহেব।"
জেলখানাতে বন্দী এঁরা, এঁরাই আবার মিনিস্টর
ফাঁসি কাঠে এঁরাই ঝোলেন, এঁরাই নাকি গুপ্তচর।
সি এফ এফ চ্যাটারজী
এম এম এম মুকারজী···

জমিদারের পিসতুতো ভাই মহাজনের মাসতুতো
এঁরাই আবার কিষাণ সভায় চাষীর হলেন চাষতুতো।
মিল মালিকের প্রিয় শ্যালক মজুতদারের ভগ্নীপৎ
মজুর দলে এঁরাই আবার রক্তরাঙা অগ্নিবৎ।
চটি ফট ফট চটরস্কি
মুখ মক মক মুখরস্কি ···

চোরা বাজার এঁদের চেনা, চোর তো এঁদের ভায়রা ভাই
এঁরাই তবু সম্পাদকী কাঁদুনী গান, "হায় রে হায়!"
এঁরাই নীলাম করেন জমি, এঁরাই খরিদ করেন ধান
এঁরাই খোলেন লঙরখানা—গোরু মেরে জুতো দান।
চটি ফট ফট চাটুয্যে
মুখ মক মক মুখুয্যে ···

থাকলে বেঁচে দেখবে তুমি বিপ্লবেরি পরের দিন
কুলীন কুলের মুখ্য যেই চম্পাদেশের সেই লেনিন।
বর্তে যদি থাকতে পারো মর্ত্যে আরো কয়েক দিন
দেখবে তেনার জামাই দুটি কোলচাক আর ডেনিকিন।
চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী…

১৯৪৫

অন্নদাতা

যাদের অন্নে চলে সংসার
কোটি কোটি মুখে জোগায় খাবার
লাঙল যাদের খাটুনি যাদের
হাজা ও শুকার ভাবনা যাদের
তাদের হাতেই তুলে দাও ভার
মাটিও তাদের হোক এইবার।

পারো তো তাদের হও একজন
কপালের ঘামে করহ ভোজন।
তেমনি খাটুনি তেমনি ভাবনা
সারা সমাজের ক্ষুধার চাপুনি
একবার তার বুঝহ ওজন।
মাটিতেই করো শিকড় যোজন।

(১৯৫৫)

রাতের অতিথি

[**স্থান** জঙ্গীপুরের ডাক বাংলা। কাল রাত দশটা। পাত্র মণ্টু গুপ্ত]

মণ্টু

"আজি কী মুরতি হেরিনু তোমার—"
মশার জ্বালায় হই জেরবার।
হাত চুলকায় পা চুলকায়
চুপ ক'রে বসা হলো দেখি দায়।
তাই বলে কত পায়চারি করি
বাইরে আঁধার পা বাড়াতে ডরি।
ঘন জঙ্গল ঘেরা চারি ধার
অদ্ভূত তার পাতার বাহার
কিন্তু যাদের লোকে 'লতা' বলে
তাদের বিহার বারান্দাতলে।
মশার কামড় বিরক্তিকর
তা বলে কি খাব 'লতা'-র কামড়!
জঙ্গীপুরের ডাকবাংলায়
সঙ্গীবিহীন প্রাণ যদি যায়
তবেই হয়েছে! তার চেয়ে ভালো
হ্যাজাগ্ বাতিটা আরো জোরে জ্বালো।
বেয়ারা! বেয়ারা!—কোথায় বেয়ারা!
চাপরাশিটারও দেখিনে চেহারা।
খাইয়ে আমাকে ওরা গেছে খেতে
কেউ কোথা নেই এ রাতে-বিরেতে।
ঘুম আসে নাকো রাত দশটায়
মশারি খাটিয়ে গরম বেজায়।
ফাইল! ফাইল! চার দিকে স্তূপ
দেখলেই চোখ ব্যথা করে খুব।

তার চেয়ে ভালো গুন গুন করা
যত রাজ্যের কবিতা ও ছড়া।
"হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ—"

[অতিথির প্রবেশ]

কে? কে?
কে আসছে ওই পা টিপে পা টিপে?
টর্চের বাতি জ্বলে আর নিবে।
কে? কে?

শৈলেশ

আমি শৈলেশ। চিনতে পারলে?
পারলে না? কবে কলেজ ছাড়লে
মনে পড়ে? প্রায় একুশ বছর
পাইনিকো ভাই তোমার খবর।

মন্টু

শৈলেশ? ওহো! শৈলেশ পাল
তুমি এইখানে! আহা! কত কাল
পরে দেখা হলো তোমার সঙ্গে!
আরে বোসো বোসো। হঠাৎ বঙ্গে
এরূপ স্থানে যে আশাই করিনি।
তাই তো ভাবছি চিনি কি না চিনি।

শৈলেশ

বেহারেই থাকি। তবে মাঝে মাঝে
এদিকেও আসি জমিদারি কাজে।
শুনলুম তুমি এসেছ বেড়াতে
ভাবলুম যাই দেখা করি সাথে।
সময়ও বুঝি হয়েছে বেয়াড়া
বদলেও গেছে আমার চোহারা।
তবু যে চিনেছ এই যথেষ্ট,
না যদি চিনতে সেও অদেষ্ট।
তুমি বড়লোক—

মণ্টু

আমি বড়লোক! আর হাসিয়ো না।
ওসব ঠাট্টা ঢের আছে শোনা।

শৈলেশ

কেন ভাই! কেন! কত বড় পদ!
পদের সঙ্গে নেই সম্পদ?

মণ্টু

পদমর্যাদা রাখতে রাখতে
কোথা চলে যায় রূপোর চাকতি।
মাসের অন্তে সব বাড়ন্ত
তবু লোকে বলে ভাগ্যবন্ত!

শৈলেশ

তুমিও ওকথা বলো যদি ভাই
আমরা সকলে কোথা তবে যাই।
জমিদারি উঠে যাবার দাখিল
ম্যানেজারি গেলে আবার নিখিল।
লক্ষ্মী ছাড়ে তো ষষ্ঠী ছাড়ে না
বয়স বাড়ে তো শক্তি বাড়ে না।
থাক গে ওসব বলতে আসিনি
রসনাটা নয় মধুরভাষিণী।
অনেক দিন তো যাওনি এদিকে
বন্ধুরা সাড়া পায় নাকো লিখে।
এসো এক বার ছুটিতে ছাটাতে
বেহারে দু'দিন সময় কাটাতে।

মণ্টু

ইচ্ছে তো আছে। ছুটি মিলবে কি?
বন্ধুরা আছে কে কোথার দেখি।
কে কী হয়েছে? কে কী করছে?
সুখে সাফল্যে জীবন ভরছে?

কোথায় প্রভাত ? মুকুন্দ সেন
নওলকিশোর ? নাজিম হুসেন ?
কামতা বঙ্কু কোথা এরা সব ?
খোঁড়া হেমন্ত ? পাগলা কেশব ?

শৈলেশ

এই তো স্মরণ রেখেছ, মণ্টু ।
বাদ পড়ে কেন বুড়ো ও ঝণ্টু ?
বেঁচে আছে ওরা সব ক'জনেই
রণজিৎ লালা সেই শুধু নেই ।

মণ্টু

পড়েছি, পড়েছি শোকসংবাদ
চিকিৎসকের বিষম প্রমাদ ।
সেই শুধু নেই । সেই শুধু নেই ।
কোথায় গেল সে জিজ্ঞাসা এই ।

শৈলেশ

থাক গে ওসব বৃথা জিজ্ঞাসা
বাড়ীখানা লালা হাঁকিয়েছে খাসা ।
ব্যাঙ্কে নগদ রেখে গেছে ঢের
ভাবনা কেবল গৃহবিবাদের ।
মুকুন্দ, জানো, ডেপুটি হয়েছে
'সাব' খসে গেল অনেক বয়েসে ।
প্রভাত এখন মস্ত হাকিম
মস্তকে তার কত শত স্কীম ।
নাজিম হুসেন পাকিস্তাঁ গিয়ে
ভুল করেছিল, এসেছে পালিয়ে ।
মাঝখান থেকে নোকরিটা নেই ।
লোকে ভালবাসে, মূলধন এই ।
নওলকিশোর ভূমিহার নয়
মনের দুঃখ মনে চেপে রয় ।
চাকা ঘুরে গেলে উঠবে উপরে
দল নিয়ে আছে, প্র্যাকটিস করে ।

খোঁড়া হেমন্ত খোঁড়ায় না আর
সারা বেলা করে মোটর বিহার
মোটরগাড়ীর এজেন্সী নিয়ে
কী ফোলা ফুলেছে মুটিয়ে মুটিয়ে।
ঐ যে তোমার পাগলা কেশব
আশা করি ভুলে যাওনি সে-সব।
সে-সব ব্যাপার ধুয়ে মুছে গেছে
কেশব এখন সিনেমা খুলেছে।
পুরুষ না হয়ে নারী হলে আজ
বেচারির হতো পতিতা সমাজ।

মণ্টু

মোটের উপর জীবন আহবে
ভালোই করেছে বন্ধুরা সবে।

শৈলেশ

ভালোই করেছে, তবু সুখী নয়।
ভালো ছিল সেই তরুণ সময়॥
অল্পেই সুখী, অল্পেই সুখ
চালচুলো নেই তবু হাসিমুখ।

মণ্টু

আমাদের গেছে সে যে একদিন
তখন ছিলেম কেমন স্বাধীন।
কত যে স্বপন কত কল্পনা
আকাশেতে আঁকা কত আল্‌পনা।
সেদিনের চোখে দুনিয়াকে আর
যায় না যে দেখা। এ দোষটা কার।

শৈলেশ

কী দেখতে চাও? কী দেখবে বলো

মণ্টু

সেও ভুলে গেছে কত কাল হলো।
কী যে আজ চাই! কী যে পাওয়া বাকী॥

বুঝিনে, বুঝতে পারিনে সেটা কী।
আরো ধন নয়, আরো মান নয়,
আরো আয়ু নয়, আরো প্রাণ নয়।
তবে কী। তবে কী। কী আমার চাই।
সব আছে, তবু কী আমার নাই।

শৈলেশ

গুরু করেছ কি? দীক্ষা নিয়েছ?
দেবতাকে তাঁর প্রাপ্য দিয়েছ?

মণ্টু

ধর্মে আমার হলো নাকো মতি
ভাবিনে কী হবে পরকালে গতি।
ইহকালে যদি না জানি বাঁচতে
পরকালে কেন চাইব নাচতে?

শৈলেশ

আমি বলি তুমি নাম জপ করো
কৃত আর কৃত আজ হতে স্মরো
জীবনের আর ক'টা দিন বাকী।
দিতে যদি চাও শমনকে ফাঁকি
তবে জপ করো ঠাকুরের নাম
তা হলেই যাবে কৈবল্যধাম।

মণ্টু

ইহকালে যদি না জানি বাঁচতে
কেন যাব কৈবল্য ধাচতে।

শৈলেশ

কী যে বলো তার হয় না অর্থ।
ধর্মই সার। অসার মর্ত্য।

মণ্টু

ধর্ম না যদি বাঁচতে শেখায়
তারে নিয়ে আমি করব কী, হায়॥

জানি নাকো আমি কত দিন আছি
বাঁচতে শিখব যত দিন বাঁচি।
ধর্ম যদি-না বাঁচতে শেখায়
শিল্পের কাছে যাব পুনরায়।
দিবসরাত্রি সৃষ্টি যে করে
রসমাধুর্য বৃষ্টি যে করে
জীবন কি তার কখনো ফুরায়!
পেয়ালা যে তার ভরে পুনরায়।

শৈলেশ

আমি তো দিয়েছি ধর্মেই মন
নয়তো পাগল হতে কতক্ষণ!
চারিদিকে দেখি ভূতের নৃত্য
শত অবিচার নিত্য নিত্য।
চৌর্যের জয়, কে কাকে ধরবে!
ছোট আর বড় অসাধু সর্বে।
প্রতিকার নেই, জ্বলছে মর্ম
তাই তো শরণ করেছি ধর্ম।

মন্টু

ধর্ম না-যদি জানে প্রতিকার
তবে কেন যাও ধর্মের দ্বার?

শৈলেশ

তবুও ধর্ম তথাপি ধর্ম
যদিও জ্বলছে গাত্রচর্ম।

মন্টু

তবে তাই হোক, আমার ধর্ম
সব ছেড়ে দিয়ে শিল্পকর্ম
আসবে না ফিরে তরুণ সময়
অন্তর হবে তারুণ্যময়!
প্রথম যৌবনের হলো ইতি
দ্বিতীয় যৌবনের হবে স্থিতি।

শৈলেশ

একদিন হবে তারও অন্ত
শমনের দূত অতি দুরন্ত।
পরলোকে যেতে নেবে কী পাথেয় ?
শিল্প কি যাবে তোমার সাথেও !
ওপারের কথা কখন ভাববে
মন যদি যায় গল্পে কাব্যে !
নাম যশ নিয়ে করবে কী, ভাই !
নাম জপ করো, সাথী হবে তাই।

মণ্টু

এপারেই যারা জীবন্মুক্ত
সত্যের সাথে নিত্য যুক্ত
সমান তাদের ইহপরকাল
যেমন সকাল তেমনি বিকাল !
আমার মুক্তি নীরবে নিজনে
অপ্রতিমের প্রতিমা সৃজনে।

শৈলেশ

পাগল ! পাগল ! অসার যুক্তি
নামজপ বিনা কোথায় মুক্তি !
কঠিন বাঁচন কঠিন মরণ
তাই ধরি কষে গুরুর চরণ।
পাপ যদি করি তিনিই ভরসা
নইলে যে পরকালটি ফরসা।

মণ্টু

আমি ধ্যান করি পরম রূপের
বীভৎসতাও তাঁরই হেরফের।
তাঁকেই দেখেছি চোখ খোলা রেখে
তাঁকেই এঁকেছি হাতে কালি মেখে।
এ জীবনে তাঁরে দেখা আর আঁকা
এই তো মুক্তি। আর সব ফাঁকা।

শৈলেশ

তার মানে ফাঁকা গুরুর চরণ।
শুনলেও পাপ। মানলে মরণ।
বিদায়, মণ্টু। চললেম, ভাই।
পাটনায় এসো। ছুটি নেওয়া চাই।

[অতিথির প্রস্থান

মণ্টু

অবাক কাণ্ড। শৈলেশ পাল
হঠাৎ কেমন করে এত কাল
পরে এলো আর হলো অদৃশ্য।
বিস্ময়কর এ মহাবিশ্ব।
সত্যি কি কেউ এসেছিল রাতে!
হ্যাজাগ নিবেছে। তেল নেই তাতে।
বেয়ারা। বেয়ারা।

(১৯৫৪)



বুঝিনে, বুঝতে পারিনে সেটা কী।
আরো ধন নয়, আরো মান নয়,
আরো আয়ু নয়, আরো প্রাণ নয়।
তবে কী! তবে কী! কী আমার চাই।
সব আছে, তবু কী আমার নাই!

শৈলেশ

গুরু করেছ কি? দীক্ষা নিয়েছ?
দেবতাকে তাঁর প্রাপ্য দিয়েছ?

মণ্টু

ধর্মে আমার হলো নাকো মতি
ভাবিনে কী হবে পরকালে গতি।
ইহকালে যদি না জানি বাঁচতে
পরকালে কেন চাইব নাচতে?

শৈলেশ

আমি বলি তুমি নাম জপ করো
ক্রতু আর কৃত আজ হতে স্মরো
জীবনের আর ক'টা দিন বাকী।
দিতে যদি চাও শমনকে ফাঁকি
তবে জপ করো ঠাকুরের নাম
তা হলেই যাবে কৈবল্যধাম।

মণ্টু

ইহকালে যদি না জানি বাঁচতে
কেন যাব কৈবল্য যাচতে!

শৈলেশ

কী যে বলো তার হয় না অর্থ।
ধর্মই সার। অসার মর্ত্য।

মণ্টু

ধর্ম না যদি বাঁচতে শেখায়
তারে নিয়ে আমি করব কী, হায়॥

জানি নাকো আমি কত দিন আছি
বাঁচতে শিখব যত দিন বাঁচি।
ধর্ম যদি-না বাঁচতে শেখায়
শিল্পের কাছে যাব পুনরায়।
দিবসরাত্রি সৃষ্টি যে করে
রসমাধুর্য বৃষ্টি যে করে
জীবন কি তার কখনো ফুরায়!
পেয়ালা যে তার ভরে পুনরায়।

শৈলেশ

আমি তো দিয়েছি ধর্মেই মন
নয়তো পাগল হতে কতক্ষণ!
চারিদিকে দেখি ভূতের নৃত্য
শত অবিচার নিত্য নিত্য।
চৌর্যের জয়, কে কাকে ধরবে!
ছোট আর বড় অসাধু সর্বে।
প্রতিকার নেই, জ্বলছে মর্ম
তাই তো শরণ করেছি ধর্ম।

মণ্টু

ধর্ম না-যদি জানে প্রতিকার
তবে কেন যাও ধর্মের দ্বার?

শৈলেশ

তবুও ধর্ম তথাপি ধর্ম
যদিও জ্বলছে গাত্রচর্ম।

মণ্টু

তবে তাই হোক, আমার ধর্ম
সব ছেড়ে দিয়ে শিল্পকর্ম
আসবে না ফিরে তরুণ সময়
অন্তর হবে তারুণ্যময়।
প্রথম যৌবনের হলো ইতি
দ্বিতীয় যৌবনের হবে স্থিতি।

শৈলেশ

একদিন হবে তারও অন্ত
শমনের দূত অতি দুরন্ত।
পরলোকে যেতে নেবে কী পাথেয় ?
শিল্প কি যাবে তোমার সাথেও !
ওপারের কথা কখন ভাববে
মন যদি যায় গল্পে কাব্যে !
নাম যশ নিয়ে করবে কী, ভাই !
নাম জপ করো, সাথী হবে তাই।

মণ্টু

এপারেই যারা জীবন্মুক্ত
সত্যের সাথে নিত্য যুক্ত
সমান তাদের ইহপরকাল
যেমন সকাল তেমনি বিকাল !
আমার মুক্তি নীরবে নির্জনে
অপ্রতিমের প্রতিমা সৃজনে।

শৈলেশ

পাগল ! পাগল ! অসার যুক্তি
নামজপ বিনা কোথায় মুক্তি !
কঠিন বাঁচন কঠিন মরণ
তাই ধরি কষে গুরুর চরণ।
পাপ যদি করি তিনিই ভরসা
নইলে যে পরকালটি ফরসা।

মণ্টু

আমি ধ্যান করি পরম রূপের
বীভৎসতাও তাঁরই হেরফের।
তাঁকেই দেখেছি চোখ খোলা রেখে
তাঁকেই এঁকেছি হাতে কালি মেখে।
এ জীবনে তাঁরে দেখা আর আঁকা
এই তো মুক্তি। আর সব ফাঁকা।

শৈলেশ

তার মানে ফাঁকা গুরুর চরণ !
শুনলেও পাপ ! মানলে মরণ !
বিদায়, মণ্টু ! চললেম, ভাই ।
পাটনায় এসো । ছুটি নেওয়া চাই ।
[অতিথির প্রস্থান]

মণ্টু

অবাক কাণ্ড ! শৈলেশ পাল
হঠাৎ কেমন করে এত কাল
পরে এলো আর হলো অদৃশ্য !
বিস্ময়কর এ মহাবিশ্ব !
সত্যি কি কেউ এসেছিল রাতে !
হ্যাজাগ নিবেছে । তেল নেই তাতে ।
বেয়ারা ! বেয়ারা !

(১৯৫৪)

